Written strictly in accordance with the new Syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal, for Students of *Class IX of Multipurpose and Higher Secondary Schools of West Bengal.* [*Vide Circulars No. HS/1/58, dated the 7th March, 1958 and No. HS/6/59 dated 25. 7. 59.*

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়

প্রথম খণ্ড ঃ প্রাচীন যুগ

(১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, এম. এ., এল-এল. বি.,
পি. আর. এস., ডি. লিট., শাস্ত্রী, গ্রিফিথ স্কলার, মোয়াট
গোল্ড মেডালিস্ট, স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিস্ট,
মিশর, ইস্পাহান ও কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্‌লামিক ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক,
সিনেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভ্য
প্রণীত
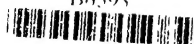
প্রকাশ মন্দির
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৩, কলেজ রো ঃ কলিকাতা—৯

প্রকাশ মন্দিরের পক্ষে শ্রীসুশীলকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

Distribution of marks in History :

PAPER I— (a) Ancient Indian History—50 marks.
(b) Medieval Indian History—50 marks.
PAPER II—(a) Modern Indian History—50 marks.
(b) Modern World History—50 marks.

প্রথম মুদ্রণ—১৯৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৮
তৃতীয় মুদ্রণ—১৯৫৯
পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত চতুর্থ মুদ্রণ—১৯৬০
পঞ্চম মুদ্রণ—১৯৬১

মূল্য : তিন টাকা চুরানব্বই নয়া পয়সা।

কাত্যায়নী মেসিন প্রেস, ৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬
হইতে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভারতবর্ষ পরিচয় নব পর্যায়ের নূতন সংস্করণ [illegible] **বৃহত্তর পরিচয়** নামে প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় নব ধারায় পরিকল্পিত একাদশ শ্রেণীর উচ্চমান মাধ্যমিক বিদ্যার্থীদের জন্য লিখিত। পূর্বে আমার রচিত **ভারতবর্ষ পরিচয়** নবম ও দশম শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের জন্য লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং দুইখানি গ্রন্থের প্রায় একই নামের জন্য সাধারণের মনে কোথাও কোথাও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত। সুতরাং নব নামকরণে সেই বিভ্রান্তি দূর হইবে আশা করি। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। এই পরিচয়ের মধ্যে ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার প্রচ্ছদপট, কার্য অপেক্ষা কারণ এবং বিবরণ অপেক্ষা ফলের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই ইতিহাসের পরিবেশ ও প্রভাব আলোচিত হইয়াছে। জাতীয় মন গঠনে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, সীমা ও আবেষ্টনী, সাগর, নদী, পর্বত, মরুভূমি, বনানী, সমতল ও মালভূমির প্রভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমুদ্র ও পর্বতের বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী বহির্ভারতীয় দ্বীপ, মধ্য এশিয়ার মরুপ্রান্ত, তিব্বত, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিল। বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে ভারতবাসীর জীবনে সেই ঐক্যধারা চিরপ্রবাহমান; তাহাই এই গ্রন্থের মূল বস্তু। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা, বৈদিক আর্য জাতির ভারতে আগমন, বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তৃতি, বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মৌর্যযুগ হইতে ভারতের ইতিহাস ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। মগধকে কেন্দ্র করিয়া মৌর্যযুগ ভারতের ইতিহাসে এক নব-ভারত সৃষ্টি করিয়াছিল। মৌর্যযুগের অন্তে যবন, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় জাতিপুঞ্জের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুষাণ যুগে আবার বৌদ্ধধর্ম নূতনরূপে এশিয়ার বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হইল। তারপর আরম্ভ হইল গুপ্তযুগ—ব্রাহ্মণ্য তথা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান; সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি ভারতীয় জীবনে এক নূতন স্পন্দন সৃষ্টি করিল। মুসলমান আগমন পর্যন্ত এই প্রবাহ অব্যাহত ছিল। এই গ্রন্থে রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস সমপর্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভে 'অধ্যায় পরিচয়' অবতারণা করা হইয়াছে। এই পরিচয়ের মাধ্যমে অধ্যায়বর্ণিত বক্তব্য বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। উচ্চমান অনুসন্ধানীর কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিবার জন্য আধুনিক গবেষণার ফল বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড **প্রাচীন যুগ** তথা হিন্দু যুগ, দ্বিতীয় খণ্ড **মধ্য যুগ** তথা মুসলিম যুগ, তৃতীয় খণ্ড **বর্তমান যুগ** তথা ব্রিটিশ যুগ এবং **স্বাধীন ভারতের ইতিহাস**।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতি,

২রা জুলাই, ১৯৫৮ গ্রন্থকার

পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

দুই বৎসর পূর্বে এই দিনেই আমার রচিত **ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়** (প্রাচীন যুগ) প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এইজন্য বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও জনসাধারণের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সময়ের মধ্যে পুস্তকখানির পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ সংঘটিত হইয়াছে শিক্ষাব্রতী, শুভানুধ্যায়ী, সুহৃৎসত্তমদের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বাঙ্গালী পুস্তক-ক্রয় ব্যাপারে কৃপণ—এই অপবাদ মিথ্যা।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় (প্রাচীন যুগ) প্রকাশের অবসরে আমি তিনটি বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি,—(১) আধুনিক পণ্ডিতগণের গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশন করিয়াছি। (২) বহু নূতন ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি, পুরাতন ব্যাখ্যার সমীক্ষা করিয়াছি। (৩) জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা করিয়াছি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের রূপ ও রেখা নূতন করিয়া অঙ্কন করিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ উচ্চতর মাধ্যমিক ইতিহাসের মানদণ্ড অত্যন্ত উচ্চস্তরে পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেই মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমার রচিত ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে আমি তাঁহাদিগকে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী বিশদভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

আমার রচিত ইতিহাসের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে বলেন যে, আমি ইতিহাস লিখি নাই, কাব্য রচনা করিয়াছি। আমি জানি না, এই সমালোচনা প্রশংসা কিংবা নিন্দা। আমি মনে করি, ইতিহাসও সাহিত্য। ইতিহাসের কঙ্কালের মধ্যে ভাষার প্রলেপ দ্বারা প্রাণ সঞ্চার করা যায়, রস সৃষ্টি করা যায়, ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করা যায়। তথ্যান্বেষী জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী আমার রচনা পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ এবং আনন্দ উপভোগ করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতি,

২রা জুলাই, ১৯৬০ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

সূচীপত্র

SYLLABUS FOR CLASS IX

HISTORY OF INDIA (up to 1206 A. D.)

Chapter I : *Introductory*

(a) Man and his environment—Two basic factors in history. Geography—the principal element of environment. Geographical features contributing to the unique character of some nations, e. g. Greece and England.

Physical features of the Indian sub-continent—five well defined areas, their political significance. Importance of the Himalaya—relations with Nepal, Tibet, Burma, China, Afghanisthan and Central Asia. Importance of the Vindhyas—barrier to unification. Importance of the Indian Ocean. Maritime contacts. Islands in the Indian Ocean. Pattern of trade. Different attitudes of Northern and Southern India towards the sea.

(b) Man in India—different races, languages, religions, ways of life—evolution of a composite culture.

(c) Unity in Diversity.

Chapter II : *Sources of Indian History.*

Varied sources of history—the romance of archaeology—stories of several momentous excavations, e. g. Mahenjodaro, Sanchi, Nalanda. Inscriptions—their deciphering, e. g. Prinsep and Asokan inscriptions. Coins as a source—importance of numismatic evidence—significant illustrations from Indian History. Ancient monuments—their importance in the study of Indian History. Character of literary evidence in the ancient, medieval and modern periods (suitable illustrations to be given).

Chapter III : *Indus Valley Civilization*—(with some reference to other contemporaneous civilizations).

Chapter IV : *Coming of the Aryans in India*—their social life and institutions—extent of non-Aryan influence.

Chapter V : *Religious reform movements*—Buddhism and Jainism—their organization, literature and art. (Buddhist art in India, Ceylon, China, Indo-China and Central Asia should be referred to).

Chapter VI : *Growth of Magadha : Maurya Empire.*

Political conditions in the sixth century B. C.—the sixteen Mahajanapadas—monarchy and republic—Growth of Magadha —Nandas—Alexander's invasion of North-western India—the Maurya Empire—international relations—Chandragupta—Bindusara. Asoka, his Dhamma—his character and place in history.

Mauryan administrations— Megasthenes— evidence of Kautilya. Central and Provincial Governments.

Maurya Art—Persian influence (with suitable illustrations).

Chapter VII : *Foreign invasions and cultural impact.*

Fall of the Maurya Empire—the Sungas and Kanvas in the North and the Satavahanas in Central and South India—beginning of Puranic Hinduism.

Foreign invaders—Bactrian Greeks—the new cultural impact—Gandhara art—Greek influence on coins. The Parthians—the Sakas—the Kusanas.

The Kusana Dynasty—Kanishka—emergence of Mahayana Buddhism— The Buddhist Council—Asvaghosa, Jivaka, Panini Patanjali, Gunadhaya, Charaka, etc. Taxila University. Relations with the neighbouring countries, specially China.

Missionary activities abroad—export of art forms to China and Central Asia—Social changes—deterioration of the status of woman.

Expansion of trade in the Mauryan and post-Mauryan periods—beginning of trade with Rome—routes and ports.

Chapter VIII : *The Classical Age.*

Gupta expansion—Samudra Gupta—Chandra Gupta II—Skanda Gupta and the Hunas—Gupta rule in Bengal—Fa-Hien's account.

Gupta administration—Society—economy—colonial expansion—highly developed trade and industry—Vaisnavism or Bhagabat cult—literature and science—Gupta art. Political disintegration after the Guptas—Harsavardhana. Struggle for Kanauj—emergence of Bengal as a great power—Sasanka, Early history of Orissa—Kharavela—Khandagiri and Udayagiri inscriptions and art—Emergence of Kamrupa (Assam) in history — Nidhanpur Copper Plate—Khurdah Plates. Harsha's Empire

—*Hiuen-Tsang's account—Nalanda University—Banabhatta —Harsha's defeat in the hands of Pulakesin II, Chalukya.*

Chapter IX : *South India : Orissa.*

The Chalukyas, the Pallavas, the Cholas, and the Pandyas. The Chalukya-Pallava contest for mastery of Southern India—Pallava art—Vaisnava Alwars and Saiva Nayanars—Chalukya art. Rastrakuta-Pratihara-Pala contest for Kanauj. Art of Ellora. The Chola conquest and expansion to the Malaya Peninsula—Sri Vijaya and Ceylon. Chola administration. Rajarajeswara temple at Tanjore.

Different dynasties of Orissa. The Ganga revival—The great temples of Puri, Bhubaneswara and Konaraka.

Chapter X : *Bengal under the Palas and Senas.*

Growth of Pala power—Monghyr Grant, Nalanda Copper Plate—Gwalior Inscriptions of Bhoja. Local dynasties emerge during Mahipala II's rule. Rajendra Chola's invasion. Kalachuri invasion, Rise of indigenous chieftains—Kaivarta Rebellion —Ramapala. Buddhist revival—Uddandapura and Vikramsila —mission of Dipankar—Chakrapani and Sandhyakara, Dhiman and Bitapala—Buddhist Tantrik religion and practices—tolerance in religion of Pala kings—terracota figurines at Paharpur.

The Senas—Brahmanical revival—glory of Vikrampur. Ballala Sena and Kulinism. Laksmana Sena reduces Kamarupa. Joyadeva and Dhoyi. Moslem conquest of West and North Bengal.

Chapter XI : *Muslim Advent into India.*

Rise of Islam in Arabia—Arab invasion of Sind—spread of Islam in Central Asia and India—the Ghaznavids—Albiruni and his account. Resistance of the Gurjara-Pratiharas and the Rastrakutas in the West and the Sahiyas in the North-west.

Rise of the Rajput principalities—discussion of orgin. The Gurjara-Pratihara Empire. Pratihara-Rashtrakuta-Pala contest. Bhoja—Mahendrapala I and Mahipala. Internal dissensions invite foreign aggression. Muhammad of Ghor's invasion—establishment of the Delhi Sultanate by Kutubuddin —North and West Bengal brought under Turkish rule.

ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ

সূচনা : পূর্বে ইতিহাস ছিল ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ ; ইতিহাস আলোচিত হইত ঘটনার প্রচ্ছদপটে। রাজা, সম্রাট, মন্ত্রী বা সেনাপতির কার্যাবলী, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, ধর্মগুরুর কীর্তিকলাপ, কখনও বা আকস্মিক অথবা নৈসর্গিক ঘটনাই ছিল প্রধানতঃ ইতিহাসের আখ্যান বস্তু। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ঐতিহাসিকের নিকট ছিল নিষ্প্রয়োজনীয়। বর্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞানের কৃপায় পৃথিবী ক্ষুদ্রতর হইয়াছে, সময় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশ পরস্পর নিকটতর হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের প্রতিবেশী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করেন মানুষের সামগ্রিক জীবন ও জীবনের সামগ্রিক কাহিনী। পৃথিবীর দীনতম মানুষও আধুনিক ঐতিহাসিকের নিকট অপাংক্তেয় নহে। বর্তমান যুগে ইতিহাসের নায়ক হইল মানুষ, প্রচ্ছদপট হইল তাহার পরিবেশ।

ইতিহাসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

মানুষ ও পরিবেশ

মানুষ কথাটি সংক্ষেপ, পরিবেশ কথাটি ব্যাপক। মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি, আবার মানুষও পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ ও তাহার পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া গড়িয়া তুলিয়াছে পরিবার। পরিবার কালক্রমে পরিণত হইয়াছে গোষ্ঠী বা সমাজে। সমাজের পরিণতি হইয়াছে রাষ্ট্রে। যুগে যুগে পরিবেশের প্রভাবে মানুষ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ, রূপ এবং কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াছে। পরিবেশের মৌলিক উপাদান হইল ভৌগোলিক সংস্থান—ভূখণ্ডের আবয়বিক গঠন। যথা—পর্বত, উপত্যকা, স্রোতস্বতী, মরু-কান্তার, সমতলভূমি, মালভূমি, বনাঞ্চল, জলবায়ু, খাদ্যবস্তুর সুলভতা বা দুর্লভতা। ভৌগোলিক সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়াই নির্ণীত হয় মানুষের স্থিতি, গতি এবং পরিণতি।

পরিবেশ মানুষ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে মানুষ পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত করিয়া লয়। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্যই

মানবজাতির অগ্রগতির মূল। মানুষের দৈহিক শক্তি সীমাবদ্ধ; প্রকৃতির শক্তি সীমাহীন। আদিম যুগে মানুষ যখন একমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করিত, মানুষ দেখিত যে তুষারাচ্ছন্ন পর্বত, খরস্রোতা নদনদী, নির্মম মরুভূমি, হিংস্র শ্বাপদ, দুর্বার জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্ঘটনা মানুষের সঙ্গে ক্লান্তিহীন শত্রুতা করিয়া চলিয়াছে। দুর্বল মানুষ প্রথমে এই প্রাকৃতিক শত্রুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছে—খাদ্যান্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে অভিযান করিয়াছে, নদনদী অতিক্রম করিবার জন্য নৌযান নির্মাণ করিয়াছে; বন ও মরু অতিক্রম করিবার জন্য অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু বশীভূত করিয়াছে; শ্বাপদকে প্রতিহত করিবার জন্য অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহনির্মাণ করিয়াছে, নগর পত্তন করিয়াছে; ব্যাধি জয় করিবার জন্য বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের মধ্যে ভেষজশক্তি আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষ প্রকৃতির সমস্ত বাধা জয় করিয়া প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে—এমন কি বারি-বিদ্যুৎ-বাষ্প-অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা ও সিদ্ধিই হইল মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস।

প্রকৃতি ও মানুষ

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই, তখন দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থানের উপর দেশবাসীর জীবন ও চরিত্র বহুলাংশে নির্ভর করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস এবং মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীস: গ্রীস তিন দিকে সাগরবেলা বেষ্টনাবদ্ধা, মধ্যভাগ পর্বতখচিতা। গ্রীসের বহির্ভাগে দ্বীপময় সেতু। ভৌগোলিক অবস্থানহেতু সমুদ্রতীরবাসী গ্রীকসন্তানগণ নৌবিদ্যাকুশল এবং বাণিজ্যমুখী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত-প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চলে গ্রীসের অনেকগুলি নগর ও রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দ্বীপময় সেতু সাহায্যে গ্রীকগণ বহু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, বৃহত্তর গ্রীস গঠন করিয়াছিল। বাণিজ্য, নগর-রাজ্য ও উপনিবেশ—গ্রীকজাতির এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই ভৌগোলিক সংস্থানের অবস্থান।

ইংলণ্ড: ইংলণ্ড চতুর্দিকে সাগর-বেষ্টিতা। প্রকৃতি ইংলণ্ডে খাদ্য-শস্য উৎপাদনে কৃপণ, ইংলণ্ডের জলবায়ু বর্ষা, তুষার ও শীতপ্রধান। সমুদ্রসান্নিধ্য-হেতু ইংলণ্ডের অধিবাসী সমুদ্রমুখী; খাদ্যশস্যের অপ্রাচুর্য হেতু ইংরাজ জাতি বাণিজ্যাপেক্ষী ও শিল্পাশ্রয়ী। বর্ষা, তুষার ও শীতের আধিক্য হেতু ইংরাজ জাতি সর্বক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শরীর ও মন দৃঢ় করিয়া লইয়াছে। ইংরাজ জাতি আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল।

সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানবের জাতীয় জীবন গঠনে ভৌগোলিক সংস্থান ও পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

ভারতবর্ষও ইহার ব্যতিক্রম নহে। প্রাকৃতিক গঠনে এবং পরিবেশের প্রভাবে ভারতবর্ষও অসামান্য শ্রী, অপূর্ব ধী এবং লোভনীয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমারেখা : বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে,—"যে দেশ হিমাদ্রির দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে অবস্থিত, যে দেশে ভরতের সন্ততি বাস করে এবং যাহা **ভারতবর্ষ** বা **ভারত** নামে খ্যাত।" বায়ুপুরাণেও এই প্রাচীন ভারতীয় সীমারেখা সমর্থিত হইয়াছে।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে তিনটি উপদ্বীপ আছে—পশ্চিমে আরব, পূর্বে ইন্দোনেশিয়া, মধ্যস্থলে ভারতবর্ষ। সমুদ্র ও পর্বত ইহার ভৌগোলিক সীমাকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের তিন দিকে জল। ভারতমাতার শীর্ষে হিমকিরীট, কটিদেশে বিন্ধ্য মেখলা ; পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ভারতমাতার অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছে ; দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের জলরাশি এই পুণ্যভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণে সিংহল দ্বীপ ভারতমাতার চরণতলে চির-প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্তমান ভারতের পরিচয়

ঐতিহাসিক যুগে বিভিন্ন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সীমারেখা সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়াছে। বৈদেশিক জাতি কখনও গান্ধার, কাশ্মীর বা সিন্ধু অঞ্চল জয় করিয়া ভারতের রাজনৈতিক সীমা সংকুচিত করিয়াছে। অন্যদিকে কখনও ভারতীয়গণ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া ভারতের সীমারেখা প্রসারিত করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গান্ধার ভারতের অংশ ছিল। তুর্ক-আফঘান আক্রমণের সমকালে গান্ধার ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুনরায় মুঘল যুগে বাবরের সময় উহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। নাদীর শাহের সময়ে আফঘানিস্থান পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ যুগে কিছুকাল ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল, পরে উহা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। শিখ সর্দার রঞ্জিৎ সিংহ কাবুল জয় করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, বাংলার পূর্বাংশ ও আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মূলতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস স-পাকিস্তান ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। মাত্র ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাকিস্তান-বিবর্জিত ভারতের ইতিহাস।

ভারতবর্ষের (স পাকিস্তান) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার প্রায় ২,৫০০ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ২,০০০ মাইল। মোট আয়তন প্রায় ১৮,০০,০০০ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৬,০০০ মাইল স্থল সীমান্ত। তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৪০০ মাইল। জনসংখ্যা (স-পাকিস্তান) প্রায় ৩৯ কোটি।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রকৃতি গিরি-সাগর দ্বারা বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগকেও প্রকৃতি নদী, পর্বত, মরু, কান্তার ও অরণ্য দ্বারা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির বিধানে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত একটি ভাগ—উহার নাম **আর্যাবর্ত**। বিন্ধ্য হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অন্য একটি ভাগ—উহার নাম **দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণাপথ** বা **দক্ষিণাবর্ত**। এই অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে সাগর হইতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

আর্যাবর্তের তিনটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক ভাগ রহিয়াছে :—

(১) **পর্বতাশ্রয়িন বা হিমালয় অঞ্চল :** পামীর পর্বত-সন্ধি হইতে এই পার্বত্য অঞ্চলের আরম্ভ, ব্রহ্মের সীমান্তে ইহার পরিসমাপ্তি। এই অঞ্চল দৈর্ঘ্যে ২,৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ২০০ মাইল। হিমালয় অঞ্চল গিরিশৃঙ্গ, নির্ঝরিণী, উপত্যকা-খচিত। এই সুবিশাল অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল নানা রাজ্য বা দেশখণ্ড, যথা—গান্ধার, কাশ্মীর, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভুটান ও ব্রহ্ম। এই সমগ্র অঞ্চলই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। পুরাণ-বর্ণিত কৈলাস ও মানস সরোবর, ঋষি কশ্যপের সাধনাক্ষেত্র কশ্যপমীর বা কাশ্মীর, মহাভারতে বর্ণিত গান্ধারীর পিতৃভূমি গান্ধার, ভগবান তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল :** এই অঞ্চলেই ভারতে আর্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। উপনিবেশের অগ্রগতি অনুসারে আর্যগণ ভারতবর্ষের তিনটি নামকরণ করিয়াছিল, যথা—(ক) **ব্রহ্মাবর্ত**—অধুনালুপ্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব-পঞ্জাব ও রাজপুতনার কিয়দংশ। (খ) **ব্রহ্মর্ষিদেশ**—কুরুক্ষেত্র, শূরসেন, মৎস্য ও পাঞ্চাল অর্থাৎ বর্তমান দিল্লী, মথুরা, জয়পুর ও গঙ্গা-যমুনার দো-আব অঞ্চল। (গ) **মধ্যদেশ** অর্থাৎ হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যভাগে বিনশনের পূর্ব হইতে (রাজপুতানার যে অঞ্চলে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী বিলীন হইয়া গিয়াছে অথবা বর্তমান পাতিয়ালা) প্রয়াগের পশ্চিম পর্যন্ত।

পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে আর্যাবর্তের এই অংশের দুইটি বিভাগ—**প্রতীচ্য ও প্রাচ্য**। পঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্যন্ত ভূভাগ **প্রতীচ্য** (পশ্চিম দেশ) এবং বারাণসী হইতে কামরূপ পর্যন্ত **প্রাচ্য** (পূর্ব দেশ)।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল :** আরাবল্লী পর্বতের পূর্ব হইতে ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ এবং উড়িষ্যার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। এই অঞ্চল ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্বত ও গভীর অরণ্যানী সমাকীর্ণ। মধ্যভারত, বিহারের দক্ষিণাংশ এবং উড়িষ্যার উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সমগ্র দাক্ষিণাত্যও দুইটি ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত, যথা—

(১) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি :** বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ হইতে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিভুজাকার ভূখণ্ড, উড়িষ্যার কিয়দংশ, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং বোম্বাই-এর অল্পাংশ। এই অঞ্চলের উপর দিয়া নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হইতেছে।

(২) **সমুদ্রোপকূলবর্তী নিম্ন সমভূমি :** দাক্ষিণাত্যের মালভূমিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া দুইটি পর্বতমালা পূর্ব ও পশ্চিমে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ও দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে মিলিত হইয়াছে; উহারা পশ্চিমঘাট (সহ্যাদ্রি) ও পূর্বঘাট (মহেন্দ্রগিরি) নামে পরিচিত। এই দুই পর্বতের পার্শ্বদেশে দুইটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অঞ্চলের ভূভাগ অত্যন্ত নিম্ন, কোথাও বা সমুদ্রগর্ভ হইতেও নিম্নতর। এই অঞ্চলে প্রাচীন চের, চোল, পাণ্ড্য এবং বর্তমান কেরল, মহীশূর এবং মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি অবস্থিত।

ইতিহাসে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক গুরুত্ব

হিমালয় পর্বত হইতে নিঃসৃত তিনটি নদীজলধারা-বিধৌত বৃহৎ অঞ্চল সাধারণভাবে **আর্যাবর্ত** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের মুসলমান প্রদত্ত নাম **হিন্দুস্তান**। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে সিন্ধু ও উহার পঞ্চ শাখা—শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী, মধ্যমাংশে গঙ্গা, যমুনা ও উহাদের উপনদী এবং পূর্বাংশে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। হিমালয়ের তুষারবিগলিত জলধারাপুষ্ট এই নদীগুলি সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বর্ষায় এই অঞ্চলে প্রচুর পলল মৃত্তিকা (পলিমাটি) সঞ্চিত হয়। ফলে এই অঞ্চল সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা। আর্যাবর্তের প্রতীচ্য ভাগে একটি অববাহিকার পার্শ্বে সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছিল। ভারতে আর্যগণ এই পঞ্চনদ-সেবিত অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আর্যগণ নদীর মাহাত্ম্যে তন্ময় হইয়া নদীগুলিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, স্তব-স্তুতি পাঠ করিতেন। তাঁহারা শ্রাদ্ধ-তর্পণ ক্রিয়াকে পুণ্য-উদক সিঞ্চন করিয়া পবিত্র করিতেন।

নদীবিধৌত অঞ্চলের গুরুত্ব

মধ্যযুগে এই অঞ্চলের ঐশ্বর্যে ও সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া তুর্ক, তাতার, পাঠান, মুঘল উত্তর ভারতেই প্রথম রাজ্য জয় ও বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বর্তমান যুগে ইংরাজগণ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বাংলা দেশের ধনরত্নে আকৃষ্ট হইয়া বাংলা দেশকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র ভারতে সুবিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। একবার যে জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, সে জাতি কখনও স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করে নাই।

উত্তর ভারতের নদীগুলি ছিল এই সুবিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

মধ্যে চলাচলের পথ ও মিলনের সেতু। এই সকল নদনদীর তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছে উত্তর ভারতের বহু বৃহৎ নগরী, বাণিজ্যকেন্দ্র, পুণ্যতীর্থ ও তপোবন। উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ নদীমাতৃক। প্রকৃতির অকৃপণ দানে এই অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্য ছিল সহজলভ্য, জীবনযাত্রার পথ ছিল সুগম। সুতরাং অধিবাসীদের অবসর ছিল প্রচুর। সেইজন্যই তাহারা ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই নদীতটবর্তী অঞ্চলই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল।

অন্যদিকে এই সমৃদ্ধির অবাঞ্ছিত ফল ভারতবাসীর জীবনে বহু অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল। অনায়াসলব্ধ খাদ্যসম্ভার ও সহজ জীবনযাত্রা নদীতীরের অধিবাসীকে স্বভাবতঃই শ্রমবিমুখ ও কর্মকুণ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য এই সমভূমির উত্তর-পশ্চিমে রাজপুতনার মরু অঞ্চলবাসিগণ বিদেশী আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধের ফলে শ্রমসহিষ্ণু, দুর্ধর্ষ ও রণনিপুণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উত্তর ভারতের গুরুত্ব অধিক। আর্য-সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ এবং প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলেই হইয়াছিল। উত্তরাপথের প্রাচীন যুগে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, মধ্যযুগে তরাইনের দুইটি যুদ্ধ, পাণিপথের তিনটি যুদ্ধ এবং আধুনিক যুগে পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। উত্তরাপথের অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, কনৌজ, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি সর্বভারতীয় রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, কাশী, নালন্দা, নবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলি এই উত্তরাপথেই অবস্থিত।

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক গুরুত্ব

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রকৃতি উত্তরাপথের ভূ-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পর্বতময় এবং বন্ধুর। এই অঞ্চলের নদীগুলি বন্ধুর পার্বত্য ভূখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া উহারা স্বভাবতঃই খরস্রোতা, নৌকা চলাচলের অনুপযোগী; সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক—ফলে এই নদীগুলির তীরে উল্লেখযোগ্য বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের আর্য-বিতাড়িত দ্রাবিড় জাতি দাক্ষিণাত্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের গুরুত্ব

সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চি পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে প্রত্যক্ষ শাসন পরিচালনা অসম্ভব মনে করিয়া তিনি বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করেন। আলাউদ্দীন খল্‌জীর পূর্ব পর্যন্ত স্থলপথে এবং ব্রিটিশের আগমন পর্যন্ত জলপথে কোন বৈদেশিক জাতি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ

করে নাই। মুহম্মদ তুঘলক মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার্থ দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে তাঁহার রাজধানী পরিবর্তন করেন—কিন্তু তাঁহার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দক্ষিণের অধিবাসিগণ উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই দাক্ষিণাত্যেই মারাঠাবীর শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যেই আওরঙ্গজেবের দেহের সমাধি এবং গৌরবেরও সমাধি। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের কোন শক্তিই উত্তর ভারতে সুদৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

উত্তর ভারতের অধিবাসিদের সঙ্গে যেরূপ বহির্ভারতীয় জাতির রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছিল, দক্ষিণ ভারতে সেরূপ হয় নাই। ফলে দক্ষিণের ধর্ম, ভাষা ও সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্যধারা বহুল পরিমাণে অমিশ্রিত ও অব্যাহিত রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির প্রভাব

হিম গিরিমালা উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে, সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে পৃথিবীর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ পর্বত'। প্রাচীন কবিগণ হিমালয়কে 'নগাধিরাজ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। হিমালয়ের মতন পৃথিবীর কোন পর্বত কোন দেশের স্বাতন্ত্র্য, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও চিন্তাধারাকে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে নাই। সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই হিমালয় অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে ভারতের শীর্ষদেশে বিরাজমান। গিরি হিমাচল ভারতবর্ষের সন্তানকে চিরকাল অভয় দান করিয়াছে, শাখারূপে দুইদিকে মঙ্গলহস্ত বিস্তার করিয়া চিরকাল তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছে। আর্যাবর্তের প্রধান নদী ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলি হিমালয় হইতে নিঃসৃত। হিমালয়ের তুষার বিগলিত জলধারায় এই নদীগুলি সম্বৎসর জলপূর্ণ থাকে; ফলে আর্যাবর্তের সমভূমি অতিশয় উর্বর ও শস্য-শ্যামলা—হিমালয়ের বনাঞ্চল বিপুল বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগের খনিজ সম্পদ অপরিসীম। হিমালয় মৌসুমী মেঘকে আপন বক্ষে প্রতিহত করে, নচেৎ এই দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত। উত্তরের দুরন্ত শীতবায়ু হিমপ্রাচীরে প্রতিহত হওয়ায় ভারতবর্ষ তুষার শীতলতা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতভূমি প্রকৃতই হিমালয়-দুহিতা। ভারতের ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, সভ্যতা ও ধর্ম যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে হিমালয়ের সহিত জড়িত। হিমালয়ের বন-উপবন, গিরি-গহ্বর আর্যঋষিদের তপস্যাক্ষেত্র। হিমালয়ের সৌন্দর্য ভারতীয় কবিদের প্রেরণা। ভারতবাসীর কল্পনায় হিমালয় দেবতাত্মা, হিমালয় দেবস্থান, হিমালয় স্বর্গভূমি।

হিমালয়ের প্রভাব

হিমালয়ের গিরিপ্রাচীর ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলেও এই গিরি-প্রাচীরের মধ্যে যে গিরিবর্ত্মগুলি রহিয়াছে, সেগুলি প্রাচীনকাল হইতেই হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং বহির্ভূত দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আফঘানিস্থান, কাশ্মীর, নেপাল ও ব্রহ্মদেশ হিমাচল অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। ইহাদের মধ্যে আফঘানিস্থান, নেপাল ও ব্রহ্মদেশ বর্তমানে রাজনৈতিক ভারতের বহির্ভূত। হিমালয়ের অপর প্রান্তে অবস্থিত তিব্বত, চীনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত বহ্লীক প্রদেশ অথবা বাল্ক, খোটান, কুচা এবং তুর্কীস্থানের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

হিমালয় পর্বতশ্রেণী যেমন ভারতবর্ষকে এশিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে, বিন্ধ্যপর্বতও তেমনি দক্ষিণ ভারতকে উত্তর ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন নর্মদা নদীর উত্তর তটভূমি হইতে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতমালা দাক্ষিণাত্যের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। এই পর্বত দক্ষিণ ভারতকে উত্তর ভারতের আক্রমণ এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন আর্যগণ বহুবার বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে আর্য সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে। কথিত আছে, ঋষি অগস্ত্য আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল হইয়াছিল, তিনি আর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সুতরাং নিষ্ফল যাত্রার নাম হইল 'অগস্ত্য যাত্রা'। এই কিংবদন্তীর পশ্চাতে অনেকখানি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। বিন্ধ্য গিরি-প্রাচীর পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। বিন্ধ্যের পশ্চিমে মালবের মালভূমি, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের অধিত্যকাভূমি। বিন্ধ্যপর্বতের অবস্থিতির জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের পূর্ণ মিলন সম্ভবপর হয় নাই এবং দক্ষিণ ভারতের কোন রাজশক্তি উত্তর ভারতে দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

বিন্ধ্যগিরির প্রভাব

জলপথে ভারতের সহিত বহির্ভারতের যোগাযোগ

ভারতবর্ষ তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত। সুতরাং সহজভাবেই সমুদ্রপথে বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে সমুদ্রপথ, ৫ম মণ্ডলে পণি জাতির (প্রাচীন ফিনিসিয় জাতি) সহিত বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধযুগে মৎস্য যন্ত্রের (magnetic compass) উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সমুদ্দ বণিজ্জ জাতকে' বৌদ্ধ শ্রমণ ও বণিকের সমুদ্রপথে যাতায়াতের কাহিনী বর্ণিত আছে। পরবর্তী কালে বাণিজ্য ব্যপদেশে বণিকগণ পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণ এবং হিন্দু প্রচারকগণ পশ্চিমে ও পূর্বে ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে গমনাগমন

করিয়াছেন। কোথাও বা পলাতক রাজপুত্র অথবা রাজ্যহীন রাজা পূর্বাঞ্চলের দ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন। কোথাও বা ভারতবাসী সংঘবদ্ধভাবে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পূর্ব দ্বীপাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।
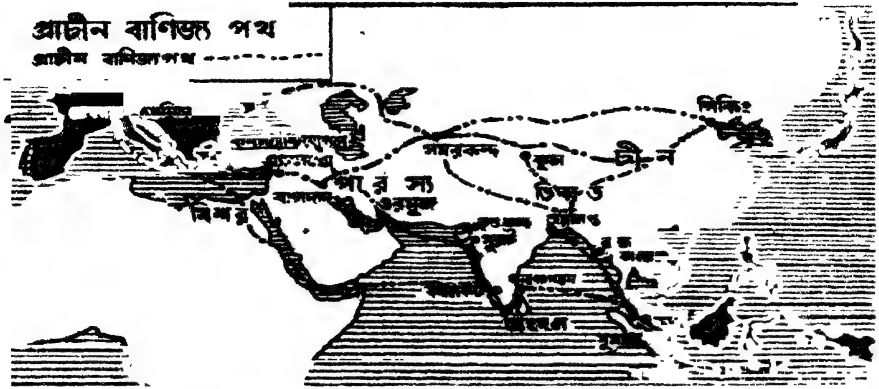
ভারতীয় বাণিজ্যের রূপ : ভারতীয় পণ্য জলপথে পারস্যোপসাগর ও আরব সাগর অতিক্রম করিয়া লোহিত সাগরের তীরে নীত হইত। তথা হইতে নীল নদের অববাহিকা পথে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিপণিতে বিক্রীত হইত। স্থলপথে ভারতীয় পণ্য পারস্য ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরাঞ্চল অতিক্রম করিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত পালমীরার বিখ্যাত বিক্রয়কেন্দ্রে আনীত হইত। পালমীরা হইতে স্থলপথে ভেনিসের বিপণিতে পৌছিত। মহারাজ অশোকের সময় ভারতীয় শ্রমণগণ বণিক প্রদর্শিত জল ও স্থল উভয়পথেই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। চীনের পণ্যসম্ভার ভারতীয় বণিকগণের মাধ্যমেই ইওরোপে নীত ও বিক্রীত হইত।

পথ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল এবং পূর্বে পারস্যোপসাগর ও তীরবর্তী অঞ্চল আরব জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান-মুসলমানের মধ্যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময় ভারতের সহিত ইওরোপের বাণিজ্যের মুখ্য অংশ আরবদের অধীনে চলিয়া গেল। তখন হইতে পশ্চিমে ভারতের বাণিজ্যপ্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মণিমুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, সুগন্ধি মশলা, সূক্ষ্মবস্ত্র প্রভৃতি পশ্চিমদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী বলেন—"ভারতীয় বিলাসদ্রব্যের জন্ত প্রতিবৎসর রোমানগণ ভারতবর্ষকে বহুলক্ষ রোমান মুদ্রা প্রদান করিত।" আরব ঐতিহাসিক আহম্মদ আমীন বলেন, "মুসলমান রাজ্যে এমন কোন সমৃদ্ধ নগর ছিল না যেখানে সিন্ধী বণিক এবং মুদ্রা বিনিময়কারী শ্রেষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না।"

পণ্য

ভারতের অধিবাসী

ভারতবর্ষ আয়তনে সুবিশাল, উহার জনসংখ্যা বিপুল। ভারতের প্রথম অধিবাসী ভারতবর্ষে জাত অথবা ভারতবর্ষে বহিরাগত—ইহা এখনও নিঃসন্দেহ নির্ণীত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস দাক্ষিণাত্যে অথবা উত্তর ভারতে আরম্ভ হইয়াছিল—এ প্রশ্নেরও সমাধান হয় নাই। ভারতের প্রথম লিখিত ভাষা দ্রাবিড় অথবা সংস্কৃত—এ সমস্যাও অমীমাংসিত। ভারতে অদ্যাপি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অবিসংবাদিত নরকঙ্কাল অথবা জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের প্রাচীনতম ভাষার কোন ক্ষোদিত বা লিখিত নিদর্শন নাই। মহেঞ্জোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসীর পরিচয় অধিকাংশই অনুমানসাপেক্ষ। পণ্ডিতগণ নবাবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র হইতে অনুমান করেন যে, ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন স্তরে গঠিত হইয়াছে, যথা—**প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, ধাতু বা তাম্র যুগ**। সর্বশেষ স্তরে আসিয়াছে **ঐতিহাসিক যুগ**।

ভারত-ইতিহাসের সমস্যা

আর্য আগমন হইতে ভারতের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক যুগে বহিরাগত আর্যদের সহিত প্রাচীন ভারতবাসীর দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম হইয়াছিল। বিজেতা আর্যগণ এই সকল বিজিত জাতির নামকরণ করিয়াছিল অসুর, দৈত্য, দানব, রক্ষ, যক্ষ, নাগ, অপ্সরা, দাস, কিরাত প্রভৃতি। কালক্রমে ইহারা কেহ বা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, কেহ বা বনাঞ্চলে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যথা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে; আবার কেহবা আর্য জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

প্রাক্‌বৈদিক ভারতবাসী

গৌতম বুদ্ধের সমকালে ইরাণের আকামেনীয়গণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারাও কালক্রমে ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নন্দবংশের রাজত্বকালে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ভারতের সীমান্তে বহ্লীক বা বাক্‌ট্রিয়া অঞ্চলে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কালক্রমে গ্রীকগণও সীমান্তবর্তী ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বহু বৈদেশিক জাতি ভারতে আগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্য শক, পহ্লব, ইউচি, কুষাণ ইত্যাদি জাতি ভারতীয় জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে মধ্যএশিয়া হইতে হুন, গুর্জর জাতি দাক্ষিণে গুজরাট এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্তিকালে তাহারা হিন্দুর ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ভারতীয় জাতির

বহিরাগত জাতি

সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে এই জাতিগুলি রাজপুত নামে অভিহিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজপুত জাতি মিশ্রজাতি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইরাণের পারসীক জাতির একটি অংশ সমুদ্রপথে আসিয়া ভারতের সিন্ধু, গুজরাট এবং বোম্বাই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। এই জাতি অদ্যাবধি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং ইহারা 'পারসী' নামে পরিচিত।

অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিন্ধুদেশে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে গজনী এবং ঘুর অঞ্চল হইতে বহু তুর্ক, আফঘান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও পঞ্জাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া তিনশত বৎসর পর্যন্ত তুর্ক, আফঘান, মুঘল, তাতার, পারসীক প্রভৃতি জাতি ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই বহিরাগত জাতিগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভারতবাসীর সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া একটি ভারতীয় মিশ্র মুসলিম জাতি গঠন করিয়াছে। এই সময় চীন, মধ্য এশিয়া, তিব্বত এবং ব্রহ্ম হইতে মোঙ্গল জাতির বিভিন্ন শাখা হিমালয়ের পাদদেশে বসবাস আরম্ভ করে। বর্তমানে এই সকল মোঙ্গল জাতির শাখা কাশ্মীরের লাদক, চিত্রল, কুমায়ুন, গাড়োয়াল; হিমাচল অঞ্চলের নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং বাংলার চট্টগ্রাম, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চলে বসবাস করে। মোঙ্গল জাতি ভারতের অতি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই বা করিতে পারে নাই।

মুসলিম জনতা

মোঙ্গল জাতি

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে পশ্চিমের জলপথে পর্তুগীজগণ পশ্চিমে গোয়া এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। ভারতীয় গোয়ানীজ এবং পূর্ববঙ্গের উপকূলবাসী খ্রীষ্টানগণ অনেকেই এই পর্তুগীজ জাতির বংশধর। ভারতীয়দের সহিত তাহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্ম জাতির বংশধরগণ 'মগ' নামে পরিচিত। বাংলা দেশে বর্মণ উপাধিধারী গোষ্ঠীর সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অনুমান করা যায়। অনেকের ধারণা বর্মণগণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের উত্তর পুরুষ।

ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা: ব্রিটিশযুগের পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে লোকসংখ্যা গণনা ও জনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান হয় নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার হার্বার্ট রিজলী ভারতের অধিবাসীদের একটি অসম্পূর্ণ কোষ্ঠী রচনা করেন। তিনি ভারতবাসীদের প্রধানতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন—(১) মোঙ্গলীয়, (২) ভারতীয় আর্য, (৩) দ্রাবিড়, (৪) মোঙ্গলীয়-দ্রাবিড়, (৫) আর্য-দ্রাবিড়, (৬) শক-দ্রাবিড় এবং (৭) তুর্ক-ইরাণীয়। রিজলী সাহেব ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে বিজেতা-সুলভ কয়েকটি অযথা মন্তব্য করিয়া তাঁহার বিবরণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়াছেন।

রিজলী সাহেবের জাতিবিভাগ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় একখানি পুস্তকে রিজলী সাহেবের মত খণ্ডন করেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লোক-গণনার সময় ডক্টর হার্টন ভারতের অধিবাসিদিগকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ভারতবাসীকে ছয়টি মূল বিভাগ ও নয়টি উপবিভাগে বিভক্ত করেন, যথা—

(১) **নেগ্রিটো জাতি :** ইহাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকার নিগ্রো। বর্তমানে ভারতের জনসমুদ্রে ইহারা বিলীন। তাহাদের বংশধর আন্দামান-নিকোবর এবং সামান্য পরিমাণে কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর, আসামের নাগা অঞ্চল ও রাজমহলে ছড়াইয়া আছে। এই জাতি খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতকেশ।

(২) **আদিম অস্ট্রেলয়েড জাতি :** এই জাতি ইন্দোচীন হইতে আগত। ইহাদের বহু অংশ ভারতের বিবিধ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এক অংশ ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া দেশে গমন করিয়াছে। সুতরাং ইহারা সাধারণভাবে আদিম অস্ট্রেলিয় বা প্রোটো অস্ট্রেলিয় জাতি নামে অভিহিত। ইহারা কৃষ্ণকায়, প্রশস্ত ললাট, স্থূলনাসিক।

(৩) **মোঙ্গলীয় জাতি :** ইহারা মধ্য এশিয়া ও হিমালয়ের অপর প্রান্ত হইতে আসিয়া ব্রহ্ম, আসাম, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে। সিকিম, ভুটান, নেপাল, গাড়োয়াল, লাদক ও হিমালয়ের সমীপবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ মোঙ্গল জাতির বংশধর। কেহ কেহ এই জাতির মধ্যে প্রাচীন কিরাত, কিন্নর প্রভৃতি জাতির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা বিরলশ্মশ্রু, খর্বনাসিক, অ-কৃষ্ণবর্ণ।

(৪) **ভূমধ্যসাগরীয় জাতি :** ইহাদের আদি নিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। নৃতত্ত্ববিদ্গণের মতে ইহাদের তিনটি শাখা। আদিম শাখা সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ইহুদী নামে পরিচিত। দীর্ঘ নাসিকা, গৌর বর্ণ এই শাখার বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় শাখা ইওরোপীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পঞ্জাব এবং উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে ইহাদের বসতি। তৃতীয় শাখা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যমাকার, অপুষ্ট-দেহ—সম্ভবতঃ ইহারা দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষ। বর্তমান কানাড়ী, তামিল ও মালয়ীগণ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **পাশ্চাত্ত্য প্রশস্তশির জাতি :** পাশ্চাত্ত্য প্রশস্তশির জাতি আল-পাইন, দীনারীয় ও আর্মেনীয় জাতির সমবায়ে গঠিত। আলপাইন শাখা গুজরাট, মধ্যভারত, উত্তর প্রদেশ ও বিহার হইয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। দীনারীয় শাখা কনাদ, তামিলনাদ, উড়িষ্যা ও বাঙলাদেশে আগমন করে। বোম্বাই অঞ্চলে পারসী জাতি আর্মেনীয় শাখার সন্তান।

(৬) **নর্ডিক বা আর্য ভাষাভাষী জাতি :** আর্য ভাষা-ভাষী এই জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের চীৎপাবন ব্রাহ্মণ, মধ্য ও উত্তর প্রদেশের কনৌজী

ভারতীয় জাতি-পরিচয়

নেগ্রিটো

আদিম অস্ট্রেলয়েড

মোঙ্গলীয়

ভূমধ্যসাগরীয়

ভারতীয় জাতি-পরিচয়

পাশ্চাত্য প্রশস্তশির
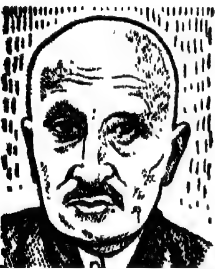
পাশ্চাত্য প্রশস্তশির

নর্ডিক বা আর্য

ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ এবং ভারতের অন্যান্য অংশের উচ্চবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নর্ডিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডক্টর গুহের মতে এই জাতি খ্রীষ্ট-পূর্ব ২,০০০ হইতে ১,০০০ বৎসর পূর্বে ভারতে আগমন করিয়াছিল।

মোটের উপর ভারতের জনসমুদ্রে বহুজাতির রক্ত-সংমিশ্রণ হইয়াছে। ডক্টর গুহ বলেন, ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নৃতাত্ত্বিক বিভাগ করা সম্ভবপর নহে, কারণ ভারতে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন জাতিগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, (১) নর্ডিক বা বৈদিকগণ (তৎসঙ্গে আলপাইন দিনার জাতির রক্তও রহিয়াছে) উত্তর-পশ্চিম ভারতে, (২) দ্রাবিড় বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি দক্ষিণ ভারতে, (৩) আদিম অস্ট্রোলয়েড ও নেগ্রিটো জাতি সর্বভারতের নিম্নশ্রেণী এবং পার্বত্য ও বন্যজাতির মধ্যে এবং (৪) মোঙ্গল জাতি ভারতের উত্তর ও পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল ও সানুদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে।

জাতিবিভাগ অসম্পূর্ণ

ভারতের ভাষা

একদিকে যেমন ভারতে বহু জাতি ও বর্ণের সংমিশ্রণ, তেমনই বহু ভাষারও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন, সমৃদ্ধ এবং সর্বোত্তম ভাষা 'দেব ভাষা'; উহার পরবর্তী নাম সংস্কৃত। ভারতবর্ষই সংস্কৃত ভাষার জননী। সংস্কৃত ছিল ভারতীয় আর্যজাতির ভাষা; ঋক্‌বেদ দেবভাষা তথা সংস্কৃত ভাষার আদিমতম গ্রন্থ। আর্যদের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। আর্যজাতির আগমনের পূর্বে ভারতের অধিবাসীরা ম্লেচ্ছ, পৈশাচ, দ্রাবিড় এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিত। অতি প্রাচীন যুগের ভাষার নিদর্শন অদ্যাবধি সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডভাষা এবং আসাম-ব্রহ্মের খ্‌মের ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মতান্তরে ভারতের প্রাচীন ভাষাগুলি কালক্রমে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর্যজাতির আগমনের পরে পৈশাচ ও ম্লেচ্ছ ভাষা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগে দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি ভাষার জননী দ্রাবিড় ভাষা। এই ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা।

ভারতের প্রাচীন ভাষা

উত্তর ভারতের লৌকিক ভাষার জননী সংস্কৃত। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষাই সংস্কৃত ভাষার আদর্শ। এই ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে পশ্চিমে পাঞ্জাবী, রাজস্থানী ও গুজরাটি ভাষা, উত্তরে পাহাড়ী ভাষা এবং পূর্বে হিন্দী ও উহার বিভিন্ন রূপ। এই সমস্ত ভাষা ব্যতীত উত্তরে কাশ্মীরী, পশ্চিমে সিন্ধী ও কাচ্ছী, দক্ষিণ-পশ্চিমে মারাঠী এবং পূর্বে বিহারী, বাঙ্গালী, অহমিয়া (অসমীয়া) এবং ওড়িয়া ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই

সংস্কৃতের স্থান

ভাষাগুলি আর্য ও আর্যেতর ভাষার সংমিশ্রণে এবং লৌকিক প্রভাবে নানা-প্রকার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় ধর্মের ভাষা ছিল সংস্কৃত। মহারাজ অশোকের শিলালিপি হইতে অনুমান করা যায়, প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয় সর্বজনবোধ্য ভাষা ছিল। সেইজন্যই মহারাজ অশোক প্রাকৃত ও স্থানীয় ভাষায় তাঁহার লিপি ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সমভাবেই প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কুষাণ এবং গুপ্তযুগের রাজভাষা ও ধর্মের ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই যুগে রচিত নাটকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষারও ব্যবহার দেখা যায়। কুষাণ ও গুপ্ত যুগেই সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থান হইয়াছিল নিঃসন্দেহ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধু অঞ্চলে আরবী ভাষা প্রচলিত হয়। আরবগণ সিন্ধী ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করে। তুর্ক-আফঘানদের সময়ে ভারতে ফার্সী ভাষার প্রচলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে উর্দু বা শিবিরবাসী তুর্ক-আফঘান সৈন্যগণ উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী ভাষা ফার্সী এবং তুর্কী ভাষার সংমিশ্রণে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি ভাষার প্রচলন করিয়াছিল। উহার নাম উর্দু ভাষা বা শিবিরের ভাষা। ইহার লিপি আরবীয়, ব্যাকরণ হিন্দুস্থানী; শব্দের অর্ধেক ভাগ ফার্সী, তুর্কী ও আরবী মিশ্রিত।

আরবী, ফার্সী, উর্দু

আরবী ভাষা মুসলমানের ধর্মের ভাষা। ফার্সী ভাষা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাজভাষা। বহু হিন্দু রাজকার্যের সুবিধার জন্য এবং রাজকর্মচারী পদ লাভের জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। সেকেন্দার লোদীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দী অক্ষরে এবং ভাষায় রাজ্যের আয়ব্যয় লিখিত হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দুমন্ত্রী টোডরমলের পরামর্শে হিন্দীর পরিবর্তে ফার্সী ভাষায় আয়ব্যয় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল-পত্র লিখিত হইত। আরবী ও ফার্সী ভাষা ডানদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়। কিন্তু অঙ্ক লিখনের সময়ে ভারতীয় লিপি অনুকরণে বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিত হয়। মুসলিমগণ অঙ্কের ভাষাকে নামকরণ করিয়াছেন—**হিসাব-ই-হিন্দ** অর্থাৎ **ভারতের অঙ্ক**।

মুসলিম যুগ
রাষ্ট্রভাষা ফার্সী

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বহু সাধু, সন্ত, সুফী এবং ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হয়। এই সকল ধর্মপ্রবর্তক মৌলিক ভাষায় তাঁহাদের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। ফলে চৈতন্য যুগে বাংলা, কবীরের যুগে হিন্দী, নানকের যুগে পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী, একনাথ ও তুকারামের যুগে মারাঠা প্রভৃতি ভাষা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ভাষাও বঙ্গদেশ ভিন্ন সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়।

আঞ্চলিক ভাষা

গ্রিয়ারসন সাহেব ভারতীয় ভাষার তথ্য অনুসন্ধান করিয়া ভারতে ন্যূনাধিক একশত উনআশিটি ভাষা ও পাঁচশত চুয়াল্লিশটি উপভাষা এবং প্র-উপভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রিটিশ যুগে ইংরেজী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা ছিল। বর্তমানে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত, কিন্তু উহা অবিসংবাদিত নহে।

ভারতের ধর্ম

প্রবাদ আছে যে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। বহু ধর্মমত ও পথের সমাবেশ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এখানে প্রধানত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খ্রীষ্টান এবং উহাদের শাখা ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমের সংখ্যা প্রায় চার কোটি। শিখ ধর্ম পঞ্জাবের বাহিরে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। রাজপুতনা এবং গুজরাটে এখনও জৈনধর্ম প্রচলিত। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এবং কাশ্মীরের প্রান্তে কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। বোম্বাই-এর পারসী সম্প্রদায় অগ্নি-উপাসক। তাহাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইরাণীয় মহাপুরুষ জরথুষ্ট্র। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন জাতি এখনও ভূতপ্রেতের উপাসক। ধর্মে উদারতা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ অত্যাচারিত ইহুদীদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছে, খ্রীষ্টানকে ধর্ম প্রচারে সম্মতি দিয়াছে—এমন কি, ভারতবর্ষ জয়ের পূর্বেও মুসলমানকে মসজিদ নির্মাণে বাধা প্রদান করে নাই। ভারতের ইতিহাসে ধর্মের নামে ইওরোপের ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টদের মত ধর্মযুদ্ধ হয় নাই এবং শক্তির প্রাবল্যে ভারতবর্ষ তরবারির অগ্রভাগে ধর্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়া কোন দেশ বা জাতির উপর নিজের ধর্ম আরোপ করে নাই। ভারতবর্ষ মৈত্রী ও প্রীতি দ্বারা ধর্মবিজয় করিয়াছে। ভারতের আদর্শ দিগ্বিজয় নহে, ধর্মবিজয়।

ধর্মে উদারতা

ভারতীয় জীবনধারায় সমন্বয়ী কৃষ্টি

সূচনাতেই উক্ত হইয়াছে যে, মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রাকৃতিক সংস্থান দ্বারা দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়। জলবায়ু মানুষের অশন-ভূষণ, দৈনন্দিন জীবনধারা ও চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ সুবিশাল দেশ। নদী, পর্বত, বন, মরু, কান্তার ভারতবর্ষকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছে। একশত বৎসর পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে যাতায়াতে অত্যন্ত অসুবিধা ছিল, পথঘাটও সর্বত্র নিরাপদ ছিল না। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ প্রাকৃতিক সুযোগ অনুযায়ী জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে

ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা কোথাও আদিম জাতিগুলির সহিত রক্ত সংমিশ্রণ করিয়াছে, কোথাও বা পরাজিত আদিম জাতিগুলি গভীর অরণ্য বা দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় জীবনধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ দেশে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বহিরাগত আর্যগণ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই অঞ্চলে আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আর্যগণ বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ এবং কৌলিক আচার সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় জীবনধারায় বহু পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। মৌর্যযুগ হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রীক, শক, কুষাণ, হূন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া আর্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহারা আর্যদের ধর্ম ও জীবনধারা গ্রহণ করিয়াছে।

দ্রাবিড়, অনার্য ও আর্য সংস্কৃতি

আরব-মুসলমানের আগমনের পর হইতে ভারতীয় জীবনে একটি নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। আরব জাতি ছিল সেমিটিক—তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আর্য-ভারতীয় জীবন-দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অবশ্য আরবগণ ভারতের এককোণে সিন্ধু অঞ্চলে নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তাহাদের জীবনধারা ভারতের জনসাধারণের জীবনধারার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই সময়ে আর্য-পারসীক জাতি মুসলিম-আরব জাতি কর্তৃক ইরাণ হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রপথে ভারতের গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। এই পারসীক জাতি স্বীয় অগ্নি উপাসনা, জাতকর্ম, বিবাহ ও শব-ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেদের জীবন-ধারা পরিবর্তন করে নাই, কিংবা সাধারণ-ভাবে ভারতীয়দের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ করে নাই।

সেমিটিক প্রভাব

দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্ক-আফঘানগণ পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান জয় করিয়াছিল এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই তুর্ক-আফঘানগণ বহির্ভারতীয় হইলেও ভারতবর্ষকে আপনাস্থিত করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের পরিভাষা ছিল আরবীয়, রাজ-দরবারের বহিরাভরণ ও অনুষ্ঠানগুলি ছিল ইরাণীয়, কিন্তু পরিবেশ ছিল ভারতীয়। তদুপরি মুসলমান রাজপরিবারে হিন্দুনারী প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দুমাতার সন্তান বলিয়া ফিরোজ তুঘলক, সিকন্দর লোদী বরামের পক্ষে সিংহাসন লাভে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল বংশ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। মুঘল সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম মিলনের উদ্দেশ্যে হিন্দুনারী বিবাহ নীতিগতভাবে প্রচলন করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হিন্দুমাতার সন্তান

মুসলিম সংস্কৃতি

বলিয়া মুঘলসিংহাসন অপবিত্র হয় নাই। মুঘল রাজান্তঃপুরে রাজপুত নারীর অবস্থানহেতু হিন্দু আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-বিধি মুঘল পরিবারে সহজ-ভাবেই প্রবেশ করে। রাজপরিবারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত মুসলিম আমীর-ওমরাহ হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করেন। মাতার প্রভাব স্বভাবতই সন্তানের উপর অধিকতর ক্রিয়াশীল। মাতার ভাষাই সন্তানের প্রারম্ভিক ভাষা। মাতার ব্যক্তিগত জীবনধারা ও সংস্কার সন্তানের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষে মুসলিম যুগেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য আকবরের সময় রাজা বীরবলের, জাহাঙ্গীরের সময় রাজা দলপৎ সিং-এর এবং পেশোয়া বাজীরাও-এর মুসলিম অন্তঃপুরিকা ছিল। মুসলিম নারীর গর্ভজাত সন্তান হিন্দু-পিতার ঔরসজাত হইলেও তাহারা মুসলিম, অন্যদিকে মুসলিম পিতার ঔরসে হিন্দু মাতার সন্তানও ছিল মুসলিম।

মুসলিম পরিবারে হিন্দু নারী

সামাজিক আদান-প্রদানের বাহনরূপে মধ্যযুগে ফারসী, তুর্কী ও আরবী ভাষার সহিত হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। ফলে উর্দু ভাষার মাধ্যমে ভারতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সূচিত হয়। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সান্নিধ্যহেতু বহুস্থলে জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সমন্বয়ী প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছিল। বহু হিন্দু সন্তান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার বর্জন করিতে পারে নাই। মুসলমানের নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় হিন্দুর সংস্কারগুলি ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত রহিয়া গেল। এমন কি, হিন্দুগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও সুলতানগণ আর্থিক প্রয়োজনে হিন্দুর বৃত্তিমূলক জাতিভেদ নষ্ট করেন নাই। হিন্দু তন্তুবায় (তাঁতি) ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও সে বস্ত্র-বয়ন বৃত্তি ত্যাগ করে নাই। তাঁতির পরিবর্তে সে নূতন পদবী গ্রহণ করিল—জোলা বা মুমিন। কিন্তু সে তাহার পুরাতন জাতির গণ্ডীর মধ্যেই রহিয়া গেল। ধর্মান্তরিত হিন্দু রজক হইল মুসলিম গাস্সাল (ধোপা), ক্ষৌরকার হইল হজ্জাম, সূত্রধর হইল নজ্জার, রঞ্জক হইল রংরেজ, ধুনকর হইল ধুনিয়া, চণ্ডাল হইল কসাই। হিন্দুর প্রাচীন সংস্কার নবদীক্ষিত মুসলিমের জীবনধারায় বহুল পরিমাণে অব্যাহত রহিয়া গেল।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়

অন্যদিকে মধ্যযুগে বহু মুসলিম সুফী, সন্ত এবং হিন্দু সাধু ও ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হয়। পঞ্জাবে কলুর সন্তান নানক শিখ ধর্মের মাধ্যমে একটি সমন্বয়ী ধারা প্রবর্তন করেন। কোরাণ গ্রন্থ যেমন মুসলমান সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, শিখ সমাজেও তেমনি 'গ্রন্থসাহেব' শিখ সমাজের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করে। গুরু নানক হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই শিখধর্ম গ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন।

ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকদের মাধ্যমে মিলন

মধ্যভারতে মুসলিম জোলার সন্তান **কবীর** একটি ভক্তিমূলক ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরের পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রজকের সন্তান **নামদেব** ভক্তিমূলক ধর্ম প্রচার করেন। এই তিনজন মহাজনই হিন্দুর জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন করেন। ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় জীবনধারায় এক নূতন প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ সন্তান **শ্রীচৈতন্যদেব** ভক্তি-মূলক বৈষ্ণব প্রেমধর্ম প্রচার করেন এবং একটি নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যবন হরিদাস বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পূর্বে ভারতের অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ছিলেন উচ্চবংশজাত। মধ্যযুগে ভারতীয় চিন্তারাজ্যে সমন্বয়ী ধারা প্রবর্তনের ফলে অব্রাহ্মণ সাধকও ধর্মের পুরোভাগে স্থানলাভ করেন। নানক, কবীর, নামদেব ও বৈষ্ণব মহাজনগণ সর্বজনবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের বাণী প্রচার করেন। ফলে ভারতবর্ষে গুরুমুখী, হিন্দী, মারাঠী ও বাংলা ভাষার মধ্যে এক নূতন স্পন্দন সৃষ্টি হইল। কালক্রমে এই ভাষার মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রায় নূতন ধারার সূত্রপাত হইল। মুসলিম সাধকগণও হিন্দী ও উর্দু ভাষায় নিজেদের বাণী প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণ সমভাবে এই সমস্ত সুফী, সাধু ও সন্তদের অনুবর্তী জীবনধারা অনুসরণ করিয়াছিল। বহু মুসলিম সাধক কৃষ্ণপদাবলী, নাম-মাহাত্ম্য, কালীকীর্তন রচনা করিয়াছেন।

ভাষার মাধ্যমে মিলন

এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর সান্নিধ্যের ফলে কয়েকটি নূতন দেবতার আবিভাব হইয়াছিল, সত্যপীর, ত্রিলোকপীর, মুস্কিল আসান প্রভৃতি পীরের দরগায় হিন্দুগণ মুসলমানের মত শীরণী বা ভোগ দিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ-নীচ বর্ণের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে মেলা, উৎসব, নামকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। উভয়ের জীবনধারায় একটি সর্বজনীন উদার ভাবের সঞ্চার আরম্ভ হইল। অন্যদিকে মুসলমানগণ বসন্ত রোগে শীতলা দেবী, বিসূচিকা ও ওলাউঠা রোগে কালীমাতা ও ওলাদেবীর পূজা আরম্ভ করিল। উত্তর ভারতে বহরম আল্লা (ব্রহ্ম-আল্লা) নামে এক নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ হইল। উত্তর ভারতে কোন কোন হিন্দু 'রোজা' (উপবাস) পালন করে। সুন্দরবনে ব্যাঘ্র দেবতা 'দক্ষিণ রায়' ও 'বনবিবি' হিন্দু-মুসলমান-নির্বিবেশে সকলের পূজা লাভ করেন।

নূতন দেবদেবী

রাজদরবারের প্রভাবে উত্তর ভারতের কায়স্থগণ জীবনযাত্রায় বহুল পরিমাণে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া গেল। "মাথায় টুপি, গায়ে আচকান, পরণে পায়জামা, পকেটে রুমাল এবং পায়ে নাগরা জুতা" কায়স্থদের সাধারণ পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইল। কায়স্থগণ ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিল এবং উর্দু ভাষাকে প্রায়

বেশভূষা ও ভাষার মাধ্যমে মিলন

মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিল। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা আরবী অক্ষরে মুসলমানী রীতিতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। রাজপুত রাজপরিবারের আচার-ব্যবহার এবং দিল্লী, লাহোর, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ ও মুর্শিদাবাদ দরবারের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় উচ্চ-শ্রেণীর লোক বহুভাবে মুসলিম ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। ভারতীয় জীবনধারা দুইটি বিভিন্ন ধর্মীয় স্রোতে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রাজদরবারে আসিয়া উভয় স্রোত সম্মিলিত হইয়া গেল।

ব্রিটিশ আগমনের কিছুকাল পর ভারতীয় জীবনধারা আর এক নূতন স্রোতে প্রবাহিত হইল। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি ও ইওরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ লাভ করিল। ভারতবাসী ইংরাজী শিক্ষিত ও ইংরাজী অশিক্ষিত এই দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজীর মোহ প্রায় একশত বৎসর ভারতীয় জীবনধারার সমন্বয়ী প্রবাহকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তন হইলে ভারতীয় জীবনধারা এক বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত হইল। উহার পরিণতি হইল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীন ভারতের নব রূপায়ণে।

ব্রিটিশ যুগে সমন্বয়

বিবিধের মাঝে মিলন

অপূর্ব বৈচিত্র্যের সমাবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে এই ভারতবর্ষ। আয়তনের বিশালতায়, লোকসংখ্যার বিপুলতায়, জাতি, ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতায় এবং প্রাকৃতিক বিচিত্রতায় এই ভূখিণ্ডকে মহাদেশকল্প (মহাদেশের ক্ষুদ্র সংস্করণ) বা উপমহাদেশ আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক নহে। বর্তমানে খণ্ডিত দেহ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের আয়তন রাশিয়া বিবর্জিত প্রায় ইওরোপের সমান—ইংলণ্ডের বিশগুণ। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ।

মহাদেশকল্প ভারত

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্যেও অপূর্ব বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখা যায়। তুষারমণ্ডিত পর্বত, বিশাল নদনদী, শস্য-শ্যামল প্রান্তর, বালুকাময় মরুভূমি, লোকবহুল জনপদ, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যানী ভারতবর্ষকে প্রকৃতির লীলা নিকেতনে পরিণত করিয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে প্রকৃতির লীলা ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই ভারতবর্ষের একমাত্র বৈচিত্র্য নহে। ভারতবাসীর বর্ণ, আকৃতি এবং পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যও সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রাচীনকাল হইতে কত আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় ; কত শক, হুন, পাঠান, মুঘল "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" আগমন করিয়া ভারতীয় জনসমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। কত বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদকে ভারতবর্ষ আপনার বক্ষে আশ্রয় দান করিয়াছে। নদী, পর্বত, বনানী দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় এবং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন প্রবাহে ভারতে বসতি বিস্তার হেতু বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমানে প্রায় একশত উনআশিটি ভাষা ও পাঁচশত চুয়াল্লিশটি উপভাষা ভারতে ব্যবহৃত হয়

বিভিন্ন জাতি

ধর্মের বৈচিত্র্যও ভারতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা, প্রতীকপূজা, প্রকৃতিপূজা, ভূতপ্রেত পূজা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরে স্থানলাভ করিয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম, পারসীক ও খ্রীষ্টান ধর্ম এবং উহাদের বহু শাখা-প্রশাখা নির্দ্বন্দ্ব প্রতিবেশিরূপে ভারতের বুকে স্থানলাভ করিয়াছে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, ধর্ম ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিভিন্ন ধর্ম

উত্তরে হিমালয় এবং তিনদিকে সাগর ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য সাধন করিয়াছে। মধ্যভাগের বিশাল নদী-পথগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া মিলনের অপরূপ সেতু রচনা করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার অন্তরালে এক বিরাট ঐক্যধারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে চির প্রবহমান। রামায়ণে অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্রের অয়ন (অর্থাৎ গমন) কাহিনী ও রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনার আবরণে কবি বাল্মীকি সমগ্র ভারতে আর্য কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। **মহাভারত** সত্যই **মহা ভারত**—আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী অখণ্ড ভারতবর্ষ স্থাপনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। ভারতবর্ষে সর্বযুগে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণে রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণ সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলিম যুগে খলজি, তুঘলক এবং তৈমুরবংশ ভারতে সার্বভৌম রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক যুগে **সর্বভারতীয় ঐক্য** ব্রিটিশের অনিচ্ছাকৃত কীর্তি।

মৌলিক ঐক্য

প্রাচীন যুগে ঐক্য প্রচেষ্টা

আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষে বহু ধর্ম, নানা ভাষা এবং বিভিন্ন স্তরের সভ্যতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কৃষ্টিগত এবং ধর্মগত একটি নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যের ফল্গুধারা অনুক্ষণ প্রবাহিত। প্রায় সমস্ত হিন্দুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বেদ,

পুরাণ, স্মৃতি ও গীতাকে পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করে। রামায়ণ ও মহাভারত সর্বভারতের জাতীয় মহাকাব্য। সংস্কৃত ভাষা ভারতবাসীর ধর্মের ভাষা—তথা দেবভাষা। উত্তর ভারতের সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। দক্ষিণ ভারতের ভাষাও সংস্কৃত শব্দপুষ্ট। ভারতবাসী হিন্দুর শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও বিবাহের মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হয়, সুতরাং উহা সর্বভারতীয়। জাতকর্মের আচার, বিবাহের অনুষ্ঠান, মৃতদেহের সংকার, অশৌচপালন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি সংস্কার ভারতবাসীর সংস্কৃতিগত ঐক্য প্রকাশ করে। দেবার্চনা, তীর্থভ্রমণ, ধর্মোৎসব ও জন্মায়ত্ত জাতিভেদ ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত সামাজিক একত্বের পরিচায়ক। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আদর্শ সর্বভারতীয় হিন্দু সমাজের আদর্শ। ভরত-লক্ষ্মণের মতন ভ্রাতা, সীতা-উর্মিলার মতন সাধ্বী পত্নী, হনুমানের মতন প্রভুভক্ত, সুগ্রীবের মতন বন্ধু, রামচন্দ্রের মতন প্রজানুরঞ্জক রাজা, ঋষি বশিষ্ঠের মতন গুরু, বিভীষণের মতন আদর্শ নিষ্ঠা—ভারতীয় সমাজ-জীবনের চিরন্তন আদর্শ। মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, গান্ধারীর পাতিব্রত্য, বিদুরের ধর্মনিষ্ঠা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাপালন, কর্ণের দানের আদর্শ—সমগ্র ভারতবাসীকে চিরকাল উদ্বোধিত করিয়াছে। এই আদর্শগত ঐক্য ভারতবাসীকে এক অপূর্ব মিলনের সূত্রে বন্ধন করিয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষে এমন একটি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা—"মরিয়াও মরে না।" বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষ বহুবার বৈদেশিক কর্তৃক আক্রান্ত ও শাসিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গ্রীক, শক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি জাতিকে ভারতবর্ষ আপন করিয়া লইয়াছে। এমন কি, পরধর্ম-স্পর্শকাতর মুসলিমকেও ভারতবাসী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে—যদিও মুসলমান রাজ্য স্থাপনের পরে ইসলাম ধর্ম ভারতের ধর্ম, চিন্তা ও সমাজকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ইসলাম তাহার রূপ নিজের অজ্ঞাতসারে বহুভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। আরবদেশীয় মুসলিম সমাজ এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে বহু পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অনেক স্থলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্বেও ভারত-সন্তান তাহার প্রাচীন আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে নাম ও নমাজ ভিন্ন কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। বিজেতা মুসলিমগণ হিন্দুর উপর ইসলাম জীবনধারা আরোপ করিতে পারে নাই। ভারতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্যধারাই এই সামাজিক মিলনের হেতু। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ যুগে সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল ইংলণ্ডেশ্বরের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশের রাজনৈতিক

ভাষাগত ঐক্য

আদর্শগত ঐক্য

বিভেদনীতি ও মুসলমান সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণবোধের ফলে দুই জাতির মতভেদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামক দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এই দুইটি রাজ্য পরস্পর এত নির্ভরশীল যে, তাহাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

ব্রিটিশের বিভেদ-নীতি

যুগে যুগে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তিত হইয়াছে, রাজনৈতিক ঐক্য ব্যাহত হইয়াছে; কিন্তু নানা বৈচিত্র্য এবং সংঘাতের মধ্যেও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মৌলিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ঐক্য ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যই ভারতের ইতিহাস এবং ভারতবাসীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

অনুশীলনী

১। পরিবেশ ও ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

(What is the influence of environments and geography on history ?)

২। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ এবং উহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং ভারতের ইতিহাসের উপর হিমালয়, বিন্ধ্য এবং ভারত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের প্রভাব আলোচনা কর।

(Describe the natural divisions of India and give in brief the relative political influence of North and South India and also of the Himalayas on the history and culture of India.)

৩। ভারতের অধিবাসীদের জাতীয় গোষ্ঠী বিচার কর।

(Give a short sketch of the racial elements in Indian population.)

৪। ভারতের অধিবাসীদের ভাষা, ধর্ম ও জীবনধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

(Write a short essay on the language, religion and of ways life of the Indians.)

৫। ভারতের ইতিহাসে 'বিবিধের মাঝে মিলন' সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(What do you mean by unity in diversity in Indian history ?)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান

অধ্যায় পরিচয় : ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষের লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কালের প্রভাব, বৈদেশিক আক্রমণকারীর ধ্বংসবিলাস, প্রাচীন স্মৃতিগুলির প্রতি দৃষ্টির অভাব ইত্যাদি কারণে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার প্রমাণপঞ্জী কোথাও বা বিলুপ্ত, কোথাও বা বিস্মৃত হইয়াছে। আধুনিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকের অনলস গবেষণা ও চেষ্টার ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে; পুরাতন জিনিসের নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে।

আধুনিক প্রথায় ভারতের গবেষণামূলক ইতিহাস রচনার প্রয়াস ব্রিটিশ যুগে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাথমিক যুগের ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বিজেতার মনোভাব লইয়া ভারতবাসীর প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টিতে ভারতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ভারতের শৌর্য-বীর্য, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, কটূক্তি করিয়াছেন, অনেক অবান্তর মন্তব্য করিয়াছেন, যথা,—ভারতবাসী কখনও কোন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই; বিদেশীর নিকট ভারতবাসী চিরকাল পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ বা ঐক্যবোধ ছিল না; বাঙ্গালী সামরিক জাতি নহে; ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ, ভারতবাসী ইহকাল বর্জন করিয়া চিরকাল পরমার্থ চিন্তা করিয়াছেন; ভারতবর্ষ কৃষির দেশ, শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি ভারতবাসী কোনকালেই যথেষ্ট দৃষ্টি দেয় নাই। অর্থাৎ ইংরাজ ভারতবর্ষকে যে দৃষ্টিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইত, বিদেশী ঐতিহাসিক সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই ভারতীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছে। অবশ্য রাজস্থানের কাহিনী প্রণেতা টড প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় ইংরাজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মনোবৃত্তি লইয়া ভারতের ইতিহাস রচিত হইলে সে ইতিহাস অন্যরূপ হইবে।

ভারতের ইতিহাস সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত :

(১) **প্রাচীন যুগ**—আদিযুগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। ইহা প্রধানত হিন্দু যুগের ইতিহাস।

(২) **মধ্য যুগ**—মুসলমান আগমন হইতে ব্রিটিশ আগমন পর্যন্ত—খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ। ইহা প্রধানত মুসলিম যুগ।

(৩) **বর্তমান যুগ**—ব্রিটিশ শক্তির উত্থান হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ব্রিটিশ যুগ এবং স্বাধীন ভারতের ইতিহাস।

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান : এই উপাদানগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—**লিখিত ও অলিখিত**। লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে রহিয়াছে—প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস-আশ্রিত নাটক, কাব্য, মহাকাব্য, ইতিহাস-গ্রন্থ, প্রশস্তি, স্তম্ভলিপি, শিলালিপি ইত্যাদি। অলিখিত উপাদানের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র, নগরের ধ্বংসাবশেষ, সমাধি-মন্দির, শিল্পকীর্তি, গুহাচিত্র, মুদ্রা, চারণগীতি, লোককথা ইত্যাদি।

লিখিত উপাদান : বর্তমান যুগের ধারা অনুযায়ী রচিত অতি প্রাচীন ভারতের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। কেন নাই—সে বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ভারতবাসী পরলোক ও পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল—ইহলোক ও অনিত্য স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন ছিল। সুতরাং ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদির আলোচনায় তাহারা সময় অতিবাহিত করিত। আবার কেহ বলেন, যে জাতি শুক্রাচার্যের রাজনীতি, চাণক্যের অর্থনীতি, বাৎসায়নের কামশাস্ত্র, চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করিয়াছে, সে জাতি যে কেবল পরমার্থ চিন্তা করিয়াছে, তাহা অনুমান করা সমীচীন নহে। প্রাচীন যুগে রচিত বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, মনুস্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, চিন্তাধারা ও রাষ্ট্র-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য অতি প্রাচীন ভারতে গ্রীসের থুসিডাইডিস বা হেরোডোটাস, রোমের লিভী অথবা জার্মানীর টাসিটাসের মত ধারাবাহিক ইতিহাস-রচয়িতা কেহ ছিল না।

বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক স্তোত্রের মধ্যে বেদ সংকলয়িতা ঋষিদের নাম অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও গ্রন্থ-রচয়িতাদের পরিচয় এবং জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। ধর্মগ্রন্থ ঘটনামূলক না হইলেও উহাদের মধ্যে বিভিন্ন যুগের খণ্ড খণ্ড ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজার নাম, যজ্ঞবিধি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির ইংগিত পাওয়া যায়। বেদ যে কথা-কাহিনী ও উপাখ্যান বিবর্জিত, তাহা নহে। যজ্ঞের প্রারম্ভে যজ্ঞকর্তার বংশপরিচয় ও গুণাবলী কীর্তন করিবার জন্য সূত বা চারণজাতীয় এক শ্রেণীর লোক ছিল। তাহাদের সাধারণ নাম ছিল পরিপ্লবিন্। লোকশিক্ষা ও দৃষ্টান্তমূলক ভাবেই তাহারা যজ্ঞকর্তা বা তাঁহার পিতৃপুরুষের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করিত। আখ্যান আরম্ভের পূর্বে 'ইতি হ আস'—অর্থাৎ 'এই রকম ছিল' বলিয়া তাহারা বিষয়টির অবতারণা করিত। পরবর্তী যুগে এই সব আখ্যায়িকা 'ইতিহাস' নামে অভিহিত হইত। আধুনিক মতে বেদের রচনা-কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩,০০০—২,০০০ বৎসর পর্যন্ত। সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে বেদ রচিত হইয়াছিল।

সাহিত্য, নাটক কাব্য, ইতিহাস

উপনিষদের যুগে বেদ-বেদাঙ্গের মধ্যে বাল্মীকি ও ব্যাসের নামের উল্লেখ আছে। রাম-সীতার নামও বৈদিক সাহিত্যে রহিয়াছে। রাবণের কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য কণাদের বৈশেষিক দর্শনের অন্য নাম 'রাবণ দর্শন'। মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। বেদে শকুন্তলা উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্রের কীর্তি, নলরাজা ও শিবিরাজার কাহিনী এবং দশ রাজার যুদ্ধ-বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজা সুদাসের উল্লেখ আছে।

মহাকাব্য

রামায়ণ ও মহাভারতে সমসাময়িক ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচনায় এই দুইটি মহাকাব্যের মূল্য অপরিসীম। অনেকের মতে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১,৫০০—১,৪০০ অব্দ পর্যন্ত। ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়া রামায়ণ রচনা গুপ্তযুগে সমাপ্ত হইয়াছে। মহাভারত-রামায়ণের পরবর্তিকালের রচনা (এই বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে)। শেষ পর্যন্ত মহাভারত রচনাও গুপ্তযুগে প্রায় একই সময়ে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

পুরাণ

পুরাণ বা প্রাচীন কাহিনী বর্তমান যুগের আদর্শ অনুযায়ী রচিত ইতিহাস না হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজার বংশপঞ্জী ও কাহিনী বর্ণিত আছে। পুরাণে বর্ণিত আখ্যান এবং ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুরাণের আরম্ভভাগ অনেক স্থলেই কিংবদন্তীর উপর রচিত; গিরিন্দ্রশেখর ও যোগেশচন্দ্র বিত্তানিধির মতে পুরাণ ইতিহাস। অবশ্য পুরাণে কোথায় কিংবদন্তীর শেষ এবং কোথায় ইতিহাস আরম্ভ—তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ধর্মগ্রন্থ

মহাকাব্যে বর্ণিত সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি রাজবংশ; ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, মিথিলা, অযোধ্যা, লঙ্কা প্রভৃতি স্থান; সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদী এবং হিমালয়, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, মহেন্দ্র প্রভৃতি পর্বতের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। পরবর্তিকালের ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত স্থান, নদী ও পর্বতের অবস্থিতি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে ভগবান তথাগত বুদ্ধ ও জৈনমুনি মহাবীরের জীবনী, ধর্ম ও ইতিহাস এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও মৌর্য রাজবংশের ইতিহাস রচনার উপাদান রহিয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা লেখকের পালি ভাষায় রচিত 'দীপবংশে' এবং পঞ্চম শতাব্দীতে 'মহানাম' নামক কবি-রচিত 'মহাবংশ' আখ্যাত মহাকাব্যে সিংহল ও ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে। 'অথকথা' মহাবংশ নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত; গৌতমবুদ্ধের সময় হইতে সিংহলরাজ মহাসেনের সময় পর্যন্ত বহু ঘটনা এই দুইখানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের রাজনীতি এবং কামন্দকের নীতিসার

ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। পাণিনীর ব্যাকরণ এবং অমরসিংহের অভিধানের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক শব্দ, গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্য, নাটক এবং কাব্যের মধ্যে ইতিহাস রচনার প্রচুর উপাদান নিহিত আছে। বাণভট্টের **হর্ষচরিত** খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস রচনার উপাদেয় উপাদান। বাক্‌পতিরাজ-রচিত **গৌড়বহু** এবং বিল্‌হন-রচিত **বিক্রমাঙ্কদেবচরিত** নামক কাব্যের মধ্যে যশোবর্মন এবং চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অভিযান কাহিনী, সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত **রামচরিতে** বাংলার কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং পালবংশের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কাব্যখানির মধ্যে 'রাম' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। শব্দটি রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র এবং পালরাজ রামপালের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরী পণ্ডিত কল্‌হন-রচিত **রাজতরঙ্গিণীর** মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাস রচনার উপাদান রহিয়াছে। সোমেশ্বর-রচিত **রাসমালা** এবং **কীর্তিকৌমুদী** গুজরাটের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান। অষ্টম শতাব্দীতে বালাজুরী-রচিত **চাচ্‌-নামা** (চাচ্‌—সিন্ধুরাজ দাহিরের পিতা) গ্রন্থে আরব কর্তৃক সিন্ধুবিজয় এবং সপ্তম শতাব্দীর সিন্ধুর ইতিহাস বর্ণিত আছে। আরবী গ্রন্থেও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড সংবাদ আছে।

বৈদেশিক বিবরণী

বৈদেশিক বিবরণীর মধ্যে ভারতের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান সংরক্ষিত রহিয়াছে। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণের মধ্যে মৌর্য-বংশের, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণ কাহিনীতে গুপ্তবংশের, এবং হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে পুষ্যভূতি বংশের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান আছে। ইৎসিঙ, মা-হুয়াঙ্‌ এবং ফেসিং-এর বিবরণীতে বাংলার ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত আছে। আবরদেশীয় পর্যটক আল্‌ মাসুদী এবং সুলতান মামুদ গজনীর রাজ-জ্যোতিষী আলবেরুণীর গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিচিত্র সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভেনিস্‌ দেশীয় পর্যটক মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে ভারত সম্বন্ধে বহু সত্য, অর্ধ-সত্য কাহিনী বর্ণিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লামা তারা-নাথের বিবরণীতে ভারতের বৌদ্ধধর্ম, শিল্প, নগর ও রাজার নাম উল্লেখ আছে।

ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভে যে সব ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহারা ছিল প্রধানত বণিক। অর্থের উৎস সন্ধানই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। তাহারা মনে করিত, "ভারতের পথে পথে সোনা ছড়ান আছে।" ভারতবাসীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সাধারণ ইংরাজেরা

মনে করিত—ভারতবাসীর সভ্যতা নাই, বিজ্ঞান নাই, ধর্ম নাই, ইতিহাস নাই। ভাগ্যক্রমে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স নামক কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের একজন সুধী বিচারপতি ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্য কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডঃ হ্যামিল্টন বুকানন নামক একজন বিদ্বান সরকারী কর্মচারী দক্ষিণে মহীশূর, পূর্বে বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং আসাম পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল অঞ্চলের স্থাপত্য, মন্দির, চৈত্য, বিহার ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় নির্ভুল একটি বিবরণী রচনা করেন। তারপর বিশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম ভারতে শিল্পতীর্থ অজন্তা, এলিফ্যান্টা এবং কান্হের আবিষ্কৃত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব

এই সমস্ত অনুসন্ধানীর চেষ্টায় বহু শিলাস্তম্ভ ও তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা কিন্তু এই সকল লিপি পাঠ করিবার কৌশল জানিতেন না। তাহারা প্রচার করিলেন—"ভারতবর্ষ মন্ত্রের দেশ এবং লিপিগুলি মন্ত্র-সংকেত।" এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী প্রিন্সেপ সাহেব ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের গবেষণায় সাত বৎসর নিরলস ধ্যানমগ্ন রহিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাঁচী স্তূপের মধ্যে একই রকমের কয়েকটি অক্ষর বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দুইটি শব্দ বা অক্ষর আবিষ্কার করেন। ঐ অক্ষর দুইটি ছিল দ এবং ন (দ+ন) অর্থাৎ দান। এই দুইটি অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া প্রিন্সেপ সাহেব এলাহাবাদ ও দিল্লীর অশোক স্তম্ভের লিপি পাঠ করিলেন। এই লিপির অক্ষর ছিল ব্রাহ্মী, ভাষা ছিল সংস্কৃত।

শিলাস্তম্ভ ও তাম্রলিপি

অজন্তার গুহামুখ

অলিখিত উপাদান : প্রাচীন মন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ, প্রাসাদ, দুর্গ, নগর প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শন, প্রাচীন কীর্তি ও উহাদের ধ্বংসাবশেষ,

দেবদেবীর মূর্তি, মৃৎশিল্প, গুহাচিত্র এবং প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে বহু লিখিত এবং অর্ধলিখিত উপাদান রহিয়াছে। অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্রগুলি সেকালের ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনায় হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ অমূল্য উপাদান। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, শিল্পাশ্রয়ী সমাজ, প্রকৃতিপূজক ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের বহু ইংগিত মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তক্ষশিলা, পাটলীপুত্র, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, নালন্দা, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, অমরাবতী ও নাগার্জুনী কুণ্ডা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন ভারতের শিল্প, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান আছে। তক্ষশীলা ও নালন্দায় অবস্থিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায়তন ও শিল্পরীতির বহু চিহ্ন বিদ্যমান।

ধ্বংসাবশেষ

প্রাচীন হিন্দুতীর্থ কাশী, গয়া, মথুরা, দ্বারকা, পুরী, ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর মন্দির, বৌদ্ধতীর্থ কপিলবাস্তু ও রাজগৃহ, শ্রাবস্তীর বিহার, স্তূপ ও মঠে, জৈনতীর্থ পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় এবং আবুপর্বতের মন্দির, মূর্তি ও উহাদের সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তী, প্রাচীন রীতিতে এবং কোথাও বা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপাদান নিহিত আছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন। কানিংহাম কিংবদন্তী এবং গ্রীক, চৈনিক, আরব এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রদূত, পরিব্রাজক, পর্যটক ও বণিকদের গ্রন্থে উল্লিখিত স্থানগুলির অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে আবিষ্কৃত হইল বহু বিস্তৃত নগর, প্রাসাদ ও প্রাচীন মুদ্রা। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধগয়া, বারহুত, সাঁচী, সারনাথ ও তক্ষশীলা খনিত হইল। অতীত ভারতের তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকগণ এক স্বপ্নলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতের সভ্যতা বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিল।

নগর, প্রাসাদ ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার

এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে বহু দানপত্র ছিল। ঐগুলি সাধারণত তামার পাতে ক্ষোদিত করিয়া মন্দির, মঠ, বিহার অথবা স্তূপের গাত্রে অথবা ভিত্তির নীচে সযত্নে রক্ষিত হইত। ঐ সকল তাম্রলিপির মধ্যে বহু দাতার নামের উল্লেখ আছে এবং দানপত্রের প্রচ্ছদপটে দাতার উদ্দেশ্য, ধর্মাদর্শ ও জীবন-যাত্রার সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের জন্য বড়লাট লর্ড কার্জন এক নূতন কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করিলেন। এই বিভাগের অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল সাঁচী, সারনাথ, কুশীনগর (কাশিয়া), শ্রাবস্তী (সাহেত মাহেত), পুষ্কলাবতী (চাসারদা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মর্দান), বিহীটা (এলাহাবাদ জিলা),

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বৈশালী (বসার—মজঃফরপুর), রাজগীর (নালন্দা) এবং প্রাচীন মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র অঞ্চল খনন করিয়া বিশ্বের সুধীজনের অন্তরে প্রাচীন ভারতের প্রতি এক অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার করিলেন। স্যার জন মার্শাল পনর বৎসর পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। এই পনর বৎসর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সুবর্ণ যুগ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অন্তর্গত বৌদ্ধসংস্কৃতির কীর্তিস্থল নালন্দার পার্শ্ববর্তী রাজগীর খনন আরম্ভ হয়। উহা ছিল মগধের রাজধানী। এই দুইটি স্থানের আবিষ্কৃত শিল্প ও স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি বৌদ্ধযুগের গৌরবময় স্মারক। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে এক নূতন অলকাপুরীর সন্ধান দিল। ভারতের ইতিহাসের এক নূতন পৃষ্ঠা উন্মোচিত হইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদড়ো এবং পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে কয়েকটি নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদ, উদ্যান, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার

মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত চিত্রিত পাত্র ও সীলমোহর

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপা

করিয়াছেন। এই নিদর্শনগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস, চিন্তাধারা, শিল্প ও ধর্ম সম্বন্ধে পুরাতন সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। সিন্ধুদেশে ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, শিল্প-সমাজ এবং প্রকৃতিপূজক ধর্ম।

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব

তারপর হইতে ভারতের স্থাপত্য নিদর্শন এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের জন্য বৃহত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া মধ্য এশিয়া, তুর্কীস্থান, ব্রহ্ম এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। স্যার অরেল স্টেইন মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানে বহু বৌদ্ধ মঠ, কাষ্ঠ-ফলক, রেশম ও তাম্রপত্রে লিখিত পুঁথি, চিত্র ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। সেই অপূর্ব নিদর্শনগুলি বর্তমানে দিল্লীর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ব্রহ্মদেশ প্রধানত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর দেশ। সেখানে বহু মঠ, প্যাগোডা, পালি ও ব্রাহ্মী ভাষায় উৎকীর্ণ দ্বিভাষী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত ও ব্রহ্মের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নূতন ভাবে লিখিত হইতেছে।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ, ফরাসী ও জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় বহু মন্দির, মঠ, পুঁথি, ধ্বংসপ্রায় নগর, পাঠাগার, চিকিৎসালয় ইত্যাদি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে শ্রীবিজয় রাজ্য, যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন, চম্পা (আনাম), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া) ও দ্বারাবতীতে (শ্যাম) বহু প্রাচীন ভারতীয় কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
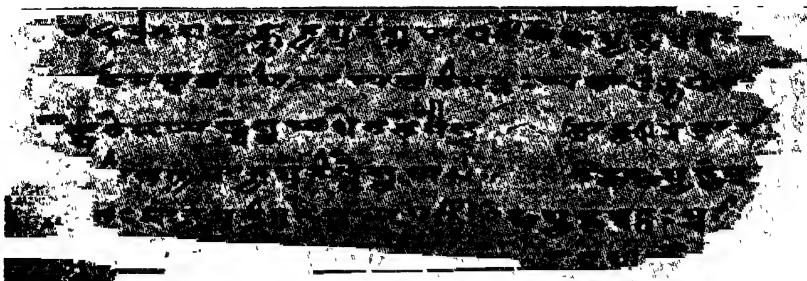
খোটানে প্রাপ্ত সংস্কৃত অক্ষরে লেখা তালপাতার পুঁথি

দক্ষিণে সিংহল এবং পশ্চিমে আফঘানিস্থানে যথারীতি স্থাপত্য-নিদর্শন অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নিবিড় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবে নিঃসন্দেহ।

ইতিহাস রচনার পক্ষে মুদ্রা অতিশয় মূল্যবান উপাদান; বিশেষ করিয়া সমসাময়িক যুগের আর্থিক অবস্থা, সৌন্দর্যবোধ, ধাতুশিল্প-জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মুদ্রার মধ্যে অনেক তথ্যপূর্ণ ইংগিত পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক মুদ্রাতে রাজার নাম, আকৃতি, সময়, কোথাও বা আরাধ্য দেবতার মূর্তি ক্ষোদিত বা মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে গোধন, নিষ্ক, কড়ি, কার্ষাপণ ইত্যাদি দ্বারা দ্রব্য বিনিময় হইত। মুদ্রার উল্লেখও

মুদ্রা

পাওয়া যায়। ব্যাকৃট্রিয়া অঞ্চলে বহু গ্রীকমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি অতি সুন্দর, উহাতে রাজার প্রতিকৃতি এবং দেবতার মূর্তিগুলি অপূর্ব। এই মুদ্রাগুলি ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত। পরবর্তি-কালে শক, পারদ ও কুষাণগণ গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে রাজকীয় মুদ্রার পরিকল্পনা করিয়াছিল। এই সমস্ত মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করিলে গ্রীক, শক, কুষাণ, পারদ প্রভৃতি রাজা ও রাজবংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

কুষাণ মুদ্রায় শিবমূর্তি

মালব, যৌধেয়, মৈত্রক প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাস রচনায় মুদ্রাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আবার সাতবাহন প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস ও কিংবদন্তী মুদ্রার সাহায্যে বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে।

গুপ্তরাজগণের আর্থিক অবস্থা, সাম্রাজ্য বিস্তার, শিল্পপ্রীতি ইত্যাদি অনেক সংবাদ মুদ্রা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রা বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের কালনির্ণয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিক্রম সম্বৎ (৫৮-৫৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ), শকাব্দ (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ), গুপ্তাব্দ (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ), হর্ষাব্দ (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি অনেক শব্দের উল্লেখ আছে।

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান: ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে উপনীত হইলে ইতিহাসের উপাদান অনেকখানি স্বচ্ছ হইয়া উঠে। মুসলিম সমাজ ছিল বাস্তববাদী; সুতরাং তাহারা ইহজগতের ক্ষুদ্রতম ঘটনাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। মুসলিম যুগের ইতিহাস অধিকাংশই লিখিত। সিন্ধুদেশ ও দাহির সম্বন্ধে বালাজুরী কর্তৃক লিখিত ইতিহাস অসম্পূর্ণ। আলবেরুণীর কিতাব-উল-হিন্দ মুসলিম রচিত হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক বিবরণী। অবশ্য ইহার মধ্যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত নাই। তুর্ক-আফঘান যুগের প্রথম উপাদান মিনহাজউদ্দীন সিরাজের **তাবাকাৎ-ই-নাসিরী** ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হইলেও মুসলিম আগমনের অনেক সংবাদ তাবাকাৎ-ই-নাসিরীতে পাওয়া যায়। তুর্ক-আফঘান (পাঠান) যুগের সংবাদ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। জিয়াউদ্দীন বারাণীর **তারিখ-ই-ফিরুজশাহী**, মীর্জা হায়দার-প্রণীত **তারিখ-ই-রসিদী** গ্রন্থে বাবর সংক্রান্ত ঘটনা, আব্বাস শেরওয়ানী প্রণীত **তারিখ-ই-শেরশাহী** গ্রন্থে শেরশাহের ঘটনা, আবুল ফজলের **আইন-ই-আকবরী** এবং **আকবর নামা** নামক দুইটি গ্রন্থে সম্রাট আকবরের যুগের ঘটনা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি সব বিষয়ের প্রায় নির্ভুল সংবাদ পাওয়া যায়। বাদায়ুনীর **মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ** নামক ইতিহাসের মধ্যে আকবরের ধর্মজীবনের সম্বন্ধে নানা প্রকার সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্য সংবাদ উল্লিখিত রহিয়াছে। পরবর্তী মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মুতামিদ্ খানের **ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী**, ফেরিস্তার **তারিখ-ই-হিন্দুস্থান**, আবদুল হামিদ লাহোরীর **পাদশাহনামাতে** শাহজাহানের ইতিহাস, কাফিখানের **মুন্‌তাখাব-উল্-লুব্ববে** আওরঙ্গজেবের ইতিহাস বিখ্যাত। সুজনরায়, কেবলরাম ঈশ্বরদাস প্রভৃতি হিন্দু সুধী ব্যক্তি ফারসী ভাষায় মুসলমান যুগের কয়েকখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

দরবারী ইতিহাস

আত্মজীবনী

তৈমুরের জীবনী **মাল-ফুজাৎ**, বাবরের আত্মজীবনী **তুজুক-ই-বাবরী**, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী **তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী** মুঘল-যুগের রাজ্যশাসন, জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ। হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন স্বয়ং **হুমায়ুন-নামা** বা হুমায়ুনের কাহিনী রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। মুসলিম যুগে দরবারী

আত্মজীবনী

ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্ম অর্ধসত্য বা অসত্য স্তুতি করিয়াছেন। দরবারী ঐতিহাসিক কর্তৃক লিখিত ইতিহাসগুলি পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে।

বাদশাহগণ ফারমান, কর্মচারীর নিয়োগপত্র, বিজ্ঞপ্তি (ইস্তাহার), চিঠিপত্র, রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রের অনুলিপি করাইয়া রাখিতেন। এই সকল উপাদান যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, রামপুর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের দরবারে সংরক্ষিত আছে। পারস্য ও তুরস্কের রাজদরবারেও মুঘলযুগের কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

সরকারী দলিলপত্র

মুসলিম যুগে রচিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সমসাময়িক ভারতের চিন্তাধারা, ধর্মমত, পূজাপদ্ধতির বিবরণ রহিয়াছে ; মুসলিম সুফী-সাহিত্য, নানকের জপজী, শিখ গ্রন্থসাহেব, কবীরের দোঁহা, মীরাবাঈ-এর ভজন, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী এবং বাংলার মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ, ধর্মচিন্তা, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর প্রভাব সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ

মধ্যযুগে কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিত, পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, বণিক, চিকিৎসক ও রাজদূত ভারতে আগমন করেন। তাঁহাদের বিবরণীতে অনেক চিঠিপত্রের অনুলিপি, ঘটনার বিবরণ, বাণিজ্যিক সংবাদ, দেশের সামাজিক রীতিনীতির সুন্দর চিত্র বর্ণিত রহিয়াছে। মরক্কোর পর্যটক ইবন্ বাত্তুতার **রিহালা** নামক ভ্রমণকাহিনীতে তুঘলক বংশের কাহিনী, রালফ্ ফিচের বিবরণীতে আকবরের দরবার, স্যার টমাস রো এবং হকিন্সের বিবরণীতে জাহাঙ্গীরের দরবারের অনেক চিত্তাকর্ষক সংবাদ রহিয়াছে। চিকিৎসক বার্ণিয়ারের বিবরণে শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেবের কাহিনী এবং সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মণিমুক্তা-বিক্রেতা টেভারনিয়ারের বিবরণীতে মুঘলযুগের ব্যবসা বাণিজ্য ও ঐশ্বর্যের কাহিনী বর্ণিত আছে।

ভ্রমণ কাহিনী

খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও প্রচারক মনসারেট ও জেভিয়ারের বিবরণীতে আকবর ও জাহাঙ্গীরের ধর্মবিশ্বাস, হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রহিয়াছে।

বৈদেশিক বিবরণী

মধ্যযুগের মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিদর্শন হইতে সমকালীন শিল্পকলা, ধর্ম ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। দিল্লীর কুতুবমিনার, তুঘলকাবাদের প্রাসাদ, সাসারামে শেরশাহের সমাধি, দিল্লী ও আগ্রার প্রাসাদদুর্গ, জুম্মা মসজিদ, ফতেপুরসিক্রি, তাজমহল ও সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধি এবং লাহোর, শ্রীনগর, জৌনপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের প্রাসাদ, দিল্লী ও আগ্রার মসজিদ এবং লাহোর ও কাশ্মীরের বাগ-বাগিচা মুঘলযুগের শিল্পোৎকর্ষ ও ঐশ্বর্যের অমলিন সাক্ষ্য।

স্থাপত্য

আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপাদান: আধুনিক যুগের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত। সমসাময়িক শিল্প, স্থাপত্য এবং সাহিত্যের মধ্যে এই যুগের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আইন ও বিচার বিভাগের কাগজপত্রে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে।

ভারতবর্ষে আগত ইওরোপীয় বণিকদের ইতিহাস ভারতে এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে রক্ষিত আছে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে, দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান আরকাইভস'-এর দপ্তরে এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য সরকারের 'রেকর্ড আফিসে' রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্র ও দলিলপত্রের অনুলিপির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

সরকারী দপ্তরে রক্ষিত ইতিহাস

সমসাময়িক যুগের রাজনীতিবিদ্, পর্যটক, ধর্ম-প্রচারক ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির আত্মজীবনী, দিনলিপি, চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, হাইকোর্টের মকদ্দমার নথিপত্র এবং বিলাতের পার্লামেন্টে আলোচনার বিবরণীর মধ্যে বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান আছে। পর্তুগাল, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইলে আধুনিক ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে। বর্তমান যুগের ইতিহাস যদি রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী রচিত না হয়, তবেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বিগত শতাব্দীতে 'জিলা সংবাদ' (District Gazetteer) মুদ্রিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ যুগে প্রতি বৎসর রাজদপ্তর হইতে 'বার্ষিক সংবাদ সংকলন (Annual Register) প্রকাশিত হইত। বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনায় জিলা-সংবাদ ও বার্ষিক-সংবাদ সংকলন অত্যাবশ্যক।

অনুশীলনী

১। ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
(What are the different sources of Indian History in general ?)

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদানগুলি বর্ণনা কর।
(Give in details the sources of reconstruction of Ancient Indian History.)

৩। মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনার উপাদনেগুলির বর্ণনা দাও।
(Describe the sources of reconstruction of Medieval and Modern Indian History).

তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধু সভ্যতা

অধ্যায় পরিচয়ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রভাগা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে একটি প্রাচীন শুষ্ক নদীর পার্শ্বে অবস্থিত হরপ্পা নামক স্থানে কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ননীগোপাল মজুমদার হরপ্পা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে সিন্ধুনদের একটি প্রাচীন অববাহিকার পার্শ্বে অবস্থিত লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদড়ো (মৃতের নগরী) নামক স্থানে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। কালক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের অধীনে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের অনুরূপ বহু জিনিস পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়। ইদানীং দক্ষিণে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে, পূর্বে দিল্লীর সমীপবর্তী অঞ্চলে এবং বহির্ভারতে বেলুচিস্থানের 'নাল' অঞ্চলে এবং তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর নিকটবর্তী কিস, উর, টেল্-এল্-আসম্ অঞ্চলেও ঐরূপ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে মহেঞ্জোদড়ো বা পরবর্তী সুমেরীয় সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আহম্মদাবাদের নিকট লোথালে খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন একটি সম্পূর্ণ নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্যাম্বে উপসাগরের নিকটবর্তী এই নগর ও ইহার সুগঠিত পোতাশ্রয় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ নগর-জীবন ও বাণিজ্যাশ্রিত সভ্যতার ইংগিত বহন করিতেছে। অন্যদিকে, দেশ বিভাগের পর লোথালই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য ভারতীয় পটভূমি রচনা করিতেছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, পশ্চিম এশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে একটি সুবিশাল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই সভ্যতা ভারতের পূর্বাঞ্চল ও গঙ্গার তট অনুসরণ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। সিন্ধু অঞ্চলে প্রথম এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার নামকরণ করিয়াছেন **সিন্ধু সভ্যতা**। সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের ফলে ভারতের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হইয়াছে, বহু প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে।

সমসাময়িক পৃথিবীর সভ্যতাঃ আপাত আবিষ্কৃত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার লীলাকাল খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার লীলাভূমি ছিল মিশর, চীন, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া

(পারস্য) ও পঞ্জাব। এই সভ্যতাগুলি সবই নদীমাতৃক। নীল নদের তীরে মিশর, হলুদ নদীর তীরে চীন, তাইগ্রীস-ইউফ্রেটিসের তীরে আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া এবং সিন্ধুর তীরে পঞ্জাব। এই সমস্ত সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। সাম্রাজ্যবাদী মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া ছিল ধ্বংসবিলাসী। চীন ও হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার মধ্যে কোন ধ্বংসাত্মক সভ্যতার ইংগিত পাওয়া যায় না।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কে ?ঃ সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার মত পোষণ করেন। কেহ বলেন, দ্রাবিড়গণ সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, দ্রাবিড়গণ পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিত এবং দ্রাবিড়গণই দক্ষিণ ভারতে আগমনের পূর্ববর্তী কালে সিন্ধু অঞ্চলে একটি বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। নগর পত্তন, দগ্ধ মৃত্তিকা-নির্মিত ইষ্টক, কুম্ভকারের চক্র, ব্রোঞ্জ ও তাম্র ধাতুর ব্যবহার, চিত্রে লেখন লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন— সুমের, ইলাম ও মেসোপোটিমিয়া হইতে এই সভ্যতা সিন্ধুদেশে প্রসারিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন, ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার আদি জননী। ভারতবর্ষ হইতে সিন্ধু ও পঞ্জাবের পথে একটি বিরাট সভ্যতা পঞ্চনদ ও অক্ষু নদের (শির দরিয়া) স্রোতধারা বাহিয়া পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, আর্যগণই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা; কালের প্রভাবে সিন্ধদেশে আর্য ও অনার্য সভ্যতা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আবার কেহ বলেন, ন্যূনাধিক সমকালে দুই সভ্যতাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভারতের অভ্যন্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত আর্যগণ বারংবার আক্রমণ করিয়া দ্রাবিড়গণকে দক্ষিণ দেশে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ সাধন করেন।

দ্রাবিড় সভ্যতা

আর্যসভ্যতা

অবশ্য এই সমস্ত মতই অনুমানসাপেক্ষ, কারণ মহেঞ্জোদড়ো লিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নাই এবং সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন কোন গ্রন্থও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সিন্ধু সভ্যতার কাল নির্ণয়ঃ আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক অন্যান্য দেশের সভ্যতার চিহ্নগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার আরম্ভকাল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী। উর ও কিস নগরে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির অনুরূপ। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কিস-এ আবিষ্কৃত সীলটি খ্রীষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ববর্তীকালের। সুতরাং মহেঞ্জোদড়োর সীলটি অন্তত বর্তমান যুগ হইতে পাঁচসহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী। তারপর মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একের পর একটি করিয়া সাতটি

স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় নগরটি বহুবার ধ্বংস হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারই নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল। ধ্বংস হওয়া মাত্রই যে নগরটি পুনর্নির্মিত হইয়াছিল তাহাও মনে হয় না; কারণ নগরের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন ধরনে এবং বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। নির্মাণ ব্যাপারে প্রতি স্তরে আনুমানিক দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলেও মহেঞ্জোদড়ো নগরের অবস্থিতি অন্তত পনর শত হইতে দুই সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার অবস্থান

সিন্ধু সভ্যতার পরিচয়ঃ সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে সিন্ধু দেশবাসীর নগর পরিকল্পনা, পৌর স্বাস্থ্যজ্ঞান, নাগরিক জীবন, আর্থিক জীবন, খাদ্যবস্তু, অস্ত্র-শস্ত্র, অলংকার, তৈজসপত্র, বসন-ভূষণ, শিল্প-বাণিজ্য, ধর্ম এবং সভ্যতার খণ্ড খণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেঞ্জোদড়ো নগরঃ এই নগরটি ছিল আয়তনে সুবিশাল; নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ ছিল। রাজপথের দুই পাশে সারিবদ্ধ ইষ্টক-নির্মিত গৃহশ্রেণী ছিল; গৃহগুলি কোথাও দ্বিকক্ষ, কোথাও বহুকক্ষ; কোথাও একতল, কোথাও সপ্ততল। নগরের এক প্রান্তে ধনীর বিরাট অট্টালিকা, অন্যদিকে দরিদ্রের কুটির; প্রাসাদগুলি প্রাচীরবেষ্টিত, উদ্যানসমন্বিত। মসৃণ প্রস্তরাবৃত গৃহতল, সুবিশাল গৃহদ্বার, প্রশস্ত গবাক্ষ, প্রশস্ত অথচ স্বল্পোচ্চ সোপানশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু-বাসীর স্বাস্থ্যজ্ঞান ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নলকূপ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার এবং উপযুক্ত প্রাঙ্গণ ছিল। এখানে বিশাল স্তম্ভোপরি রক্ষিত একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত ঐ কক্ষটি পৌরসভা-গৃহ, প্রার্থনা মন্দির অথবা শস্যভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইত। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত বীজ হইতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম ও পদ্মফুলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বিরাট স্নানাগার (১৮০ × ১০৮ ফুট) প্রত্নতাত্ত্বিকদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। এই স্নানাগার ছিল চতুষ্কোণ উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; মধ্যস্থলে ছিল একটি (৩৯ × ২৩ × ৯ ফুট পরিমিত) স্নানকুণ্ড। স্নানকুণ্ডের চতুষ্পার্শে ইষ্টক-নির্মিত অলিন্দ (গ্যালারী) এবং বস্ত্র পরিবর্তনের উপযোগী প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেক দিকেই অলিন্দ হইতে সোপানশ্রেণী

স্নানকুণ্ডের সলিল পর্যন্ত অবতরণ করিয়াছে। একদিকে পার্শ্ববর্তী একটি অবিশ্রান্ত জলধারা স্নানকুণ্ডকে জলপূর্ণ করিয়া দিত। অন্যদিকে একটি

মহেঞ্জোদড়ের রাজপথের দুই পার্শ্বের গৃহশ্রেণী

বৃহৎ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। আজ পাঁচ সহস্র বৎসরের ব্যবধানেও সেই বিরাট স্নানাগার এবং স্নানকুণ্ড কালের নিয়ম প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। নগরের বাসগৃহ, স্থাপত্য এবং নির্মাণ-শিল্প আলোচনা করিলে নগরবাসীদের পৌরশাস্ত্রজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও বিলাসপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে হয়। সিন্ধু সভ্যতার মতন উন্নত নগরপরিকল্পনা আধুনিক কালেও বিরল।

আধুনিক ধরনের পয়ঃপ্রণালী

সৈন্ধব নাগরিক ঃ সৈন্ধব নগরের আয়তন, বাসগৃহের পরিকল্পনা, প্রশস্ত পথ, স্নানাগার, প্রতি গৃহ ও পথ সংলগ্ন জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বিলাস সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, এই দেশের নাগরিক ছিল বিলাসী ও আয়েশপ্রিয়। তাহাদের জীবন ছিল সুসংবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত, তাহাদের সভ্যতা ছিল অতি উচ্চস্তরের। একটি ভগ্ন রন্ধনশালার ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে, সৈন্ধবদিগের প্রধান খাদ্য ছিল—গোধূম (গম); অবশ্য যব এবং খর্জুরও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মেষ ও ছাগ মাংস, ডিম্ব এবং মৎস্যের অর্ধভুক্ত অংশও রন্ধনশালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুবাসিগণ রন্ধনের জন্য ধাতু ও মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত।

খাদ্য

গৃহস্থের তৈজসপত্রের মধ্যে ছিল নানা আকারের ও নানা বর্ণের, নানা চিত্রাঙ্কিত পাত্র। সেগুলি ছিল দগ্ধমৃত্তিকা, তাম্র, ব্রোঞ্জ বা রৌপ্য-নির্মিত।
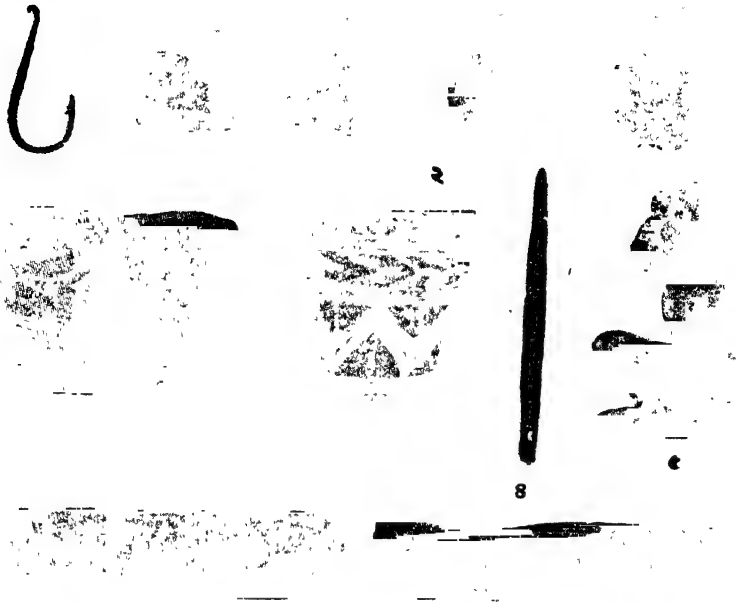
১—বড়শি, ২—খেলার গুটিকা, ৩—চীনামাটির সুচিত্রিত পাত্র, ৪—সূচ,
৫—শিশুর খেলনা, ৬—বিভিন্ন জন্তুর চিত্রযুক্ত সীলমোহর

মহেঞ্জোদড়োতে লৌহ-নির্মিত কোন দ্রব্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মহিষের শৃঙ্গ, পশুর অস্থি এবং গজ-দন্ত নির্মিত চিরুণী, সূচ, কাঁচি, শিশুর খেলনা, পুরুষের ব্যবহার্য ক্ষুর, পাশার ঘুঁটি, বসিবার চেয়ারের মত পায়াযুক্ত আসন প্রভৃতি বহু দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। একাধিক নৃত্যময়ী নগ্ন নারীমূর্তি দেখিয়া ঐতিহাসিগণ মনে করেন যে, নৃত্যগীত সিন্ধুবাসীদের সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল।

গৃহস্থালীর তৈজসপত্র

কার্পাস-বস্ত্র নিত্যব্যবহার্য ছিল, কিন্তু শীত নিবারণের জন্য পশম-বস্ত্রও ব্যবহৃত হইত। অলংকার সর্বজনপ্রিয় ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়েই কেশগুচ্ছে কবরী, গলদেশে হার, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিত। কটিদেশে মেখলা, নাসিকাগ্রে নোলক, কর্ণে কুণ্ডল, চরণ-সন্ধিতে মল, পদাঙ্গুলীতে নূপুর ছিল নারীদের ভূষণ। এই সমস্ত অলংকারের বিচিত্র

বসন-ভূষণ

রূপ, বর্ণ-বিশ্লেষণ, কারুকার্য প্রাচীন সৈন্ধবদিগের সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। মহেঞ্জোদড়োতে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, গজদন্ত নির্মিত বহু অলংকার আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্ফটিক ও রক্তপ্রস্তর খচিত মূল্যবান অলংকার সিন্ধুবাসীদের আর্থিক অবস্থা, সৌন্দর্যপ্রীতি এবং সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে।

অলংকার

সিন্ধুবাসীর আর্থিক জীবন ঃ শিল্প ও বাণিজ্য ছিল সিন্ধুবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। পশুপালন ছিল জীবনযাত্রার অন্যতম বৃত্তি। এখানে বৃষ, মহিষ মেষ, হস্তী ও উষ্ট্রের বহু কঙ্কাল ও অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এদেশে অশ্বের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। শিশুদের খেলনা এই সমস্ত পশুপক্ষীর অনুকরণে নির্মিত হইত। এখানে পশুপক্ষীর মূর্তি সমন্বিত বহু সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সীলমোহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে ও রাজকার্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ঐ সীলমোহরগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে উহাতে সিন্ধুবাসীদের তক্ষণ-শিল্প-জ্ঞান, পশুপ্রীতি এবং সৌন্দর্যানুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্তু-শিল্প, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী, কৃষিকার্যের উপযোগী যন্ত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিলে ধারণা হয়, আর্থিক-জীবনে সিন্ধুবাসী যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং সমাজে নানা প্রকার শিল্পী ছিল। উহাদের মধ্যে কুম্ভকার সূত্রধর, মণিকার, গজদন্ত-শিল্পী, তক্ষণশিল্পী ও স্থপতি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্য নির্মাণের জন্য সিন্ধুবাসী বিদেশ হইতে তাম্র, টিন,
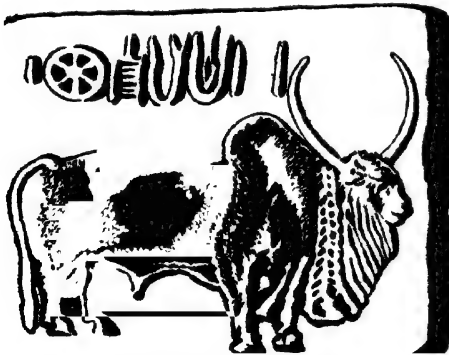
সীলমোহরে বৃষমূর্তি

মূল্যবান প্রস্তর আনয়ন করিত; ঐ সমস্ত দ্রব্য সিন্ধুবাসীদের ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের বিষয় প্রমাণ করে। বিভিন্ন পরিমাণ ও সমান আকারের অনেকগুলি শিলা দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হইত।

শিল্প ও শিল্পী

প্রাচীনযুগে জলপথে মিশরে, স্থলপথে বেলুচিস্তানে, সুমেরীয় অঞ্চলে এবং ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব গাঙ্গেয় দেশে, দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত সিন্ধুবাসীদের বাণিজ্য চলাচল ছিল। কারণ, এই সমস্ত অঞ্চলে নির্মিত দ্রব্যাদি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে, সিন্ধুবাসী নগরকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিত, পরিখার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সিন্ধুবাসী যুদ্ধপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, এখানে বর্শা, কুঠার, তীরধনুক, ছুরিকা, গদা, প্রস্তর-ক্ষেপণ-রজ্জু প্রভৃতি

যুদ্ধাস্ত্র

অতি সামান্য কয়েকটি অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন লৌহ অস্ত্র বা তরবারির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই অস্ত্রগুলি তাম্র এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত, ক্বচিৎ প্রস্তর নির্মিত। পৌরশাসন-ব্যবস্থা নিশ্চয় সুষ্ঠু ছিল, নচেৎ একই পরিকল্পনা, একই রীতি অনুকরণে গৃহগুলিনির্মিত হইত না। সাধারণ মানুষ বাণিজ্য ও শিল্পীজীবী ছিল, সুতরাং তাহারা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, আরামপ্রিয় ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

সিন্ধুবাসীর ধর্ম জীবন ঃ সিন্ধুবাসী ধর্মে বিশ্বাস করিত। এখানে আবিষ্কৃত দ্রব্যের মধ্যে নারীমূর্তির আধিক্য দর্শনে অনুমান করা যায় যে,

দেবদেবীর মূর্তি

তাহারা মাতৃকার অর্চনা করিত। তাহাদের সীলমোহরে বহু নারীদেবতার মূর্তি ক্ষোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। পুরুষদেবতার মধ্যে শিব বা শিবানুকল্প দেবতা পূজিত হইত। হস্তী, ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি মূর্তি পরিবৃত ত্রি-মস্তকবিশিষ্ট ত্রিশূলধারী যোগাসনে উপবিষ্ট কয়েকটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা হইতে অনুমান করা যায় যে, স্থানীয় লোক পশুপতি শিবের ন্যায় কোন দেবতার পূজা করিত। অর্ধমানব, অর্ধপশু হয়গ্রীব, নরসিংহ মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয় ঐগুলিও দেবমূর্তি এবং আরাধ্য দেবতা ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, সৈন্ধবগণ প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু, সর্প প্রভৃতির অর্চনা করিত এবং তাহারা প্রেতপূজারীও ছিল। এখানে

সীলমোহরে পশুপতি মূর্তি

কোন মন্দির, চৈত্য বা কোন বেদী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু পূজার পুষ্প চন্দনের ব্যবহার, শিব ও উমার কল্পনা এবং যোগ-সাধনার আভাস সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিন্ধুবাসী পরলোকে বিশ্বাস করিত এবং সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহ প্রোথিত করিত। শবাধারে কোথাও মৃতের অস্থি, কোথাও বা করোটি পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রোথিত করা হইত। সমাধিপাত্রে পশুপক্ষীর অস্থি, মালা, অলংকার রক্ষিত হইত। কখনও বা মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহারের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রক্ষিত হইত। মৃতের কঙ্কাল ও কপাল দেখিলে মনে হয়, এখানে দ্রাবিড়, ইরাণ, পামীরীয় এবং আর্যজাতির বসবাস ছিল। মহেঞ্জোদড়ো অঞ্চলে শবাধারে কয়েকটি মৃতদেহের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শব ব্যবস্থা

বৈদিক সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার পার্থক্য : দুইটি সভ্যতারই লীলাস্থল ভারতবর্ষ। সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এবং সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চলে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। আর্যসভ্যতা সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, উহার চিহ্ন আরও ভারতবাসীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। বাংলাদেশে দুর্গাপুর অঞ্চল খননের সময় কতকগুলি প্রাচীন বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের দ্রব্যাদির সামঞ্জস্য আছে। পরবর্তিকালের ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার ছায়াপাত রহিয়াছে। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পার ভাষা ও ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট। বৈদিক আর্যসভ্যতা ছিল প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক ; সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। বৈদিকগণ অয়স্ বা লোহের ব্যবহার জানিত, সৈন্ধবগণ লোহের ব্যবহার জানিত না। অশ্ব বৈদিক জীবনের অঙ্গ ছিল, সৈন্ধবগণ অশ্ব সম্বন্ধে অনবহিত ছিল। গোমাতা আর্যপূজ্যা ছিল, সৈন্ধবগণ বৃষকে অর্চনা করিত। মাতৃকা পুজা, শিবার্চনা সৈন্ধব ধর্ম-জীবনের অঙ্গ ছিল। বৈদিকযুগে মাতৃদেবতা ও শিবের লিঙ্গপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সিন্ধুবাসী মূর্তি অথবা প্রতীক পূজা করিত। বৈদিকযুগে মূর্তি-পূজার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। পার্থক্য ও সমতা বিচার করিলে বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়।

ডক্টর পুশলকর অনুমান করেন যে, ছাপ দেওয়া মুদ্রা, ওজনের বাটখারা, মাটির খেলনা, পশুপতি শিবের মূর্তি গঠন ও পূজা, তথাগতের ধ্যানমূর্তি ইত্যাদির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার উপর সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব অনুমান করা যায়।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংস : অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেই ধ্বংস হইয়াছিল। যদি জলপ্লাবন ধ্বংসের

কারণ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বাইবেল ও কোরাণ বর্ণিত নোয়া প্লাবনের (Flood of Noah) সমকালীন ঘটনা অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর কাহিনী। অন্যদিকে মহাভারতের যুদ্ধের সমকালে সিন্ধু দেশে জয়দ্রথ রাজত্ব করিতেছিলেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিন্ধুদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিন্ধু অঞ্চলে একই স্থানে বিভিন্ন স্তরে আটটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারবার একই কারণে সিন্ধু অঞ্চল ধ্বংস হয় নাই—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ মৃতের দেশ। এই শব্দ হইতে অনুমান করা যায় যে, এই স্থানে বহু মৃতদেহ দীর্ঘ দিবসব্যাপী স্তূপীকৃত ছিল। সেই জন্যই ইহার নাম মৃতের দেশ। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ। কেহ বলেন ভূমিকম্পে সমস্ত দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কারণ, মৃত্তিকা নিম্নে স্নানরতা নারী, রন্ধনব্যস্ত পাচক, হলচালনরত কৃষক, যন্ত্রহস্ত শ্রমিক, পথচারী নাগরিকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে মনে হয় ভূমিকম্পে অন্ততঃ একবার সিন্ধু অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ভূমিকম্পের জন্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে শস্যশ্যামল সিন্ধুদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়া আশ্চর্য নয়। অন্য মতে বারংবার আসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণে সিন্ধুদেশ জনহীন হয় এবং বহু লোক স্থানত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে; স্থানত্যাগী সৈন্ধবগণই দ্রাবিড় নামে পরিচিত। আর্য জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজয়ও সিন্ধু পরিত্যাগের কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তই অনুমান মাত্র।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার কাহিনী বর্ণনা কর।
(Narrate the story of discovery of the Indus Valley Civilisation.)

২। সিন্ধু-সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(Describe, in brief, the Indus Valley Civilisation.)

৩। বৈদিক ও সিন্ধু সভ্যতার তুলনা কর। সিন্ধু সভ্যতা কিভাবে বিনষ্ট হয়?
(Give a comparative review of the Vedic and the Indus Valley Civilisation. How was the Indus Valley Civilisation destroyed?)

চতুর্থ অধ্যায়

আর্যজাতির ভারতে আগমন ও আর্যবৈদিক সভ্যতা

অধ্যায় পরিচয় : পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে ভারতের সমস্ত অধিবাসী বহিরাগত। বিভিন্ন জাতি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। নবাবিষ্কৃত অস্ত্র-শস্ত্র, গৃহ, গুহা, সমাধি, শবাধার, জীবনযাত্রার সামগ্রী ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে, ভারতীয় সভ্যতার দুইটি বিভাগ। যথা: (১) প্রাগৈতিহাসিক, (২) ঐতিহাসিক। প্রাগৈতিহাসিক বিভাগের তিনটি স্তর:—(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ, (খ) নব্যপ্রস্তর যুগ, (গ) ধাতু বা তাম্রযুগ ; সর্বশেষ স্তরে আসিয়াছে **ঐতিহাসিক যুগ** অর্থাৎ এই যুগের ইতিহাস প্রমাণিত অথবা প্রমাণসিদ্ধ।

প্রাচীন প্রস্তরযুগ : মাদ্রাজ অঞ্চলে কতকগুলি অমসৃণ, শ্রীহীন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে যুগে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত, সেই যুগকে ঐতিহাসিকগণ আখ্যা দিয়াছেন প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এই যুগের মানুষের বংশধরগণ বোধ হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত। তাহারা নেগ্রিটো জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নব্য প্রস্তর যুগ : মাদ্রাজের বেলারি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত মসৃণ কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণের কর্মশালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে মৃৎপাত্র এবং সমাধিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ আখ্যা দিয়াছেন নব্য প্রস্তর যুগ। কোল, ভীল, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি ইহাদের বংশধর। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই নব্য প্রস্তর যুগের মানুষকে প্রোটো (আদিম) অস্ট্রালয়েড জাতির বংশধর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তাম্র যুগ বা ধাতুযুগ : নব্য প্রস্তর যুগের বহু সহস্র বৎসর পরে আসিয়াছে তাম্র যুগ। সম্প্রতি নাগপুর, হায়দরাবাদ ও মহীশূর অঞ্চলে বহু সমাধি এবং সমাধির অভ্যন্তরে তাম্রনির্মিত পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মসৃণ প্রস্তরাস্ত্র, কৃষ্ণ ও রক্ত মৃত্তিকা নির্মিত পাত্র, শুক্তিমুক্তার অলংকার, পদ্মরাগ মণিখচিত কৃষ্ণসর্প-মস্তক এবং নানা প্রকার ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র তাম্রযুগের অপূর্ব নিদর্শন। কখন্ কোন্ যুগের অবসান, কখন্ পরবর্তী যুগের আরম্ভ, তাহা যথার্থভাবে নির্ণয় করা সুকঠিন। তাম্র যুগের সঙ্গে দ্রাবিড় সভ্যতা অতি নিবিড় ভাবে বিজড়িত। অনেকে অনুমান করেন যে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি তাম্র যুগের মানুষেরই বংশধর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তে আরম্ভ হইল **ঐতিহাসিক যুগ**। এই যুগ হইতেই ভারতে আর্য* জাতির প্রাধান্য।

আর্য আগমনের পূর্বে প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় নামে একটি সভ্যজাতি বাস করিত। দ্রাবিড় ব্যতীত আরও অনেকগুলি জাতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে আছে ; যথা—রাক্ষস, দানব, দৈত্য, পিশাচ, পনি, অসুর, নাগ, কিন্নর, অপ্সরা, গন্ধর্ব ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব কাব্য-সাহিত্য ও অভিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ। কতকগুলি জাতি অন্যান্য জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি জাতি এখনও পর্বত বা অরণ্যাশ্রিত হইয়া বাস করিতেছে। ইহারা সাধারণতঃ অনার্য বা আর্যেতর বলিয়া পরিচিত। ভারতের উচ্চ শ্রেণীর অধিবাসিগণ আর্যরক্ত-সম্ভূত বলিয়া গর্ব অনুভব করেন।

আর্যজাতির পরিচয়ঃ আর্যজাতির যথার্থ পরিচয় এখনও অনুমান-সাপেক্ষ। আর্যদের আদিবাসভূমি সম্বন্ধে দুইটি মত—আর্য জাতি ভারতে জাত ; আর্যজাতি ভারতে বহিরাগত অর্থাৎ উত্তর মেরু, সাইবেরিয়া, তুর্কীস্থান বা বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়া ও হাঙ্গারী প্রভৃতি অঞ্চল ছিল আর্য জাতির পিতৃভূমি। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলেন, ব্রহ্মাবর্ত (সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) আর্যজাতির আদি নিবাস। আর্যজাতি যদি বহিরাগত হইত তবে শ্রুতিধর আর্যগণ নিশ্চয় বেদের কোন-না-কোন মন্ত্রে তাঁহাদের পিতৃভূমি বা আদি নিবাসের উল্লেখ করিতেন। আর্যগণ সপ্তসিন্ধু দেশকেই নিজেদের আদি বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর্যগণ যদি উত্তর মেরু, তুর্কীস্থান, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ভারতে আসিতেন, তবে আর্যভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে সেই সব দেশের ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিত। অন্যদিকে সংস্কৃতই ভারতের অধিকাংশ ভাষার জননী অথবা উহারা সংস্কৃত শব্দপুষ্ট। ভারতবর্ষ আর্যজাতির পিতৃভূমি—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সর্বশেষ যুক্তি এই যে, বেদে যে সমস্ত পর্বত, নদী ও নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, ঐগুলি প্রায় সবই ভারতীয়, যথা—মঞ্জুবৎ (হিমালয়ের শৃঙ্গ), যমুনা, সরযূ, সরস্বতী।

আদি নিবাস ভারতবর্ষ

তৈত্তরীয় আরণ্যকে ক্রৌঞ্চ পর্বত অথবা কৈলাস ও মানস সরোবরের উল্লেখ আছে। কৌশীতকি উপনিষদে বিন্ধ্য পর্বতের বর্ণনা আছে। এই সমস্ত আভ্যন্তরিক উল্লেখ আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষই আর্য জাতির আদি নিবাস।

---

* আর্য শব্দটি ব্যাপক। আর্য শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত আর্য শব্দটি জাতিবাচক, যথা—গ্রীকগণ আর্য (জাতি) ; আর্য শব্দটি ভাষাবাচক, যথা—সংস্কৃত আর্য (ভাষা) ; বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে আর্য শব্দের অর্থ—পূজ্য, গুরুজন, শ্রদ্ধেয় ইত্যাদি। ঐতিহাসিকগণ আর্যশব্দ জাতিবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করেন।

কিন্তু আধুনিক যুগের বহু পণ্ডিতের মতে ইওরোপ আর্যজাতির জন্মভূমি। তুর্কীস্তানের রাজধানী আনকারার নিকটবর্তী বোঘ্‌হাজকোই নামক স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর একটি ইষ্টকলিপিতে আর্য পঞ্চদেবতা ইন্দ্র-বরুণ-মিত্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্যদেবতার নামোল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, আর্যগণ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া উপনিবেশ সন্ধানে বহির্গত হন। বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, আর্যদের আদি নিবাস সাইবেরিয়া অঞ্চল।

ইলাবৃতবর্ষ

কেন, কবে, কোন্ সুদূরে এই আর্যজাতি তাহাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান বর্তমান ঐতিহাসিকগণ জানেন না। জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ইহা নিঃসন্দেহ যে, আর্যজাতির একটি শাখা ইওরোপের দিকে, অন্য একটি শাখা ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। শেষোক্ত শাখার একটি উপশাখা হিন্দুকুশ পর্বতের নিকট হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ইরাণে এবং অন্য একটি উপশাখা হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রাচীন ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্যগণ যে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে তাহাদের ধর্ম, ভাব-ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে। ভারতীয় দেবতা সূর্য=ইরাণীয় দেবতা সুরিয়স্, অগ্নি=অগ্‌নাস, বরুণ=বরণাস্, মরুৎ=মরুত্তস্। প্রাচীন অসুর জাতির গুরু শুক্রাচার্য আর্যদের পূজ্য। উভয় জাতির মুখ্যদেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; ভারতীয় আর্যদের দেবরাজ ইন্দ্র, ইরাণীয়দের প্রধান দেবতা অহুর অর্থাৎ অসুর। বেদে ইন্দ্র অসুরপতি নামে অভিহিত। ভারতীয় ভাষায় সোম=ইরাণীয় হাওম, মন্ত্র=মন্ত্র, যজ্ঞ=যশন, আহুতি=আজুতি ইত্যাদি। জাতীয় সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন প্রথা ভারতীয় আর্য এবং ইরাণীয় আর্যদের মধ্যে সমভাবেই প্রচলিত ছিল। অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ-প্রথা ভারতবর্ষ ও প্রাচীন ইরাণে একই প্রকার ছিল। সুতরাং পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য এবং ইরাণীয় আর্যগণের আদি নিবাস এক স্থানে ছিল এবং তাহারা পরস্পর জ্ঞাতি।

ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্য

আর্যগণের আগমনকাল ঃ আর্যজাতির ভারতে আগমনকাল সম্বন্ধে দিনক্ষণ নির্ণয় করা অসম্ভব; বোঘ্‌হাজকোই লিপির মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হিত্তাইতি এবং মিতানী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার সময় উভয়ে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পঞ্চ আর্যদেবতার আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিয়াছিল। এই আর্যদেবতার উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে আর্যগণ বর্তমান তুর্কীস্থান হইতে ভারতের পথে আসিয়াছিলেন অথবা ভারতীয় আর্যগণ তুরস্কের পথে অন্য কোথাও গমন করিতেছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আর্যগণ খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্র অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে ভারতে বসতি স্থাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশ্য

আর্যগণ একসঙ্গে ভারতে আগমন করেন নাই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া আর্যজাতি বিভিন্ন গোত্রপতি বা দলপতির অধীনে ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্য আর্যদের দেবতা, গোত্র ও মন্ত্র পৃথক।

প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন. আর্যগণ খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ দশ সহস্র বৎসর পূর্বেই ভারতে বসবাস করিতেন এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত জাতির আদি জন্মভূমি।

উত্তর ভারতে আর্যাধিকার: আর্যগণ প্রথমে সিন্ধু ও উহার সাতটি উপনদী-বিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিলেন। এই সাতটি উপনদীর নাম— বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু এবং রাজপুতনার মরুভূমি অঞ্চলে অধুনাবিলুপ্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী। বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চল সপ্তসিন্ধু
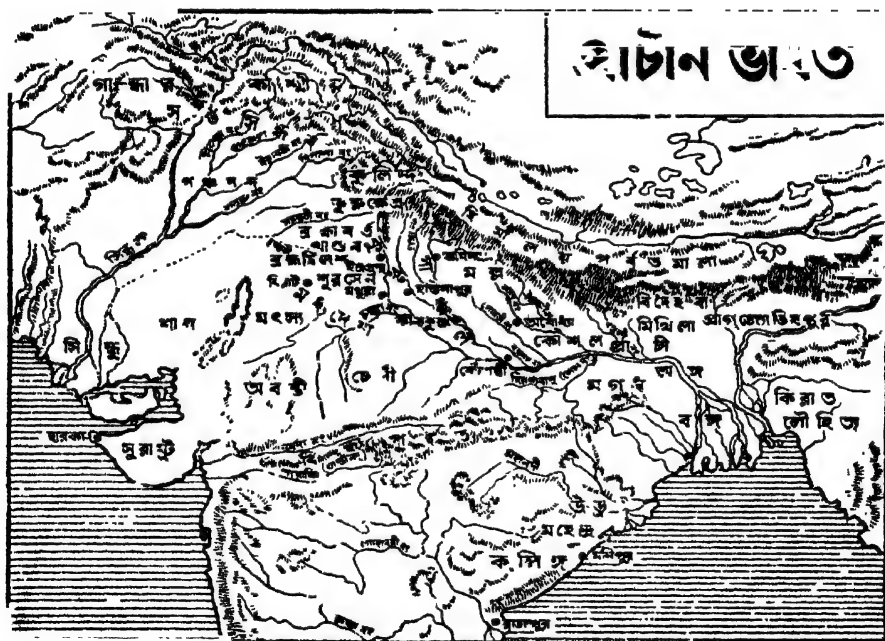
নামে আখ্যায়িত। ইহাই প্রাচীন ইরাণীয় গ্রন্থ আবেস্তায় বর্ণিত হপ্ত হিন্দু। ক্রমে আর্যগণ গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে কুরু (দিল্লী), শূরসেন (মথুরা), ও মৎস্য (জয়পুর), পাঞ্চাল (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল), কোশল (অযোধ্যা), বৎস (প্রয়াগ), কাশী (বারাণসী) এবং মিথিলা বা বিদেহ (উত্তর বিহার) পর্যন্ত অগ্রসর হন।

বসতি বিস্তার

বঙ্গদেশ ও মগধ বহুকাল অনার্য-অধ্যুষিত হইলেও আর্যগণ ঐ দুই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বসবাস করিতেন। রামায়ণের যুগে তাড়কা রাক্ষসীর রাজ্য ছিল

অযোধ্যা ও মিথিলার অন্তর্বর্তী করুষ ও মলদ দেশ (বর্তমান পালামৌ সমীপ স্থান)। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ এবং মগধকে পক্ষী অর্থাৎ পক্ষীর ন্যায় দুর্বোধ্য ভাষাভাষী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের ভাষা আর্যদের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। অঙ্গিরা, ভৃগু, কণ্ব, গৌতম, যবক্রীত, মেধাতিথি প্রভৃতি বহু বৈদিক ঋষি পূর্বদেশীয় ছিলেন। মহাভারতের যুগে আর্যসভ্যতা আসমুদ্র হিমাচল, পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আসাম) পর্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল।

হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র (আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর) পর্যন্ত ভূভাগ আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হইল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নাম—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল **ব্রহ্মাবর্ত** ; কুরু, শূরসেন, মৎস্য, পাঞ্চাল অঞ্চল **ব্রহ্মর্ষিদেশ**।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পশ্চিমে বিনশন (পাতিয়ালা), পূর্বে প্রয়াগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মধ্যদেশ নামে মনুসংহিতায় অভিহিত করা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে আর্যবসতি বিস্তার : কালক্রমে আর্য জাতি বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু ব্যাপারটি সহজে সম্পন্ন হয় নাই। কথিত আছে, ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই ; সুতরাং বিফল যাত্রার নাম অগস্ত্য যাত্রা। অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র বনবাসের সময় দণ্ডকারণ্য (মধ্যপ্রদেশ), পঞ্চবটী (নাসিক) অঞ্চলে আর্য ঋষি-মুনি-তপস্বী ও রাক্ষসদের মধ্যে নৃশংস যুদ্ধের বহু চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। কবি বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনা বর্ণনার অন্তরালে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য রামায়ণে দ্রাবিড় প্রভৃতি কোন জাতির উল্লেখ নাই। দ্রাবিড় ভাষা হইতে দ্রাবিড় জাতি অথবা দ্রাবিড় দেশের নামকরণ হইয়াছে কিনা তাহা সুনিশ্চিত হয় নাই। তবে দ্রাবিড় শব্দ দ্বারা দ্রাবিড় ভাষা, দ্রাবিড় জাতি ও দ্রাবিড় দেশ সূচিত হয়।

রামায়ণে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ

দীর্ঘ দিবসব্যাপী চেষ্টার পর দাক্ষিণাত্যে আর্যবসতি স্থাপিত হইয়াছিল। মৌর্যযুগে দাক্ষিণাত্যে আর্যবসতির চতুষ্পার্শ্বে বিন্ধ্য ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুলিন্দ ও নিষাদ জাতি বাস করিত। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে শবর, বৈতরণী ও গোদাবরীর মধ্যভাগে কলিঙ্গ, গোদাবরী ও কৃষ্ণা অঞ্চলে অন্ধ্র এবং সুদূর দক্ষিণে তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি আর্য জাতির বাস ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের বিভাগগুলি বিদর্ভ (বেরার), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), দণ্ডক (মধ্যদেশ), অশ্মক ও মূলক (গোদাবরী-বিধৌত অঞ্চল) নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্য বিজিত হইলেও আর্যসভ্যতা উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে

গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। উহার প্রথম কারণ, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী দ্রাবিড় জাতির একটি সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বিন্ধ্য পর্বত এবং গভীর অরণ্যানী আর্য অগ্রগতির সম্মুখে বিপুল বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ দেশ আর্যধর্ম, দেবদেবী, সংস্কৃত ভাষা এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও বর্ণাশ্রমপ্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। দক্ষিণী জাতিগুলির আর্যধর্মপ্রীতি গভীর।

বেদ ও বৈদিক সাহিত্য: ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ **বেদ**। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বেদ অনন্ত জ্ঞানের আধার। হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয়; বেদ মানুষের রচিত নহে। সৃষ্টির প্রথম হইতেই সত্যরূপে বেদের বাণী জগতের সহিত বিজড়িত ছিল; প্রাচীন আর্য ঋষিগণ ধ্যাননেত্রে এই সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সত্য শিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইত বলিয়া বেদের অপর নাম **শ্রুতি**। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টারূপে বৈবস্বত মনু, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষির উল্লেখ আছে; বিশ্বামিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি। বেদ আর্যদের সকল ধর্ম ও চিন্তার মূল। বেদকে কেন্দ্র করিয়াই আর্যদের প্রায় সকল ধর্মমত ও পথ পরিকল্পিত হইয়াছে। বেদ রচয়িতাদের মধ্যে অদিতি, যমী, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি নারী; শিবি, প্রতর্দন, পুরুরবা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় এবং কৈবর্ত-পুত্র ব্যাস; অনার্য কন্যা উলুপীর পুত্র কনার্দ, উর্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ, জবালার পুত্র জাবালি প্রভৃতি শূদ্রের উল্লেখ আছে।

চতুর্বেদ: বেদের চারিটি শাখা, যথা,—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। উহাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম। ঋগ্‌বেদের সকল সূক্ত যে প্রাচীনতম তাহা নহে। কতকগুলি সূক্ত ক্রমশঃ সংযোজিত হইয়াছে। ঋক্‌বেদ **মন্ত্রবাচক**। উহার মধ্যে বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেত্রিশ জন দেবতার উদ্দেশ্যে ছন্দে রচিত ১,০২৭টি (অন্যমতে ১০১৮) সূক্ত, স্তোত্র বা মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এই স্তোত্রগুলির মধ্যে আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণাও আছে। সামবেদ **সংগীতবাচক**। সামবেদের স্তোত্রগুলি ছন্দে রচিত এবং যজ্ঞকালে সুর সংযোগে গীত হইত। সামবেদের পচাত্তরটি সূক্ত ব্যতীত সকল সূত্রই ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্বেদ **যজ্ঞবাচক**। যজুর্বেদে যজন, যাজন ইত্যাদি বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের বিবিধ বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। যজুর্বেদ গদ্যে রচিত অথর্ব বেদে দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতার পূজা, মারণ ও বশীকরণের মন্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদ নিশ্চলতা বাচক, উহাতে আর্যদের জ্ঞান **অথর্ব** বা **নিশ্চল** হইয়াছে অর্থাৎ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

বেদ বিভাগ

প্রতিটি বেদ আবার চারি ভাগে বিভক্ত—**সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক** ও **উপনিষদ** (বেদান্ত)। সংহিতা ভাগে আছে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বা

ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র। গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণভাগে আছে যাগযজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা। আরণ্যকে আছে ব্রাহ্মণভাগের গভীর তত্ত্বের আলোচনা। আরণ্যকে দার্শনিক তত্ত্বগুলি **উপনিষদে** পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসাহিত্য উপনিষদেই সমাপ্ত হইয়াছে। উপনিষদ বেদের পরিশিষ্ট।

সূত্র সাহিত্য : কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করিল। ইতিমধ্যে লোকমুখে প্রচলিত ভাষা ও বৈদিক ভাষার মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা দিল। তখন বেদ পাঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দার্থ গ্রহণ এবং যাগযজ্ঞাদি সম্পাদনের সুবিধার জন্য নূতন শাস্ত্র সূত্রাকারে অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে রচিত হয় বলিয়া উহাদের নাম **সূত্র সাহিত্য**। সূত্র সাহিত্য শ্রুতির পর্যায়ভুক্ত না হইলেও বেদবিদ্যার সহায়ক বলিয়া উহাদিগকে বেদের **অঙ্গ** বা **বেদাঙ্গ** বলা হয়। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত : **শিক্ষা** (শব্দ উচ্চারণ বিধি), **নিরুক্ত** (শব্দার্থ বিধি), **ব্যাকরণ** (ভাষা-প্রকরণ), **ছন্দ** (পদ-বিন্যাস প্রকরণ), **জ্যোতিষ** (যজ্ঞকাল নির্ণয় জ্ঞান) এবং **কল্প** (জীবনযাত্রা বিধি)। **কল্পসূত্র** বিপুল ; উহা তিন ভাগে বিভক্ত—**গৃহ্যসূত্র** (গার্হস্থ্য বিধি), **শ্রৌতসূত্র** (যাগযজ্ঞ বিধান) এবং **ধর্মসূত্র**—ইহলোক এবং পরলোক সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ। ধর্মসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরাশর স্মৃতি, মনুস্মৃতি প্রভৃতি ঊনবিংশতি সংখ্যক স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ষড়্‌দর্শন : উপনিষদে যে সকল দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়, দর্শন সাহিত্যে তাহাই চরম পরিণতি লাভ করে। এই দর্শনগুলির মধ্যে কপিলের **সাংখ্য**, পতঞ্জলির **যোগ**, গৌতমের **ন্যায়**, কণাদের **বৈশেষিক**, জৈমিনির **পূর্ব মীমাংসা** এবং বাদরায়ণ ব্যাসের **ব্রহ্মসূত্র** বা **উত্তর মীমাংসা** বিখ্যাত। এই সকল দর্শনের রচনাকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ধর্মশাস্ত্রে দর্শন ইত্যাদি ব্যতীত আর্যগণ অঙ্কশাস্ত্র, নক্ষত্রশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র (রাজনীতি), কামশাস্ত্র (ভোগনীতি), শিল্প, নাট্য ও সংগীতশাস্ত্র এবং স্থাপত্যবিদ্যাও আলোচনা করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের ধর্ম : বেদে আর্যগণের ধর্মচিন্তা ও ধর্মাচরণের চিত্র সুস্পষ্ট। প্রথম অবস্থায় বৈদিক ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি দর্শনে ভীত, বিস্মিত অথবা বিমুগ্ধ হইয়া আর্যগণ ঐ সমস্ত শক্তিকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করিত। **দ্যৌঃ** বা আকাশের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য ; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী **অন্তরীক্ষের** প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র এবং **ভৌম** বা পৃথিবীর প্রধান দেবতা ছিলেন অগ্নি। একই দেবতা বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক বিভিন্ন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন, দেবতার গুণ ও বিশেষণ বিভিন্ন স্তোত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রায় দুইশত পঞ্চাশটি স্তোত্র রচিত হইয়াছে, একই ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপ কল্পিত হইয়াছে। কখনও ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা, কখনও ধর্ম-

বৈদিক দেবতা

দেবতা, কখনও গো-দাতা, কখনও বা যুদ্ধ-বিজয়ী নেতা। প্রথমে বজ্রধারী ইন্দ্রই ছিলেন দেবরাজ। ইন্দ্রের পরে ছিল অগ্নি ও বরুণের স্থান। ঋগ্‌বেদে উষা, বাক্‌, পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি নারী-দেবতার উল্লেখ আছে। পরবর্তিকালে ধাতৃ, বিধাতৃ, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, মন্যু, প্রাচী, স্বা প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক ধর্মাচরণ

আর্যগণের ধর্মাচরণ প্রথমে অনাড়ম্বর ছিল। আর্যগণ দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, মাংস, সোমরস ইত্যাদি সাধারণ খাদ্য ও পানীয় বস্তু আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিত। যজ্ঞার্থে প্রায় প্রতি গৃহে অগ্নিশালা প্রজ্জ্বলিত থাকিত। যজ্ঞকালে আর্যগণ বেদের দশম মণ্ডলের কয়েকটি স্তবস্তুতি পাঠ করিত। উপাসনায় পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ছিল। স্ত্রী ছিলেন আর্য পুরুষের সহধর্মিণী। যজ্ঞের ফলস্বরূপ আর্যগণ কামনা করিত যুদ্ধ জয়, ক্ষেত্রে শস্য এবং নানাবিধ পার্থিব সুখ। বৈদিক আর্যগণ বহু দেবতার অর্চনা করিলেও স্তুতিকালে প্রত্যেক দেবতাকেই প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিত। নানা দেবদেবীর আরাধনা করিলেও আর্যগণ বিশ্বাস করিত যে, বিভিন্ন দেবতা একই পরমাশক্তির বিভিন্ন রূপ। আর্যগণের এই একেশ্বরবাদের ধারণা উপনিষদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মূর্তিপূজা আর্য সমাজে বহু পরে প্রচলিত হয়। কালক্রমে বৈদিকযুগের শেষভাগে নানারূপ বিধি-বিধান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জটিল হইয়া উঠিল এবং **পুরোহিত** নামক যাজকশ্রেণীর উদ্ভব হইল। যজ্ঞকালে পশুবলিপ্রথা বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তিকালে সাধারণ লোক রুদ্র (পশুপতি শিব) এবং বিষ্ণুর (কৃষ্ণ বাসুদেব) ভক্ত হইয়া উঠিল। বৈদিক আর্যগণ মূর্তি পূজা করিতেন—এইরূপ উল্লেখ নাই, তবে গৃহ্যসূত্রে ধরিত্রীদেবীর চিত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু মনুস্মৃতিতে মন্দিরে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 'নিষিদ্ধ' শব্দের ব্যবহারে মনে হয়—মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল, নচেৎ 'নিষেধ' শব্দ ব্যবহার করা হইত না।

বৈদিক যুগে বর্ণ-বিভাগ ঃ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে আর্যসমাজে জাতিভেদ না থাকিলেও বর্ণবিভাগ ছিল—গৌরবর্ণ বিজেতা আর্য এবং কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণত্বচ্‌) বিজিতদাস। কালক্রমে আর্যদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল—**ব্রাহ্মণ, রাজন্য** বা **ক্ষত্রিয়** এবং **বিশ্‌** বা **জন**। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ-সূক্তের একটি মাত্র শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে উক্ত হইয়াছে—পুরুষ অর্থাৎ স্রষ্টার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। বোধ হয়, জাতির এইরূপ উৎপত্তির বিবরণ রূপক ও ব্যাখ্যামূলক। গীতায় উল্লেখ আছে—গুণকর্ম অনুসারে ভগবান চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, প্রথমে প্রত্যেক আর্যসন্তান প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক কার্যই করিত।

কালক্রমে আর্য-সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সমাজ-ব্যবস্থা স্বভাবতই ব্যাপক ও জটিল হইয়া উঠিল। তখন গুণ, কর্ম ও বৃত্তি অনুসারে যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ও পৌরোহিত্য করিতেন—তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধ-ব্যবসায় ও রাজ্য শাসন করিতেন তাঁহারা হইলেন রাজন্য বা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা কৃষিকার্য, পশুপালন, শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারা হইলেন বৈশ্য। অনার্য বা আর্যেতর জাতির মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য সমাজভুক্ত হইল, তাহারা হইল শূদ্র (বা দাস)। যে সমস্ত অনার্য বশ্যতা স্বীকার না করিয়া পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আর্যগণের নিকট রাক্ষস, বানর, দস্যু, নাগ, দানব, দৈত্য, অসুর ইত্যাদি নামে পরিচিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে বৈদিকযুগের সমাজে জাতিভেদ প্রথা একদিনে বা একশত বৎসরে পরিণতি লাভ করে নাই এবং কোন এক জন বা এক সম্প্রদায়ের নির্দেশে সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবেশলাভ করে নাই। ইহা সামাজিক প্রয়োজনেই বিচিত্র ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্বর্ণ

প্রথমে এই প্রকার বর্ণভেদ ছিল না। এই সময়ে অসবর্ণ বিবাহ হইত। এই বর্ণভেদ মনুসংহিতা রচনার পূর্বেই জাতিভেদে পরিণত হয় এবং জন্মায়ত্ত হইয়া যায়। **বর্ণভেদের** অন্তরালে সমাজে নানাপ্রকার সংকর বা মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়। পরবর্তিকালে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু গুপ্তযুগে জাতিভেদপ্রথা পুনরায় নূতন আকার ধারণ করে।

চতুরাশ্রম : আর্যগণের ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি ছিল চতুরাশ্রম। চতুরাশ্রম বলিতে জীবনের চারিটি অবস্থা বা স্তর বুঝায়। প্রারম্ভে আশ্রমের নাম ছিল **ব্রহ্মচর্য**। এই আশ্রমে আর্য বালক গুরুগৃহে বাস করিয়া সংযমী ও সদাচারী হইয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। পাঠান্তে আর্য-যুবক বিবাহ করিয়া **গার্হস্থ্যাশ্রমে** সংসার ধর্ম পালন করিত। **বানপ্রস্থ** আশ্রমে আর্য-প্রৌঢ় সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স-স্ত্রীক বা অ-স্ত্রীক অরণ্যে তপস্বীর ন্যায় ধর্মচিন্তা করিত। **যতি** বা **সন্ন্যাস** আশ্রমে আর্যবৃদ্ধ সাংসারিক মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, লোকালয়ের বাহিরে পরমার্থ চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিতেন। কেহ বা পরিব্রাজকরূপে তীর্থ বা দেশভ্রমণ করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে চতুরাশ্রমের বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হইত। শূদ্র এবং নারীর জন্য চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না। নারীর পক্ষে চতুরাশ্রমের নিয়ম পালন আবশ্যক ছিল না।

বৈদিক যুগের সমাজ-জীবন : প্রাচীন আর্যগণ ছিল যাযাবর। তাহাদের বৃত্তি ছিল পশুপালন। ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারা পশুপালনের সঙ্গে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করিল এবং স্থিতিশীল হইল। কালক্রমে তাহারা নানা শিল্পকর্মকেও উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিল।

আর্য সমাজ ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। পিতা ছিলেন পরিবারের সর্বময় কর্তা। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ সম্বলিত পরিবার গঠিত হইত। সেই যুগে আর্যগণ কাষ্ঠ বা বৃক্ষপত্র নির্মিত গৃহে বাস করিত। এই গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ বংশ বা শালবৃক্ষের স্তম্ভ এবং দারুময়; ঘন পত্রে ইহার আচ্ছাদন; কখন কখন প্রাচীরগুলিতে মৃত্তিকা লেপন করা হইত এবং সুধা বা চুণের প্রলেপ দেওয়া হইত। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য ছিল। অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হইত, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করিত, যজ্ঞান্তে বিবাহ সম্পন্ন হইত। পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, মানুষ পুত্রসন্তান কামনা করিত। সন্তান পিণ্ডদান করিয়া 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিত, সেইজন্য সন্তান 'পুত্র' নামে অভিহিত হইল। সতীদাহ এবং বিধবা বিবাহ ছিল। সমাজে নারীর স্থান খুব প্রশস্ত ছিল। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, ঘোষা—নারী হইলেও বেদমন্ত্রের ঋষি ছিলেন। গার্গী ও মৈত্রেয়ী দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অন্যদিকে ইন্দ্রসেনা, অপালা প্রভৃতি নারী স্বামীর সহিত যুদ্ধে যোগদান করেন। ঘোষা প্রভৃতি চিরকুমারী নারীর উল্লেখ বেদে আছে। মনুসংহিতায় নারীর স্বাতন্ত্র্য সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু মনু নারীর শিক্ষা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

বৈদিক গৃহ

বৈদিক নারী

আর্যগণ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিল না। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র কার্পাস, রেশম অথবা পশম দ্বারা নির্মিত হইত। পরিচ্ছদ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—নীবী (অন্তর্বাস), বাস (ধুতি, ধৌতবস্ত্র), অধিবাস, দ্রাপি (উত্তরীয়)। পুরুষ নারী উভয়েই শিরে উষ্ণীষ পরিধান করিত। কোমল মৃগচর্ম দ্বারা শয্যার আস্তরণ প্রস্তুত হইত। কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়, বক্ষে রুক্ম (লৌহবক্ষত্রাণ), চরণে নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণ ও পুষ্পের অলংকার প্রচলিত ছিল। কেশবিন্যাস নারীর সৌন্দর্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেক পুরুষ গুম্ফ, শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করিত।

বেশ বিন্যাস

আর্য গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিত। তাহাদের জন্য আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার খাদ্য ব্যবস্থা ছিল। মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস বা যজ্ঞার্থ উৎসর্গীকৃত পশুমাংস গ্রহণীয় ছিল। ফল, মূল, ঘৃত, যব, দুগ্ধ, পিষ্টক, মধু আর্যদের প্রিয়খাদ্য ছিল। সুরা প্রস্তুতের জন্য শৌণ্ডিক নামক একশ্রেণীর লোক ছিল।

খাদ্য

বৈদিক আর্যগণের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নৃত্যগীত, ঢোলক, বংশী ও বীণাবাদন, শিকার, রথচালনা এবং ধনুর্বাণ প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যসমাজে অক্ষ বা দ্যূতক্রীড়ার প্রচলনও ছিল।

আমোদ-প্রমোদ

আর্যগণ শব সমাধিস্থ করিত এবং কখন কখন শব দাহও করিত। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, আর্যগণ শব দাহান্তে অস্থিগুলি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিত এবং সমাধির উপর স্তূপ নির্মাণ করিত। পরবর্তিকালে স্তূপ চিতার মঠে পরিণত হয়।

মৃতের সংকার

বৈদিক যুগে অর্থ নৈতিক অবস্থা: পশুপালন ও কৃষিই ছিল আর্যদের প্রধান উপজীবিকা। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গো, অশ্ব, মেষ, কুকুর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে গো-ধন ছিল আর্যদের প্রধান সম্পদ। বিনিময়ের জন্য গো-ধন ব্যবহৃত হইত। যজ্ঞের দক্ষিণা ছিল গাভী ও বৃষ। প্রতি আর্য গ্রামেই গ্রামবাসীদের যৌথ অধিকারভুক্ত গো-চারণ ভূমি ছিল। কৃষির জন্য কূপ ও সেচ-ব্যবস্থা ছিল। বিনিময়ের জন্য প্রথম যুগে নিষ্ক নামক স্বর্ণখণ্ড ব্যবহৃত হইত। পরে নিষ্কের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হয় এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে উহার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধে বিজিত শত্রুর সম্পদ বিজেতার প্রাপ্য ধন ছিল। নদীপথে বাণিজ্যের উল্লেখও বেদে আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ব্যতীত সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতির উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আর্যগণ সমুদ্রপথে দূর দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। যাতায়াতের জন্য গো, অশ্ব, হস্তী অথবা গর্দভ বাহিত যান এবং নৌকার ব্যবহার ছিল। বলি (ভূমিকর), শুল্ক (বাণিজ্যকর) রাজার প্রাপ্য ছিল। বেদে কুশীদজীবী বৈশ্যের উল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা: আর্যসমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হইত গ্রাম। পরিবারের কর্তা ছিলেন **গৃহপতি, কুলপতি** বা **দম্পতি**; গ্রামের প্রধান ছিলেন **সূত** বা **গ্রামণী**। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি **বিশ** বা **জন** গঠিত হইত। বেদে বিশ বলিতে জনসমষ্টিও বুঝাইত। এই বিশের কর্তা ছিলেন **বিশপতি** বা **রাজন্**। ঋগ্‌বেদে সিন্ধু দেশের রাজা এবং শ্রাবস্তীর রাজা চিত্ররথের উল্লেখ আছে। রাজা যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে রাজার ক্ষমতা অত্যধিক ছিল না। কিন্তু পরবর্তিকালে রাজার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বৈদিক যুগের শেষভাগে কোন কোন রাজা সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান রাজার ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণই রাজপদের অধিকারী ছিলেন এবং রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল। পুরোহিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সূত, দূত, সচিব, সেনানী প্রভৃতির প্রভাব ছিল। বেদে রাজ-প্রাসাদের বর্ণনা আছে। রাজা উজ্জ্বল বসনে ভূষিত থাকিতেন। অথর্ববেদে **সংগ্রহীত** নামক কর্মচারীর উল্লেখ আছে। গণপতি, জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি

রাজন্

শব্দের উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ছিল। রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল। পুরোহিতের উপর রাজপুত্র বা যুবরাজের শিক্ষার ভার ছিল। শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় বিদ্যাই রাজপুত্রদের শিক্ষণীয় ছিল। ন্যায়শাস্ত্র, কলাচর্চা, সংগীত, মৃগয়া, শাস্ত্র-শিক্ষা, রথচালনা এবং বক্তৃতাদান রাজপুত্রের শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। 'স্পর্শ' নামক গুপ্তচর ছিল। রাজা ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিতেন।

রাজপুত্রের শিক্ষা

বৈদিক সাহিত্যে পরিষদ, সভা ও সমিতির উল্লেখ আছে। পরিষদ ছিল বিশেষজ্ঞদের সংস্থা। সভা ছিল গুণবান সুকর্মী প্রজার সম্মেলন ও সমিতি ছিল জনসাধারণের সমাবেশ। গুরুতর পরিস্থিতির সময় সমিতি আহূত হইত। সভা ছিল ক্ষুদ্রায়তন; সমিতি ছিল বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান; সভা-সমিতির ক্ষমতা রাজার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আহ্বান করা ও মত গ্রহণ করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল।

সভা-সমিতি

রামায়ণ ও মহাভারত : বেদের পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্বভারতে সর্বকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই দুইখানি মহাকাব্যে বৈদিকোত্তর যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণ বাল্মীকি-রচিত, সপ্তকাণ্ড এবং চব্বিশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত। মহাভারত ব্যাস রচিত, অষ্টাদশ পর্ব এবং এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে মহাকাব্য দুইটির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী; ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। রামায়ণের লেখক একমাত্র বাল্মীকি; মহাভারতের লেখক একমাত্র ব্যাসদেব নহেন। প্রত্যেক পরবর্তী লেখকই আদি গুরুর নাম প্রচারের জন্য পুণ্য কর্মরূপে গুরুর নামে রচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

রামায়ণে তিনটি সভ্যতার বিবরণ আছে—আর্যাবর্তের বৈদিক, কিষ্কিন্ধ্যার বানর ও লঙ্কার রাক্ষস সভ্যতা। এই যুগের রাষ্ট্র ছিল রাজতান্ত্রিক, রাজার আদর্শ ছিল প্রজানুরঞ্জন। রামায়ণের যুগে জন্মায়ত্ত জাতিভেদ ছিল; কিন্তু ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, মৌদ্‌গল্য, গর্গ, অঙ্গিরস, জবাল তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়নিধন কাহিনী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইঙ্গিত বহন করে। এই যুগে সমাজে একাধিক বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা বিদ্যমান ছিল। মহাকাব্যের যুগে অশ্বমেধ, রাজসূয় এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞ প্রচলিত ছিল। অবশ্য দৈহিক দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হইত। রাক্ষসগণও যজ্ঞে পুরোহিত নিয়োগ করিত এবং যজ্ঞার্থে পশু বলি দিত।

রামায়ণ

রামায়ণে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগের বর্ণনা রহিয়াছে ; বোধ হয় রামায়ণ পূর্বজ। মহাভারতে আর্য-অনার্য অথবা আর্য-আর্যেতর জাতির সংঘাত নাই। মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ মুখ্যতঃ আর্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহাভারতের যুগেও ধর্মে যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল।

মহাভারত

সমাজে বর্ণাশ্রম, বহু-বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের যুগে আর্যসভ্যতা পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে বঙ্গদেশ ও মণিপুর, উত্তরে হিমালয় ও নেপাল এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও তাপ্তী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে লঙ্কার উল্লেখ নাই, তবে পারদ, যবন, বাহ্লীক প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতির উল্লেখ রহিয়াছে। এই যুগে অনেকটা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল। মহাভারতের মধ্যে গীতার মাধ্যমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আর্য সভ্যতার উপর অনার্য প্রভাবঃ আর্যদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হইয়া অনার্যদের মধ্যে কেহ কেহ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং শূদ্র বা দাস পরিচয়ে আর্য-সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কালক্রমে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাস পাইলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত হইল। কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমা দৈত্যের কন্যা শচীকে বিবাহ করেন, বিশ্বশ্রবা মুনি রাক্ষসকন্যা কৈকসীকে বিবাহ করেন, তাঁহার

রক্ত-সংমিশ্রণ

অন্য স্ত্রী ছিলেন আর্য ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনী। চন্দ্রবংশীয় রাজা পাণ্ডুর পুত্র ভীমসেন হিড়িম্বা রাক্ষসীকে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগকন্যা উলুপীকে, যাদববংশীয় শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। এইভাবে আর্য-অনার্য রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বহু অনার্য ভাবধারা আর্য সমাজে প্রবেশ লাভ করে। আর্যগণ অনার্য ইতরার পুত্র মহীদাসকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতারূপে বেদস্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে আসন দান করিয়াছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস বাদরায়ণ ছিলেন কৃষ্ণকায় এবং মৎস্যগন্ধা অর্থাৎ অনার্য কন্যার পুত্র। কুরু-পাণ্ডবের পিতৃপুরুষ ছিলেন আর্যরাজ শান্তনু, মাতৃবংশ ছিল ধীবর জাতীয়। হস্তিনাপুরের চন্দ্র-বংশের পূজ্যতম পুরুষ ছিলেন দাসী-পুত্র বিদুর। আর্য সন্তান ব্যাস, পরাশর, শুকদেব, কনাদ, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ট, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি আর্যপূজ্য ছিলেন। সুতরাং দেখা যায়, আর্য-অনার্যের পারস্পরিক প্রভাব সহজভাবেই আসিয়াছিল।

আর্যসভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, অবশ্য নগর ও দুর্গনির্মাণ বিদ্যা আর্যদের

স্থাপত্য নির্মাণে আর্য-অনার্যের পারস্পরিক প্রভাব

অগোচর ছিল না। বেদে কয়েকটি নগরের উল্লেখ আছে। অনার্যগণ প্রধানতঃ নগর, পুর বা দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাস করিত। ইন্দ্র অনার্যদের পুর বিনষ্ট করেন বলিয়া 'পুরন্দর' আখ্যা লাভ করেন। কাহারও মতে বাস্তুবিদ্যার জন্য আর্যগণ অনার্যদের নিকট ঋণী ; ময়দানব অনার্যদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রাসাদ-নির্মাতা। তিনি

দেবতাদের জন্য সুবিশাল পুরী ও অনিন্দ্যসুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। এই উক্তির মধ্যে অত্যুক্তি রহিয়াছে, কারণ ঋগ্‌বেদের যুগেই ঋষি অগস্ত্য বাস্তুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। টীকাকার সায়নের মতে বৈদিকযুগে আর্যদের ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। বিশ্বকর্মা ছিলেন আর্যদের আদি বাস্তুকার এবং দেবশিল্পী। বিশ্বকর্মার পূজা আর্যগৃহে প্রচলিত ছিল।

সামাজিক আচারে প্রভাব

ইহা সত্য যে, আর্যগণ বিবাহে স্ত্রী-আচার, দৈনন্দিন জীবনে কার্পাস তৈল, শাঁখা ও সিঁদুর ব্যবহার এবং মৎস্যাহার অনার্যদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং নানাবিধ চারু ও অনেকগুলি কারু শিল্পে আর্যগণ অনার্যদিগের নিকট হইতে নূতন রীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক প্রভাব

অনেকে বলেন যে, বাণিজ্য ও যাতায়াতের জন্য নৌকা নির্মাণ এবং বিনিময়ের জন্য মুদ্রা ব্যবহার অনার্যদের দান। ইহাও অত্যুক্তি, কারণ ঋগ্‌বেদে সমুদ্রপোতের উল্লেখ আছে এবং বিনিময়ের জন্য আর্যগণ গোধন এবং নিষ্ক নামক স্বর্ণখণ্ড বা মুদ্রা ব্যবহার করিত। ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

ভাষার প্রভাব

উত্তর ভারতীয় অনার্যগণ আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, নিঃসন্দেহ। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য স্থানীয় পৈশাচ, ম্লেচ্ছ ও পক্ষী ভাষা আর্যভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল। দক্ষিণের অনার্য দ্রাবিড় জাতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত শব্দপুষ্ট। পরবর্তীকালে আর্যগণ সংস্কৃতের মধ্যে কতিপয় দ্রাবিড় শব্দ নিবদ্ধ করিয়াছে।

ধর্মের প্রভাব

আর্যদের অনুকরণে অনার্যগণ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত এবং আর্যঋষির গোত্রজাত বলিয়া আত্মপরিচয় দিত। আর্যগণও কালক্রমে অনার্যদিগের ধর্মের আচার-ব্যবহার, দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি ন্যূনাধিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য আর্যগণ নূতন ভাবে কল্পনা করিয়া অনার্য দেবদেবীকে আর্যায়িত করিয়া লইয়াছিল—শ্মশানবাসী শিব এবং নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামাকে আপাত দৃষ্টিতে অনার্য দেবতা বলিয়াই মনে হয়। কালক্রমে আর্যগণ লয়ের দেবতা শিবকে সর্ব অমঙ্গল-হর নীলকণ্ঠরূপে কল্পনা করিল। বৈদিক দেবতা শিব—রুদ্রকে আর্যগণ সর্বমঙ্গলময় শিব বা মহাদেবরূপে রূপান্তরিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা কালী করালীকে উমা, পার্বতী, গৌরী বা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা রূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। শিবলিঙ্গ অর্চনা অনার্য-প্রভাব বলিয়া মনে করা অসমীচীন নহে। মনে হয়, অনার্য সংস্পর্শে বৈদিক দেবতা বরুণ, বায়ু, যম ও যক্ষ-কুবের দিক্‌পাল রূপে কল্পিত হইলেন।

প্রাচীন আর্যগণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত, কিন্তু পরে তাহারা মৃতদেহ দাহ

করিয়া অস্থি তীর্থে বা নদীতে নিক্ষেপ করিত। ইহা বোধ হয় অনার্য প্রভাব। অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধক্রিয়া, গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান প্রভৃতি পারলৌকিক কার্য, অনেকের মতে, অনার্য প্রথার অনুকরণ। পিণ্ডদান, তর্পণের মধ্যে যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতিকে আর্যদেবতার মতন অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। আর্যদের পারলৌকিক কার্যের পীঠস্থান গয়াক্ষেত্র 'গয়' নামক অসুরের রাজ্য। এই সমস্তই অনার্য প্রভাব। তবে ভারতীয় আর্য ও অনার্যগণ জীবনের বহু ক্ষেত্রে এত বেশী আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, পরস্পরের প্রভাবের সীমারেখা চিহ্নিত করা সম্ভব নহে।

পারলৌকিক কার্যে প্রভাব

অনুশীলনী

১। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আর্য উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তৃতির বিবরণ দাও।
(Give the story of the Aryan colonisation of north and south India.)

২। বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(Give a short resume of the Aryan Civilisation of the Vedic Age.)

৩। বৈদিক সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ অথবা রাষ্ট্র-জীবনের পরিচয় দাও।
(Give a short account of the Vedic literature, religion and society on of the state.)

৪। আর্য সভ্যতার উপর অনার্য প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(What was the nature and extent of the Non-Aryan influence on the Aryan Culture.)

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) সূত্র সাহিত্য, (খ) রামায়ণ ও মহাভারত।
(Write short notes on : (a) Sutra literature, (b) Ramayana and Mahabharata.

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদিকোত্তর যুগের সমাজ ও ধর্ম বিপ্লব : জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়

অধ্যায় পরিচয় : বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যধর্ম ও সমাজ সুসংবদ্ধ ছিল। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় জীবনধারা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত চলিয়াছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রবর্তকদের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় সমাজ ও ধর্মে নানা স্পন্দন ও বহু নূতন প্রবাহ অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমশঃ ভারতীয় সমাজব্যবস্থা হইয়া উঠিল জটিল এবং ধর্ম হইয়া উঠিল আচার-সর্বস্ব। ফলে, আর্যসমাজে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই আচার-সর্বস্বতা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রথমে অস্ফুট প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। কালক্রমে ঐ সব প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ বিপ্লবে পরিণত হয়। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ক্ষত্রিয় রাজকুমার জৈনধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতম প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

বৈদিকোত্তর যুগের ধর্ম ও সমাজ : পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম ও সমাজ-জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রত্যেক আর্য নারী ও পুরুষ ধর্মাচরণের অধিকারী ছিল। তখন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সাধারণ ভোজ্য, পানীয় দেবতাকে উৎসর্গ করা হইত ও যজ্ঞকালে বেদমন্ত্র গীত হইত। কালক্রমে বৈদিক ধর্মে আচার, অনুষ্ঠান, পশুবলি ও নানা ক্রিয়াকাণ্ডের আধিক্য দেখা দিল। যজ্ঞবিধি জটিল হইয়া উঠিল এবং যজ্ঞকার্য ও পূজার্চনা সম্পাদনের জন্য পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। এই সময়ে আর্যগণের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। বৈদিক আর্যসমাজে নারী সম্মানিতা ছিলেন। সমাজে বৃত্তি অনুসারে বর্ণবিভাগ থাকিলেও কার্য বা বৃত্তির জন্য সমাজে কেহ হেয় বলিয়া গণ্য হইত না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পানাহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তি পরিবর্তন সম্ভব ছিল। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণবিভাগ গতানুগতিক হইয়া উঠে এবং উহা কঠোর জাতিভেদে পরিণত হয়। এই সময় জন্মায়ত্ত জাতিভেদেরও সূত্রপাত হয় এবং শূদ্রের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়; স্ত্রীজাতির সম্মান ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। আদি বৈদিক যুগে নারী বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগে নারী

আদিযুগের সরলতা

পরবর্তী যুগের জটিলতা ও আচার-কেন্দ্রিকতা

বেদপাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ বেদে থাকিলেও তাঁহারা এই সময়ে নূতন রূপে পরিকল্পিত হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নূতন পূজাবিধি প্রচলিত হইল। ইহার ফলে ভারতে বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মশাখা প্রবর্তিত হইল।

ইহা লক্ষণীয় যে, বৈদিকোত্তর যুগের ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণ এবং রাষ্ট্রজীবনে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মনে করিত—তাহারা বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম এবং সমাজ-ব্যবস্থায় নানা বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিল। ক্রমশঃ যজ্ঞ ও পূজাবিধি আচারকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। আচারের আধিক্য অতি-আচার বা অত্যাচারে পরিণত হইল। তাহা ছাড়া উপনিষদের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তনের ফলে লোকের মনে বৈদিক জটিল যাগযজ্ঞের উপর আস্থা হ্রাস পাইতেছিল। নিষ্ঠুর পশুবলির পরিবর্তে অহিংসা মতবাদ ক্রমশঃ লোকের মনকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। কারণ, তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গকেও ব্রাহ্মণের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। তদুপরি অবৈদিক মতবাদ প্রবর্তক বহু ঋষি-মুনির আবির্ভাব হইল—তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্তান চার্বাক, ক্ষত্রিয় অজিত কেশকম্বল এবং শূদ্র মস্কলী বিখ্যাত। ঋষি চার্বাক ছিলেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে ঐহিক সুখই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। অজিত কেশকম্বল প্রচার করিতেন—মৃত্যুই মানব জীবনের শেষ; তিনি পরবর্তিকালের শূন্যবাদ প্রবর্তক। মস্কলী ছিলেন জন্মে, বৃত্তিতে দাস। তিনি বৈদিক ধর্মের মূল—কর্মবাদ অস্বীকার করেন। মস্কলী-প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 'আজীবিক' নামে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আজীবিক সম্প্রদায় ছিল কৃচ্ছ্র সাধক তান্ত্রিক। বৌদ্ধধর্মের সমকালে ভারতে তেষট্টি প্রকার অবৈদিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদই প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব ভারতের দুই জন ক্ষত্রিয় রাজকুমার—বৈশালীর লিচ্ছবী বংশীয় **বর্ধমান মহাবীর** এবং কপিলবাস্তুর শাক্যবংশীয় গৌতম গোত্রীয় **সিদ্ধার্থ**—এই দুই ধর্মমতের প্রবর্তক। উভয়েই জন্মায়ত্ত জাতিভেদ মানিতেন না এবং বেদোক্ত যাগযজ্ঞে মুক্তিলাভ হয়, ইহাও অস্বীকার করিতেন। জাতি, বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে তাঁহারা সকলকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংসা ব্রত পালনই ছিল এই দুই ধর্মের মর্মবাণী।

বিরূপ মনোভাব

বেদ-বিরোধী মত

জৈনধর্মের অভ্যুত্থান ঃ জৈনদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে চব্বিশ জন তীর্থংকর বা মুক্তি-পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন **ঋষভ** এবং শেষ দুইজনের নাম হইল **পার্শ্বনাথ** ও **মহাবীর**। ঐতিহাসিকগণের মতে পার্শ্বনাথই জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক।

কথিত আছে, পার্শ্বনাথ কাশীর কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন এবং বারাণসীর সন্নিকটে সিদ্ধিলাভ করেন। **অহিংসা**, **সানৃত** (সত্যভাষণ), **অস্তেয়** (অচৌর্য) ও **অপরিগ্রহ** (সন্ন্যাস)—এই চারিটি ছিল পার্শ্বনাথের ধর্মের মূল উপদেশ। ইহা জৈন সাহিত্যে **চাতুর্যাম** (যম = সংযম) নামে আখ্যাত হইয়াছে। **পার্শ্বনাথ** পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ পর্বতে সিদ্ধিলাভ করেন।

পূর্ববর্তী তীর্থংকরগণ

মহাবীর জৈনধর্মের চতুর্বিংশ বা সর্বশেষ তীর্থংকর। পার্শ্বনাথের দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পরে মহাবীর আবির্ভূত হন। তিনি আধুনিক বিহারের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বৈশালীর উপকণ্ঠে (বর্তমান বসার গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমে মহাবীরের নাম ছিল বর্ধমান। তাঁহার পিতা ছিলেন বৈশালীর একজন সামন্ত-রাজা, মাতা ত্রিশলা ছিলেন বিম্বিসারের নিকট আত্মীয়া। তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। জৈন কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, রাজকুমার বর্ধমান তরুণ বয়সে যশোদা নাম্নী এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বর্ধমান সংসারের বন্ধন ছিন্ন করেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সাধনার পর বর্ধমান অজ্ঞানকে জয় করেন এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার নাম হইল **জিন** অর্থাৎ **জয়ী** এবং উপাধি হইল **মহাবীর**। তাহার পর মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কোশল প্রভৃতি অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল তিনি তাঁহার দিব্যজ্ঞান ও ধর্মমত প্রচার করেন। পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে মহাবীরের তিরোভাব হয়। তাঁহার তিরোভাবের নিশ্চিত সময় জানা যায় না। মহাবীরের অনুগামিগণের নাম **নিগ্রন্থ** অর্থাৎ **বন্ধনহীন**, কারণ তাহারা অজ্ঞানের গ্রন্থি বা বন্ধন বিমুক্ত হইয়া গ্রন্থিহীন বা বন্ধনহীন হইত। মহাবীরের জিন উপাধি অনুসারে নিগ্রন্থগণ **জৈন** নামে পরিচিত।

মহাবীর

জৈনধর্ম প্রথমে পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রসার হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে **দিগম্বর** ও **শ্বেতাম্বর** নামে জৈনদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। দিগম্বরগণ সর্বত্যাগের প্রতীক নগ্নদেহে থাকেন; শ্বেতাম্বরগণ শান্তির প্রতীক শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন।

জৈনধর্মের উপদেশঃ মহাবীর তীর্থংকর পার্শ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মের নানাবিধ সংস্কার করেন। পার্শ্বনাথের ধর্ম ছিল ব্রত ও নিয়ম-মূলক; তিনি ইন্দ্রিয় জয় এবং সেই সঙ্গে চাতুর্যামের চারিটি নিয়ম পালনই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া যান। জৈনগণ বেদকে অভ্রান্ত, নিত্য এবং অপৌরুষেয় মনে করেন না। অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন না। জৈনদের বিশ্বাস, প্রত্যেক মানবাত্মাই পরিপূর্ণ শক্তির আধার; যিনি জিতেন্দ্রিয় ও অজ্ঞানজয়ী, তিনিই জিন, তিনিই সিদ্ধ—তাঁহার মধ্যেই মানবাত্মার অনন্ত শক্তির পরম বিকাশ হয়, সেই শক্তিমানই দেবতারূপে পূজনীয়। জৈনগণ ঈশ্বরসৃষ্ট জাতিভেদ প্রথার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। হিন্দুদের মত তাঁহারা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। হিন্দুগণের ন্যায় তাঁহারা দেবদেবীর অর্চনা, তীর্থযাত্রা এবং ধর্মকার্যে পুরোহিত নিয়োগ করেন। জৈনদের মতে বৃক্ষ-লতা-পত্র-পুষ্প-গিরি-নদী সকলই প্রাণময়। জৈনদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র হইল **অহিংসা, জীবে দয়া** এবং **ইন্দ্রিয় জয়।**

আবু পর্বতে জৈন মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের অপূর্ব কারুকার্য

অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতি জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, রাষ্ট্রনীতি, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে জৈনদিগের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য, মন্দির ও গুহাশিল্পে জৈনদিগের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রবণবেলগোলার প্রস্তর-নির্মিত অর্ধশত হস্ত উচ্চ গোমত মূর্তি জৈন ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। কাগজের উপর লিখিত জৈনগ্রন্থ এবং অঙ্কিত চিত্র জৈনদের নিপুণ সৌন্দর্যজ্ঞানের অপরূপ স্মারক। বর্ণ-বৈচিত্র্যে এই লিপিগুলি অতুলনীয়। রাজপুতনায় আবু পর্বতের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য-মণ্ডিত জৈন মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গৌরবময় নিদর্শন। ইহা মুসলমান যুগের প্রারম্ভে তেজঃপাল কর্তৃক নির্মিত হয়।

জৈন ধর্মগ্রন্থ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

গৌতম বুদ্ধ : প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের কপিলবাস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। কপিলবাস্তুর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন শুদ্ধোদন। তাঁহার উপাধি ছিল রাষ্ট্রতিলক। তিনি দেবদহের শাক্যবংশীয় রাজকন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন। কপিলবাস্তুর নিকট লুম্বিনি উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রই বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক **সিদ্ধার্থ**। বুদ্ধের জন্মের নিশ্চিত দিনক্ষণ অনুমানসাপেক্ষ। বোধ হয় ৬২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে (মতান্তরে ৫৬৬ খ্রীঃ পূঃ) সিদ্ধার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

গৌতমের শৈশব ও জীবন

গৌতম বুদ্ধ

বিপুল ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে সিদ্ধার্থের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কৈশোর ও যৌবনে গৌতম ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ ও নানা শিল্পকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মল্লযুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের পরেই তিনি রূপ-লাবণ্যময়ী যশোধরার পাণিগ্রহণ করেন। তখন গৌতমের বয়স মাত্র ষোড়শ বৎসর। যশোধরা ছিলেন শুদ্ধোদনের জ্ঞাতিভ্রাতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা। সিদ্ধার্থের পত্নী যশোধরা গোপা, বিম্বা, কচ্ছানা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বিলাস সম্ভোগের মধ্যে গৌতমের চিন্তাশীল অন্তর শান্তিলাভ করিল না। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একজন জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ, জনৈক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং একটি শব দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হয়। একজন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দর্শনে তাঁহার চিত্তের আলোড়ন শান্ত হইল। এমন সময় ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটির নাম রাহুল। পুত্রবাৎসল্য তাঁহাকে নূতন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে—এই আশঙ্কায় একদিন গভীর রাত্রে, ব্যাধি ও মৃত্যুজনিত দুঃখ জয়ের কামনায় তিনি কন্থক নামক প্রিয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্বক সারথি ছন্দকের সহায়তায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করেন। এই ঘটনা বৌদ্ধ ইতিহাসে **মহাভিনিষ্ক্রমণ** নামে খ্যাত। গৃহত্যাগ করার পর তিনি

বৈশালীর বিখ্যাত জ্ঞানী অলড়কসাল এবং রাজগৃহের পণ্ডিত রুদ্রকের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা শাস্ত্র অধ্যয়নেও তাঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধনা ও তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অভীষ্ট শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কঠিন তপশ্চর্যায় তাঁহার শরীর শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া গেল। তিনি তখন গয়ার নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা (বর্তমান ফল্গু নীলাঞ্জন) নদীতে স্নান করিয়া একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই সময়ে শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পরমান্ন নিবেদন করিয়া তৃপ্ত করেন। কঠোর সাধনার ফলে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান বা বোধি লাভ করিলেন। এইবার ত্রিতাপ দুঃখ হইতে মুক্তি বা নির্বাণের পথ তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল। তিনি **বুদ্ধ** নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম **সিদ্ধার্থ**। গৌতম গোত্রীয় বলিয়া তাঁহার এক নাম ছিল **গৌতম** এবং শাক্যবংশীয় বলিয়া অপর নাম ছিল **শাক্যমুনি**। এই সময় হইতে 'তথা বা পরম অবস্থাতে গত' হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নূতন নাম হইল **তথাগত**। তপস্যার দ্বারা বোধি বা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি হইলেন **বুদ্ধ** অর্থাৎ জ্ঞানী।

বোধিলাভ

বুদ্ধদেব বারাণসীর অদূরে ঋষিপত্তন্ (সারনাথ) গ্রামে মৃগদাব বা মৃগবনে পঞ্চ প্রিয় শিষ্যকে প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এই ঘটনা বৌদ্ধ ইতিহাসে **ধর্মচক্র** প্রবর্তন নামে খ্যাত। অতঃপর নানাস্থানে মুক্তির অমৃত-বাণী প্রচার করিবার সময় মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রভৃতি নৃপতিবর্গের সহিত বুদ্ধদেবের যোগাযোগ ঘটে। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে বেণুবন নামক বৃহৎ একটি বংশবন দান করেন। সেইখানে বৌদ্ধগ্রন্থে বিখ্যাত সারিপুত্ত এবং মৃদ্গলায়ন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা নন্দ এবং জ্ঞাতি আনন্দ ও দেবদত্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল ধর্ম প্রচার করিবার পর অশীতি বৎসর বয়সে গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত কুশীনগর বা কাশিয়ায় ৫৪৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে (মতান্তরে ৪৮৫ খ্রীঃ পূঃ) তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

বুদ্ধের ধর্মমত ঃ বুদ্ধের বাণী ছিল সরল ও সহজ। তাঁহার ধর্মমত ছিল উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু উহার মধ্যে উপনিষদের জটিলতা ছিল না। ধর্ম অর্থে—**মৈত্রী** (বিশ্ব-কল্যাণ কামনা), **মুদিতা** (সর্বজীবে সম অনুভূতি), **করুণা** (জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অনুধ্যান), **উপেক্ষা** (কামনা-পরিশূন্য অবস্থা) এবং **অশুভা** (দেহপ্রীতি-রহিত ভাব) বুঝাইত। অবশ্য প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত ইহার অনেক বৈসাদৃশ্য ছিল। বুদ্ধদেব বেদের

বৌদ্ধধর্মের মূল কথা

অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করেন নাই এবং বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই, অস্বীকারও করেন নাই। তাঁহার মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ও পশুবলি প্রভৃতি কর্ম নিতান্তই নিষ্ফল। তিনি জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকার করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, **নির্বাণ** লাভই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। নির্বাণ অর্থে কর্মফল ও পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ। নির্বাণ লাভের জন্য গোতম বুদ্ধ কঠোর শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন ও অপরিমিত ভোগবিলাস—এই দুই চরম পন্থার মধ্যবর্তী পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। নির্বাণ লাভের উপায়রূপে তিনি **অষ্টপথ** বা অষ্টমার্গের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই আটটি পথ হইল—সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ সংকল্প, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন অহিংসা। অহিংসাব্রত পালনই বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। অবশ্য উপনিষদেও অহিংসা সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি রহিয়াছে।

বৌদ্ধসংঘ : বৌদ্ধধর্ম ত্রিরত্নখচিত— **বুদ্ধ, ধম্ম** ও **সংঘ**। মুমুক্ষু ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে এই ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষালাভ করেন :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

—এই তিনটি বৌদ্ধদের দীক্ষামন্ত্র। বৌদ্ধগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত—গৃহস্থ ও ভিক্ষু। গৃহস্থগণ সংসার আশ্রমে বাস করিয়া বুদ্ধের উপদেশ পালন করেন। ভিক্ষুগণ গার্হস্থ্য জীবনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ পথে অগ্রসর হন। চীর বসন, মুণ্ডিত কেশ, পীত বেশ, ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষু জীবনের চতুষ্প্রতীক। ভিক্ষুদের ধর্মীয় সম্প্রদায় সংঘ নামে পরিচিত।

প্রথম যুগে ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষু শিষ্যগণ ভ্রাম্যমান জীবনযাপন করিতেন, কখনও বনে, কখনও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। শ্মশান কিংবা আবর্জনা-কুণ্ড হইতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ডই ছিল তাঁহাদের পরিধেয়। ভিক্ষাই ছিল তাঁহাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। পঞ্চশীল, মন্ত্রোচ্চারণ, অনুশাসন এবং বিবিধ নিয়ম প্রবর্তিত হইল। আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ব্রত, পূজা, ভাবনা, ধ্যান ও সমাধি সম্বন্ধে ছিল নানা অনুশাসন বা নির্দেশ; তীর্থদর্শন ছিল বৌদ্ধ ধর্মজীবনের অন্যতম অঙ্গ। বুদ্ধ নারীজাতিকে প্রথমে সংঘে যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; পরে শিষ্য আনন্দের অনুরোধে সেই অনুমতি প্রদান করেন। ইহার ফলে ভারতীয় সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হইল। অবশ্য ভিক্ষুণীগণ শিক্ষাদান, আর্তসেবা ও ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম ও সংগীতিঃ বুদ্ধদেব জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় মৌখিক উপদেশ দান করিতেন। তিনি তাঁহার ধর্মমতসমূহ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের কিছুকাল পরেই তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ রাজগৃহে **সপ্তপর্ণী গুহায়** সম্মিলিত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলী পালি ভাষায় গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। ইতিহাসে ইহাই প্রথম **বৌদ্ধ সংগীতি** অর্থাৎ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিবেশন নামে খ্যাত। এই ধর্মগ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে সংকলিত হইয়া ইহার নাম হইল **ত্রিপিটক**। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) **সূত্রপিটক বা সুত্তপিটক**—ইহাতে আছে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী। (২) **বিনয়পিটক**—ইহাতে আছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের পালনীয় বিধিনিষেধ। (৩) **অভিধম্মপিটক**—ইহাতে আছে বৌদ্ধ দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা। বৌদ্ধ **জাতকগুলি** বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মগ্রন্থ

পরবর্তিকালে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়। ফলে ভিক্ষুগণকে সংঘবদ্ধ ও আচারনিষ্ঠ করিবার জন্য এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের জন্য চারিটি বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম সপ্তপর্ণী গুহা সম্মেলনের এক শতাব্দী পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহূত হয়। চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয় কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে বা পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে। ফলে বৌদ্ধগণ **হীনযান** (প্রাচীনপন্থী) ও **মহাযান** (নবীনপন্থী)—এই দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। হীনযান অর্থে বুঝায় বুদ্ধ-প্রবর্তিত আদি মত ও পথ—নিরীশ্বরবাদ, ব্যক্তিগত নির্বাণ ইত্যাদি। মহাযান মতে গৌতম বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সর্বজনীন বিশ্বকল্যাণই বৌদ্ধ জীবনের চরম আদর্শ। এই মতবিরোধের পর হইতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বৌদ্ধ সংগীতি

বৌদ্ধ শিল্পঃ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কোন ভাস্কর্য, চিত্র বা শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য—কিন্তু ভারতীয় শিল্প-সাধনার ইতিহাসে বৌদ্ধদিগের অবদান অপরিসীম। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর বহু চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্মাণ করান। কথিত আছে, একমাত্র মহারাজ অশোকই বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বাসের জন্য চুরাশি হাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে এবং আদেশে শিল্পিগণ পর্বতগাত্রে, গুহাগাত্রে এবং স্তম্ভগাত্রে তথাগত বুদ্ধের উপদেশাবলী ক্ষোদিত করেন; পাষাণগাত্রে ক্ষোদিত এই ভারতীয় তক্ষণশিল্প অপূর্ব। মহারাজ কণিষ্কের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু স্তূপ, চৈত্য এবং

অশোকের বৌদ্ধ-শিল্প

কণিষ্কের বৌদ্ধ-শিল্প

বিহার নির্মিত হইয়াছিল। কণিষ্কযুগের শিল্পধারা অনুসরণ করিয়া মধ্য এশিয়া এবং চীনে বহু মঠ, স্তূপ ও গুহা নির্মিত হয়। রুশ পণ্ডিত ৎচুকিন বলেন, কুষাণ যুগের পরে তক্ষণশিল্পে পারদর্শী বহু ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন রাজসভায় শিল্পকার্যে নিযুক্ত হয়। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ে গান্ধার ও সমীপবর্তী অঞ্চলে বহু মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়াই এই মূর্তিগুলি রচিত।

গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ শিল্প-নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করেন নাই। ফা-হিয়ান ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্প-কীর্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। গুপ্তযুগের অন্তে হূণ আক্রমণকারিগণ ভারতের নানাস্থানে বহু বৌদ্ধকীর্তি ধ্বংস করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনের সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বহু ধ্বংসপ্রায় বৌদ্ধ শিল্প-নিদর্শন দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন।

অজন্তা ইলোরার শিল্প

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে অজন্তা এবং ইলোরা অঞ্চলে একটি শিল্পতীর্থ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রারম্ভে এই শিল্প-তীর্থের প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ধ্যান, ধারণা ও সাধনার জন্য নির্জন স্থানের অন্বেষণে অজন্তা ও ইলোরার পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হইতেন এবং বর্ষাকালে আশ্রয়ের নিমিত্ত এই সকল পর্বতগাত্রে গুহা নির্মাণ করেন। গুহা-গাত্র ক্ষোদিত করিয়া বৌদ্ধগণ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং বুদ্ধের জীবন-কাহিনী চিত্রে অঙ্কিত করেন। পরবর্তী কালে বহু জৈন অ-হিন্দু সন্ন্যাসী সাধনার জন্য অজন্তা ও ইলোরা গুহায় গমন করেন। তাঁহারাও বৌদ্ধ শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি এবং পৌরাণিক ঘটনাবলী তথায় ক্ষোদিত ও অঙ্কিত করেন। ভারতের রাজন্যবর্গ এই পুণ্যকার্যে অর্থ ও উৎসাহ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সাধারণ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুগৃহস্থগণ বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন মুনি এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে ধর্মকার্যে সহায়তার জন্য অর্থ ও শ্রম দ্বারা পোষকতা করিতেন। ফলে সাত শত বৎসরের সাধনায় অজন্তা ও ইলোরা অঞ্চলে প্রকৃতির এই নির্জন আলয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গ, ভিক্ষু, মুনি, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সমবেত চেষ্টায় এক অপূর্ব শিল্পতীর্থ রচিত হইল। এই কৃতিত্বের পশ্চাতে বৌদ্ধধর্মের অবদান ছিল প্রধান। সাত শত বৎসর ব্যাপিয়া একই আদর্শে এইরূপ শিল্পসাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অজন্তা ও ইলোরার শিল্প-চিহ্নগুলি ভারতের শিল্প-সাধনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। (বহির্ভারতে বৌদ্ধশিল্পের বিস্তার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে করা হইয়াছে।)

বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ: অনেকের ধারণা আছে যে, মৌর্য যুগের পরে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া বৌদ্ধধর্মের পতন আরম্ভ হইল।

এই উক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নহে। মৌর্য-পরবর্তী যুগে শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অবিচার করে নাই। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রচারক। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচার নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু গুপ্তরাজগণ বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই, বরং গুপ্তযুগে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সমভাবেই প্রসার লাভ করে ; এই যুগ হইতে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ঘটে।

চীন, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম প্রভৃতি বহির্ভারতীয় অঞ্চলের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পের মাধ্যমে অপূর্ব প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসরকাল ভারত, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম প্রভৃতি হিমালয়ের প্রত্যন্ত দেশখণ্ডেও ধর্মীয় ঐক্য-প্রবাহ চলিয়াছিল। হর্ষবর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা হিউয়েন সাঙের বিবরণে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। বাংলার পাল রাজগণ এবং কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যের কয়েক জন নরপতি বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। সুতরাং 'রাজানুগ্রহ-বিচ্যুতি'কে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ বলিয়া অবিসংবাদিত ভাবে গ্রহণ করা যায় না।

বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ—হিন্দুধর্মের উদার সমন্বয়ী চিন্তা ও সর্বগ্রাসী কর্মধারা। গুপ্ত যুগের পূর্বে এবং পরে বাহির হইতে অর্ধসভ্য বা অসভ্য জাতি-গুলি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারা ভারতীয় দেবদেবী, মূর্তি, মন্দির ও উৎসব-বহুল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। পুরাণকারগণ এই সমস্ত নবদীক্ষিত হিন্দুদের গ্রহণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন দ্বারা হিন্দুধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সংঘে নারীর প্রকাশ্য যোগদান বৌদ্ধধর্মের নৈতিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

তদুপরি হিন্দুগণ তাহাদের সহজাত সহনশীলতা ও ধর্মীয় উদারতা বশে শুদ্ধোধন-পুত্র গৌতমকে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দশাবতারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিল। মধুকণ্ঠ জয়দেব ললিতছন্দে দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধ-স্তোত্র রচনা করিয়া বৌদ্ধদের উষ্মা প্রশমিত করিলেন। ইতোমধ্যেই পূজামূলক মহাযান মতবাদ ও বৌদ্ধ তন্ত্রাচার বহুভাবে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পুরীর বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দুগণ জগন্নাথের মন্দিরে পরিবর্তিত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই অন্যদিকে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, রামানন্দ, বসব, আলভার, নাইনার ও বৈষ্ণব মহাজনদের আহ্বান এত বেশী সার্বজনীন হইয়া উঠিল যে, বৌদ্ধমঠ বা বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য নূতন ধর্মার্থীর আগমন হইত না। সর্বশেষে আদর্শ ও যুক্তির দিক দিয়া শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনকে

তাঁহার অদ্বৈতবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের মূলগত দার্শনিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া দিলেন। শঙ্কর তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনীষার দ্বারা হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্যগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন। সেইজন্য প্রাচীনপন্থী হিন্দুপণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্যকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ বলিয়া নিন্দা করিতেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মুসলমানগণ মুণ্ডিত মস্তক, পীতবাস, মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দেখিলেই হত্যা করিত; বৌদ্ধ মঠ, বিহার, চৈত্য লুণ্ঠন করিত এবং বৌদ্ধমূর্তিগুলি বিচূর্ণ করিয়া দিত। প্রধানতঃ মুসলমানগণের অত্যাচারের ফলেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটে।

বৈদিক হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা ঃ বৈদিক ধর্ম আদি জননী,—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তাহার দুই বিদ্রোহিনী কন্যা। কিন্তু কোন কন্যাই মাতাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই; মাতাও বিদ্রোহিনী কন্যাদ্বয়কে আপনার অঞ্চলচ্ছায়ায় পুনরায় আশ্রয়দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই। হিন্দু জৈনধর্মের লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষ। বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে অধিক প্রচলিত।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন

হিন্দুধর্মের প্রবর্তক কে, উৎপত্তি কোথায় এবং কোথায় বা উহার পরিসমাপ্তি তাহার কোন নির্দেশ নাই। হিন্দু ধর্মের আদি নাম বৈদিক ধর্ম, আর্য ধর্ম অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার কোন সন্ধান নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা কর্তৃক উপলব্ধ সত্য হিন্দুধর্মের সারবস্তু। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর ও সিদ্ধার্থ গৌতম—দুই জনই আর্যধর্মাশ্রিত ক্ষত্রিয় সন্তান। নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বাস্তবিক এই দুইটি ধর্মমত বৈদিক ধর্মেরই বিদ্রোহী নবরূপ। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও দুঃখনিবৃত্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অহিংসার আভাস উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে। জৈনগণ হিন্দুর অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাসী এবং ধর্মকার্যে হিন্দুগণের ন্যায় তাহারা পুরোহিত নিয়োগ করে। অবশ্য তাহারা হিন্দুর দেবদেবী অপেক্ষা তীর্থঙ্করদিগকে অধিকতর পূজ্য বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধগণ বেদকে অভ্রান্ত, নিত্য সত্য এবং অপৌরুষেয় বিবেচনা করে না। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। আত্মা এক, অদ্বিতীয় ও বিশ্বময়ী—এই বৈদান্তিক মতবাদও বৌদ্ধগণ স্বীকার করে না। বৌদ্ধগণ হিন্দুর জন্মায়ত্ত জাতিভেদও স্বীকার করে না।

অহিংসা নীতি জৈন ও বৌদ্ধগণের জীবনযাত্রার প্রধান পাথেয়। জৈন মতে অহিংসা নীতি মানবজীবনের সর্বোত্তম পন্থা, সুতরাং অহিংসা সম্বন্ধে তাহারা চরমপন্থী। যুদ্ধ, জীবহত্যা এবং কৃষিকার্যে কৃষক অজ্ঞাতে ক্ষুদ্রপ্রাণ বিনষ্ট করে—এই আশঙ্কায় জৈনগণ ক্ষত্রিয় বা কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করে না। সাধারণতঃ জৈনগণ বণিক বা বৈশ্য; তাহারা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। ধর্মশালা নির্মাণ, পিঞ্জরাপোল ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন তাহারা ধর্মকার্য বলিয়া বিবেচনা করে। জৈনগণ সৃষ্টির প্রতি পরমাণুতে প্রাণসত্তা অনুভব করে।

ফলে নিজের অলক্ষ্যে খাদ্যের সঙ্গে প্রাণিহত্যার ভয়ে তাহারা রাত্রিতে আহার করে না। অসহায় জীবজন্তুর প্রতি মমতাবোধ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। বোধ হয় জৈনগণ আজীবিক সম্প্রদায় হইতে কৃচ্ছ্রসাধন পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। জৈনগণ শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনকে ধর্মাচরণের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধগণ এই কৃচ্ছ্র সাধন অত্যাবশ্যক মনে করে না। ধর্মে কৃচ্ছ্রসাধন বিষয়ে বৌদ্ধগণ মধ্যপন্থী। জৈন আদর্শ অনুযায়ী ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করাই মানুষের পরমার্থ। বৌদ্ধগণের আদর্শ ছিল বুদ্ধের ন্যায় সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্তি। তিনটি ধর্মেরই উপদেশ সংযম, চরিত্রগঠন ও জ্ঞানানুশীলন এবং লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, আত্মত্যাগ ও আত্মোন্নতি।

ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম স্বীয় উদারতায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে আপন করিয়া লইল এবং তিনটি ধর্মই পরস্পর প্রভাবান্বিত হইল। প্রথম যুগে যাগযজ্ঞ-বিরোধী হইলেও কালক্রমে জৈনগণ হিন্দুর পূজাবিধি, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পুনরায় গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধগণও তথাগত বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞান করিয়া হিন্দুর দেবতার ন্যায় বুদ্ধমূর্তির অর্চনা ও পূজা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ আচার্যগণ তাঁহাদের ধর্ম পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় (হিন্দুদের দেবভাষা) লিখিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুগণ ভগবান বুদ্ধকে দশাবতারের অন্যতম রূপে অর্ঘ্য প্রদান করিল। জৈন তীর্থংকরগণ হিন্দুসমাজে পূজিত হইলেন। ফলে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে

তিন ধর্মের পরিণতি

বহুক্ষেত্রে ব্যবহারগত ঐক্য সাধিত হওয়ায় এই তিন ধর্মাবলম্বিগণের দৈনন্দিন ও গার্হস্থ্য জীবন প্রায় একই রূপ ধারণ করিয়াছে। একমাত্র জটাজুটধারী হিন্দু সন্ন্যাসী, মুণ্ডিতকেশ-পীতবাস-পরিহিত বৌদ্ধশ্রমণ এবং শ্বেতবাস পরিহিত অথবা দিগম্বরজৈন আচার্যদের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য ভিন্ন অন্য পার্থক্য বিশেষ নাই।

অনুশীলনী

১। বৈদিকোত্তর যুগে আর্যধর্ম ও সমাজের আচারকেন্দ্রিকতার বিবরণ দাও।
(Give a short sketch of the Aryan religion and of the ritualistic tendency of the Post Vedic Age.)

২। জৈনধর্মের অভ্যুত্থান, মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত বর্ণনা কর।
(Trace the origin of Jainism and sketch the life and tenets of Mahabir.)

৩। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্মের মূল উপদেশ আলোচনা কর।
(Sketch the life of Goutama Buddha. What were the principles of Buddhism?)

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) পার্শ্বনাথ, (খ) বৌদ্ধ সংগীতি, (গ) ত্রিপিটক।
(Write notes on: (a) Parswana'h, (b) Buddha Sangitee (c) Tripitaka.)

৫। বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ কি? হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের তুলনা কর।
(What were the causes of the decay of Buddhism? Compare Hindu, Bauddha and Jaina religions.)

মগধের অভ্যুদয় ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

অধ্যায় পরিচয় ঃ মগধকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের প্রথম প্রকৃত ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সম্রাট, একরাট প্রভৃতি শব্দ সাম্রাজ্যবাদের ইংগিত বহন করে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্যের বাস্তব রূপ প্রায় অজ্ঞাত। মগধই ছিল প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত মৌর্য বংশের লীলাকেন্দ্র। মৌর্যযুগ আরম্ভের পূর্বেই নন্দ বংশের সময় গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারতে অভিযান করেন। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম সুস্পষ্ট নির্ধারণ করা যায়। তাঁহার সেনাপতি সেলুকস মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই যুগেই মৌর্যগণ সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা রচনা করেন, চাণক্য অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন বলিয়া অনুমিত হয় এবং অশোক বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। এই যুগেই বহির্বিশ্বে ভারত আপনাকে প্রসারিত করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রধানতঃ আর্যাবর্তের বিশাল ভূখণ্ডের ষোলটি রাজ্য বা জনপদ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে এই ষোড়শ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী (বারাণসী), কোশল (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরক্ষপুর), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), বৎস (প্রয়াগ), কুরু (দিল্লী, মিরাট), পাঞ্চাল (যমুনার সমীপ অঞ্চল), মৎস্য (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চল), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ও আফঘানিস্থান), কম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর এবং কাফ্রিস্থান)—এই রাজ্য ষোলটির কয়েকটিতে গণতান্ত্রিক এবং কয়েকটিতে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ষোড়শ জনপদ

গণতান্ত্রিকদের রাষ্ট্র ঃ বৈদিকোত্তর যুগে আর্যাবর্তের পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে বৃজি, ভোজ, অশ্মক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বা রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবি প্রভৃতি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া বৈশালীতে বৃজি রাষ্ট্র গঠন করে। বৃজি রাষ্ট্রের কোন রাজা ছিল না। একটি বৃহত্তর সভা এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের একটি সমিতি রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিত। সুতরাং ইহা গণরাষ্ট্র নামে আখ্যাত হইত। পাবা ও কুশীনগরের মল্ল, পিপ্পলীবনের মৌর্য বা মৌরিয় এবং কপিলবাস্তুর শাক্যগণের রাষ্ট্রও ছিল

গণতান্ত্রিক। শাক্যদের সভা এবং সন্থাগার (সংস্থাগার) ছিল। লিচ্ছবি এবং জ্ঞাতৃককুল বোধ হয় মোঙ্গল বংশজাত ছিল। তাহারা তিব্বতীয়দের মত মৃতদেহ দাহ না করিয়া উন্মুক্তস্থানে রাখিয়া দিত। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে ইহাদিগকে ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজতন্ত্র প্রসারের ফলে কালক্রমে গণতন্ত্রগুলি লুপ্ত হয়।

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিল অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী নগরী এবং রাজা ছিলেন চণ্ড প্রদ্যোৎ মহাসেন। রত্নাবলী নাটকের নায়করূপে বিখ্যাত বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী ছিল প্রয়াগের নিকট কৌশাম্বীতে। তিনি অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে অপহরণ করিয়া বিবাহ করেন। কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল প্রথমে অযোধ্যায় এবং পরে শ্রাবস্তীতে। মগধের রাজধানী ছিল প্রথমে গিরিব্রজে পরে রাজগৃহে এবং সর্বশেষে পাটলীপুত্রে। বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে মগধের নৃপতি ছিলেন বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। প্রত্যেক রাজাই নিকটবর্তী রাজ্য অধিকার করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই শক্তিদ্বন্দ্বে প্রথমে অবন্তী, পরে বৎস, তারপরে কোশল এবং সর্বশেষে মগধ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে।

রাজতান্ত্রিক মগধের অভ্যুত্থান ঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোশল রাজগণ ক্রমশ কাশীরাজ্য ও কপিলবাস্তুর শাক্য গণতন্ত্র অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অন্যদিকে মগধ রাজ্য অঙ্গ (ভাগলপুর অঞ্চল) এবং লিচ্ছবিদের দেশ অধিকার করিয়া স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করিল। ইহার ফলে কোশল ও মগধের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরিশেষে মগধই এই শক্তিদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছিল।

মগধের রাজবংশ ঃ মৌর্যবংশের পূর্বে মগধে হর্যঙ্ক, শৈশুনাগ এবং নন্দ-বংশ নামে তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল। হর্যঙ্কবংশীয় রাজগণের মধ্যে

বিম্বিসার ও অজাতশত্রু

বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বিখ্যাত। বিম্বিসার পনর বৎসর বয়সে সিংহাসনে অভিসিক্ত হন। বিম্বিসারের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। তিনি রাজগৃহ নগরের পত্তন এবং অঙ্গ রাজ্য অধিকার করেন। তিনি কোশলের রাজকন্যা কোশলদেবীকে বিবাহ করেন এবং যৌতুকস্বরূপ কাশীরাজ্য লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম প্রচার করেন।) কিংবদন্তী আছে, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।/ স্বামীর শোকে মহিষী কোশলদেবী (অজাতশত্রুর বিমাতা) প্রাণত্যাগ করিলেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ, বৈশালীর বৃজি এবং পাবা ও কুশীনগরের মল্লগণ

তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কাশীরাজ্য পুনরধিকার করেন। তখন অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলী বা পাটলি নামক একটি পল্লীকে সুরক্ষিত করেন। এই গ্রামই অল্পকাল পরে বিখ্যাত পাটলীপুত্র নগরীতে পরিণত হয়। ইহার পর যুদ্ধে জয়ী হইয়া অজাতশত্রু বৃজি অঞ্চলকে মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়া লন। প্রসেনজিৎ পরাজিত হইয়া অজাতশত্রুর হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন এবং কাশীরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের দেহাবসান হয়। অজাতশত্রুর পর তাঁহার কয়েকজন বংশধর মগধে রাজত্ব করেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ীভদ্র পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

পাটলীপুত্র স্থাপন

মগধের শৈশুনাগ বংশ: উদয়ীভদ্রের বংশধরগণ দুর্বল ছিলেন। হর্যঙ্ক বংশীয় শেষ রাজার মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শৈশুনাগ নৃপতিগণ কোশল, বৎস ও অবন্তী রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে শৈশুনাগ বংশের দুর্বল রাজাকে হত্যা করিয়া মহাপদ্ম উগ্রসেন নামক জনৈক শূদ্র-(মতান্তরে ক্ষত্রিয়) বীর মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবদন্তী আছে, তিনি ছিলেন শেষ শৈশুনাগ নৃপতির শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান।

মগধের নন্দবংশ: পুরাণের মতে মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন শূদ্র। জনৈক জৈন পণ্ডিত এবং বিদেশী ঐতিহাসিক কুইনটাস কারটিয়স মহাপদ্মকে নরসুন্দর বা নাপিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন—অবশ্য কোন কোন ব্রাহ্মণ লেখক মহাপদ্মকে নীচ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দ বংশের মোট নয় জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন। সুতরাং তাঁহারা 'নব নন্দ' নামে পরিচিত। তাঁহাদের রাজত্বকাল একশত পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জয়সোয়ালের মতে প্রথম নন্দবংশের পতনের পরে মগধে নূতন একটি নন্দবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই নন্দবংশের নাম 'নব নন্দ' অর্থাৎ নূতন নন্দবংশ। এই বংশের শেষ নরপতি ধননন্দের সময়ে (৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করিয়া ভারতের দিকে অভিযান করেন।

নন্দ বংশের আদি পরিচয়

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক অভিযান: মগধরাজ বিম্বিসারের সমকালে পারস্যের সম্রাট ছিলেন **কুরুষ** (৫৫৮–৫৩০ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধুপদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে পারস্য সম্রাট **দারায়ুস** বা **ডেরিয়াস** (সংস্কৃত দারয়বৌস)

পারসীক আক্রমণ

গান্ধার ও হিন্দ (সিন্ধু উপত্যকা) জয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দারায়ুসের গান্ধার ও সিন্ধু বিজয় নানা দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই অঞ্চলকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এখানে একজন ক্ষত্রপ উপাধিধারী শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই অঞ্চলের রাজস্ব ছিল সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের আয়ের এক তৃতীয়াংশ —দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা। পারস্যরাজ বহু ভারতীয় তীরন্দাজকে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। ইহাতে পারস্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

ডেরিয়াস

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান : এই অভিযানের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল—পারস্য বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা, বিজিত ভূখণ্ডে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার এবং ব্যক্তিগতভাবে সামরিক প্রতিষ্ঠা লাভ। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার পারস্য বিজয় সম্পন্ন করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময়ে পূর্ব ভারতে মহাপদ্ম নন্দের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল ও শক্তিশালী। কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার পর পর নৌকা সজ্জিত করিয়া সেতু নির্মাণ করেন এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে বহু রৌপ্য-মুদ্রা, মেষ ও বৃষ উপঢৌকন প্রদান করিয়া

আলেকজাণ্ডার

গ্রীক বীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীক সান্দ্রোকোটাস) নামক জনৈক বিতাড়িত রাজপুত্র আলেকজাণ্ডারের শিবিরে রণকৌশল শিক্ষা

লাভের জন্য উপস্থিত হন। তাঁহার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া গ্রীক বীর তাঁহাকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। চন্দ্রগুপ্ত বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিন্ধ্যারণ্যের পথে তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ চাণক্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

বিজিত অঞ্চল গ্রীকবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদী (গ্রীক নাম হিদাস্পিস) পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন **পুরু**। পুরু বীরবিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা প্রদান করিলেন, কিন্তু অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও তিনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। পুরুর সহিত কথোপকথনে প্রীত হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে **হিদাস্পিসের যুদ্ধ** নামে খ্যাত।

আলেকজাণ্ডার পূর্ব-ভারতে নন্দ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পরে প্রায় পরাজিতের মনোভাব লইয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। সম্ভবতঃ মগধের সাহসী, বিরাট ও বিপুল বাহিনীর খ্যাতিও তাহাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার সেনাবাহিনীর একটি দলকে নৌ-সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে জলপথে পারস্যের দিকে প্রেরণ করিলেন। অন্য দলটি সহ তিনি স্বয়ং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পথে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক জাতিকে নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ৩২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি ব্যাবিলনে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তেত্রিশ বৎসর বয়সে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা: পশ্চাদপসরণ অথবা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আলেকজাণ্ডার বিশাল ভারতের সামান্য বিজিত অংশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। বিভিন্ন ভাগে গ্রীক, পারসীক এবং ভারতীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ভারতীয় শাসনকর্তাদের মধ্যে কাশী গুপ্ত এবং অম্ভির নাম উল্লেখযোগ্য। অধুনা এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত আলেকজাণ্ডারের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা গ্রীক শাসনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আলেকজাণ্ডারের ভারতে সাফল্যের কারণ: কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে ভারতের সামরিক দুর্বলতাই আলেকজাণ্ডারের ভারতে সাফল্যের কারণ। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে—কারণ গ্রীক লেখকগণ রাজা পুরুর অসামান্য বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। মালবগণের সহিত যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। পারসীক সৈন্য অপেক্ষা ভারতীয় সৈন্য যে নিপুণতর যোদ্ধা ছিল, তাহা গ্রীক লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন। নন্দবংশের বিপুল সৈন্যবাহিনী এবং সামরিক খ্যাতি গ্রীক সৈন্যগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল; সেইজন্যই তাঁহার সৈন্যবাহিনী

পূর্ব-ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সাহস করে নাই। পরবর্তিকালে আলেকজাণ্ডারের বিখ্যাত সেনাপতি সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবাসীর সামরিক দুর্বলতা আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সেলুকস

বস্তুতঃ, আলেকজাণ্ডারের সাফল্যের চারিটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে: প্রথমতঃ পঞ্জাবে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না বলিয়া ভারতীয় রাজগণ সম্মিলিত-ভাবে গ্রীকদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাজন্য-বর্গ হস্তিবাহিনীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। গ্রীক্‌দের বিষাক্ত তীরের আঘাতে রাজা পুরুর হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া স্বপক্ষের সৈন্যদলকে পদদলিত করিয়াছিল। ফলে পুরুর সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের দিনে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় রণাঙ্গন পিচ্ছিল হইয়াছিল। ভারতীয় পদাতিক পিচ্ছিল ভূমিতে তীরধনুক যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে নাই। সর্বশেষে ভারতীয় রাজা বা সেনাপতি সৈন্য-চালনায় আলেকজাণ্ডারের মত সুনিপুণ ছিলেন না। আলেকজাণ্ডারের রণকুশলতাই বিজয়ের প্রধান কারণ। অবশ্য পানিক্কার বলেন,"আলেকজাণ্ডার বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তিশালী ভারতীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, পারস্যরাজের বশংবদ কয়েকটি বিবদমান ক্ষুদ্র রাজার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিপাশা নদী অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল: আলেকজাণ্ডার ভারতে মাত্র উনিশ মাস ছিলেন। আলেকজাণ্ডার ভারতবাসীর নিকট রাজ্যলোলুপ নিষ্ঠুর অত্যাচারী 'রাক্ষস' রূপেই প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বহু জনপদ ও নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। কথিত আছে, এক সিন্ধুদেশেই আশি হাজার ভারতবাসী নিহত হইয়াছিল; সহস্র সহস্র যুদ্ধবন্দী দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ভারতবাসী এই আক্রমণকে আখ্যা দিয়াছিল 'রাক্ষস কর্ম'। গ্রীক সেনাপতি টলেমী, নিয়ারকস, অনিসিক্রটাস এবং অরিস্টবুলাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক মনোরম তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐগুলি ভারত ইতিহাসের উপাদান।

প্রত্যক্ষ ফল

কিন্তু গ্রীক অভিযানের পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই অভিযানের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কতকগুলি গ্রীক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং অচিরে গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হইয়াছিল। গ্রীক-সভ্যতা বিস্তার মানসে আলেকজাণ্ডার ভারত সীমান্তে পাঁচটি আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষ হইতে ইওরোপে যাতায়াতের নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় গ্রীক এবং ভারতীয়গণের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত
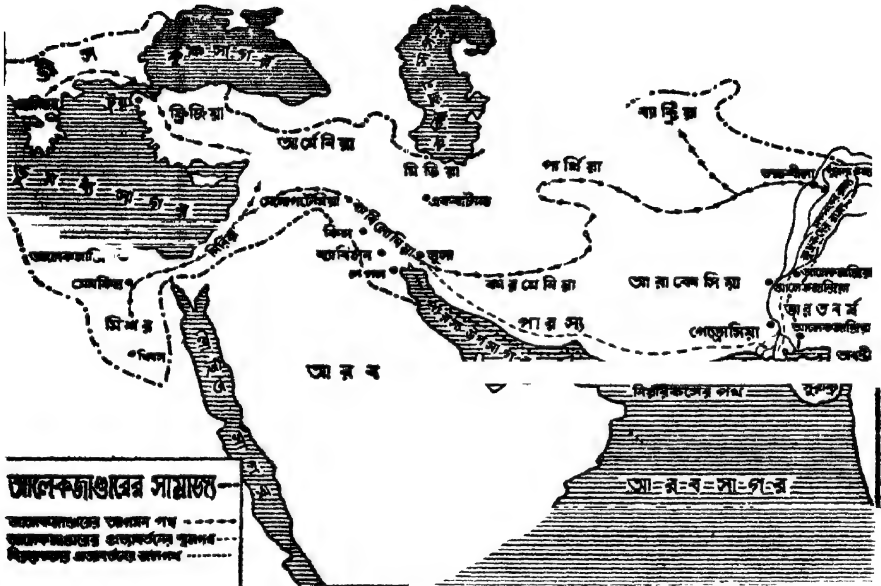
পরোক্ষ ফল

আলেকজাণ্ডারের অভিযান-পথ

হইয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হইয়াছিল। গান্ধার শিল্প, জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মুদ্রা ও প্রতিমা নির্মাণে যে গ্রীক প্রভাব লক্ষিত হয়, উহা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানেরই সুদূরপ্রসারী পরোক্ষ ফল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয়ে যবনিকার প্রচলন গ্রীক বা যাবনিক নাটকের অনুসরণ। গ্রীক আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি বিনষ্ট হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে ঐ রাজ্যগুলি জয় করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিধান সহজ হইয়াছিল।

বীরবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (আ: ৩২৪-৩০০ খ্রী: পূ:): মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। পুরাণের মতে তিনি নন্দরাজের জনৈক শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত সন্তান এবং তাঁহার মাতা বা

পিতামহী মুরার নাম হইতে মৌর্য নামের উৎপত্তি। পালি সাহিত্যে মোরিয় বা মৌর্যকুলকে একটি ক্ষত্রিয়বংশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলীবনে মোরিয় ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিত। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত সেই মোরিয় বংশের রাজপুত্র বলিয়াই পরবর্তী যুগে মৌর্য নামে পরিচিত হইয়াছেন।

কথিত আছে, ৩২১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কিছু পূর্বেই তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ চাণক্যের বুদ্ধিবলে ও সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের শেষ সম্রাট ধননন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইবা মাত্র গ্রীক বিজিত অঞ্চলে তাঁহার রাজ্যাংশ লাভের জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; গ্রীক সেনাপতি ইদামুস পুরুকে হত্যা করেন, গ্রীক প্রতিনিধি ফিলিপও নিহত হন। পঞ্জাবেও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। সেই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাহাদিগকে আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করেন।

গ্রীক বিতাড়ন ও রাজ্য জয়

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলুকস পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক অধিকৃত রাজ্যখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক অধিকৃত পঞ্জাব আক্রমণ করিলে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নীরব। গ্রীকগণ বিজয়ী হইলে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ গ্রীক বিজয় উল্লেখ করিতেন। কিন্তু জানা যায়, আফঘানিস্থানের অন্তর্গত কাবুল, কান্দাহার ও হিরাত এবং বেলুচিস্থানের অন্তর্গত মাকরান অঞ্চল মৌর্য সম্রাটকে সমর্পণ করিয়া সেলুকস সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্ত দৃঢ় করিবার জন্য সম্ভবতঃ গ্রীকরাজ চন্দ্রগুপ্তের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মেগাস্থিনিস নামক কান্দাহারের একজন গ্রীক রাজকর্মচারীকে দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে পাঁচ শত রণহস্তী উপহার দিয়াছিলেন।

এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মগধ সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিম কপিশা অর্থাৎ আফঘানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। চন্দ্রগুপ্ত মালব জয় করেন সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়াড় প্রদেশও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ সুদূর মহীশূরেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। জৈন কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে ভদ্রবাহু নামক একজন জৈন সন্ন্যাসীর প্রেরণায় মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে জৈন রীতি অনুসারে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের অনশনে মৃত্যু

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব : চন্দ্রগুপ্ত অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রশাসনে তাঁহার তুল্য দক্ষতা ছিল। অত্যাচারী নন্দবংশকে ধ্বংস করিয়া তিনি মগধ রাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর আলেকজাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলুকসের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্য পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাফল্যে ভারতবাসী গৌরবান্বিত। সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী একই প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিয়া প্রায় সর্ব-ভারতীয় ঐক্য স্থাপন তাঁহার অম্লান কীর্তি। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য বর্ণিত শাসন ব্যবস্থা কেবল গ্রন্থবর্ণিত আদর্শ নয়, চন্দ্রগুপ্ত উহা বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। মহাভারতের যুগের পরে চন্দ্রগুপ্তই দ্বিতীয় বার 'রাজনৈতিক মহাভারত' প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় অর্জুন। অখ্যাত কুলজাত চন্দ্রগুপ্ত বাহুবলে রাজ্য স্থাপন, রাজ্য জয়, গ্রীক বিতাড়ন ও সুশাসন প্রচলন করিয়াছিলেন, সুতরাং 'বীরবাহু চন্দ্রগুপ্ত' আখ্যা যোগ্যপাত্রে যোগ্য উপাধি নিঃসন্দেহ। জীবনের শেষ দিনেও চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ধর্মের নীতি অনুসারে প্রায়োপবেশনেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

অমিত্রঘাত বিন্দুসার (আঃ ৩০০-২৭২ খ্রীঃ পূঃ) **:** অনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ পূঃ (মতান্তরে ২৯৭ খ্রীঃ পূঃ) চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। **অমিত্রঘাত** বা 'শত্রুহন্তা' উপাধি তাঁহার পরাক্রমের পরিচায়ক। সম্ভবতঃ তিনি দাক্ষিণাত্য মৌর্যশাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রীক রাজগণের সহিতও তাঁহার মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সিরিয়ার গ্রীক নরপতি ডেইমেকস নামক একজন গ্রীকদূতকে বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশররাজ টলেমির একজন দূতও তাঁহার সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি অশোক (আঃ ২৭২-২৩২ খ্রীঃ পূঃ) **:** বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন বা অশোক মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

সিংহাসন লাভ

পিতার রাজত্বকালে তিনি উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার উপরাজ বা শাসনকর্তা ছিলেন। সিংহলের মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, পিতার মৃত্যুর পর শত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া অশোক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মহাবংশে তাঁহাকে 'চণ্ডাশোক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যলাভের চারি বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, কুষ্ঠরোগাগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি চারি বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ঃ অভিষেকের প্রায় আট বৎসর পরে অশোক পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ কলিঙ্গ রাজ্য (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, 'শত সহস্র কলিঙ্গবীরের শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া' অশোক জয়লাভ করেন। কলিঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তোসলী নগরে কলিঙ্গের নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের জীবনে, এমন কি, পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম ও শেষ সামরিক অভিযান। যুদ্ধের ভয়াবহ রক্তপাতের দৃশ্য এবং আহত ও আর্তের দুঃখবেদনায় অশোকের হৃদয় শোকে ও অনুতাপে অভিভূত হয়। ইহার পর মহারাজ অশোক পিতা ও পিতামহের দিগ্বিজয়ের অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা দেশজয়ের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয় অর্থাৎ অহিংসা, মৈত্রী ও ধর্মপ্রচার দ্বারা মানবহৃদয় জয়ের আদর্শ গ্রহণ করিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধ ও তাহার ফলাফল

অশোকের ধর্মাদর্শ ঃ শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিন্দুসার সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অশোক প্রথমে পিতার ধর্মই অনুসরণ করিতেন। তিনি যুদ্ধে নরহত্যা করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁহার মনকে বিচলিত করিল। কিংবদন্তী আছে যে, এই যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পরে সম্রাট অশোকের জীবনের মূলমন্ত্র হইল—জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহিংসা, সর্ব-জীবকল্যাণ এবং ধর্মবিজয়।

প্রিয়দর্শী অশোক

অশোকের ধর্ম ছিল সরল ও উদার। অহিংসা, সত্যবাদিতা, গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, ধর্মে শ্রদ্ধা, জীবনযাত্রায় পবিত্রতা এবং ব্যবহারে কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ছিল অশোকের ধর্মের সারমর্ম। সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও শ্রদ্ধাশীলতা ছিল অশোকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আজীবিক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি বিপুল

অশোকের ধর্ম

ব্যয়ে গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে কয়েকটি গুহা সংস্কার ও নির্মাণ করিয়া দেন। অশোক ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধধর্মের উপদেশগুলি সম্যক অনুসরণ করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। অশোক যাহা আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন, স্বয়ং তাহা পালনও করিতেন। কায়মনোবাক্যে অশোক ভগবান তথাগতের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্ম ছিল তাঁহার জীবন-বেদ।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার: অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব রাজ্যজয়ের জন্য নহে। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম প্রচার তাঁহাকে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ধর্মপ্রচারের মধ্যে যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। যে অহিংসার বাণী তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই বাণী দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পরেই অশোক বৌদ্ধতীর্থ দর্শন ও অহিংসার বাণী দেশময় প্রচারের জন্য 'বিহার যাত্রার' পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। বিহার যাত্রা ছিল একদিকে রাজার ঐশ্বর্যের নিদর্শন, অন্য দিকে শিকারের উন্মাদনা ও প্রাণীহত্যার উল্লাস। অশোক স্বয়ং বৌদ্ধ তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূল উপদেশ বা অনুশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিতেন। সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার এবং তাহাদের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অশোক যুত, রাজুক, প্রাদেশিক প্রভৃতি কর্মচারীকে তাঁহাদের শাসনসংক্রান্ত কার্যের সহিত ধর্মপ্রচারে ভারও অর্পণ করেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাঁহারা রাজ্য পরিদর্শন ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মযাত্রা করিতেন। পরে তিনি 'ধর্ম মহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দেশ হইতে দেশে, নগর হইতে নগরে ভ্রমণ করিয়া নাটকাভিনয় ও অন্যান্য ভাবে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। অশোকের সময় প্রতিবেদক নামক এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন রাজকর্মচারী রাজ অনুশাসন বা আদেশ অমান্য করিলে প্রতিবেদকগণ অশোককে সংবাদ দিতেন। রাজ্যের কল্যাণে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সর্বকালে, সর্বস্থানে এবং সর্বাবস্থায় মহারাজ অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। প্রতিবেদক ছিলেন রাজমধ্যে বায়ুর মতন 'অবাধগতি'।

স্বদেশে ধর্মপ্রচার

লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক রাজ্যের নানাস্থানে পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মের অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই অনুশাসনগুলি ভারতের অতি প্রাচীন লিপির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুদ্ধদেবের পূতাস্থিপূর্ণ একটি পেটিকার উপরিভাগে এই

লিপির প্রাচীনতম রূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য অশোক ধর্মোৎসবের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

অশোকের সময়ে বৌদ্ধসংঘে নানা মত ও দলের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মতবিরোধ দূর করিবার জন্য অশোক পাটলীপুত্রে একটি ধর্মসম্মেলন আহ্বান করেন। ইহাই তৃতীয় **বৌদ্ধ সংগীতি** নামে খ্যাত। তাঁহার চেষ্টায় সংঘের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হইল—বৌদ্ধগণ দেশে বিদেশে ধর্মপ্রচারের নূতন প্রেরণা লাভ করিল।

বুদ্ধের পূতাস্থিপূর্ণ পেটিকাপৃষ্ঠে প্রাচীন লিপি

অশোকের ধর্মপ্রচার কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণ সুদূর দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি দেশেও ধর্মপ্রচার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘ স্থাপন করেন। অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রা তাম্রপর্ণী বা সিংহলে ধর্মপ্রচার করিয়া সিংহলরাজ তিস্‌স ও তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কিংবদন্তী আছে যে, সুদূর ব্রহ্মদেশেও শোণ এবং উত্তর নামক দুইজন বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোক সিরিয়ার অধিপতি এ্যান্টিওকস থিয়স, ম্যাসিডনের রাজা এ্যান্টিগোনাস গোনেটাস, এপিরাসের (মতান্তরে করিন্থের) রাজা আলেকজাণ্ডার ও মিশরের গ্রীক রাজা টলেমী ফিলাডেলফাসের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজ্যে সেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইদানীং ইতালীয়ান সুধী ডাঃ টুচ্চি কর্তৃক কান্দাহার নগরের অদূরে শহর-ই-কউন অঞ্চলে গ্রীক ও আরামাইক ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, প্রজাবর্গের মধ্যে গ্রীক ভাষাভাষী মানুষও ছিল। অশোকের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হইল। 'আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ' বুদ্ধদেবকে যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে, সে শ্রদ্ধা অংশতঃ অশোকেরই প্রাপ্য।

বিদেশে ধর্মপ্রচার

অশোকের জনহিতকর কার্যাবলী : সমগ্র জীবজগতের কল্যাণসাধনই ছিল অশোকের জীবনের একমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য। অশোক রুগ্ন মনুষ্য ও জীবজন্তুর সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় ও আশ্রয়ালয় (পিঁজরাপোল) স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য নানা প্রয়োজনীয় তরুলতা সংগৃহীত ও রোপিত হইয়াছিল। পথিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি রাজপথ নির্মাণ, ছায়াপ্রদ বৃক্ষরোপণ, কূপখনন এবং বিশ্রামাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত জীবহত্যা ও প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অশোকের জীবনে সন্ন্যাসীর ধর্মপ্রবণতা এবং আদর্শ নরপতির প্রজারঞ্জন-প্রিয়তা—দুই গুণেরই সমন্বয় হইয়াছিল।

মহামানব অশোকের সর্বজনীন মহত্ত্ব : বিখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস বলেন—সর্বদেশের, সর্বকালের সম্রাটদিগের মধ্যে অশোক সর্বোত্তম। বিচক্ষণ যোদ্ধা, অক্লান্ত কর্মী, প্রতিদান আকাঙ্ক্ষাবিহীন মানব-হিতৈষী রূপে তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয়। পূর্বযুগের ধারানুযায়ী তিনি রাজ্যলাভ করিয়া দুর্ধর্ষ কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিলেন। যুদ্ধে নরহত্যা ও মানবের দুঃখদুর্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। সুতরাং তিনি কলিঙ্গ বিজয়ের পরেই যুদ্ধ ও রাজ্যজয় নীতি পরিত্যাগ করিলেন। পরাজয়ের পর যুদ্ধবিরতি ও শস্ত্রত্যাগ অতি সাধারণ ব্যাপার ; কিন্তু শত্রুবিনাশ ও যুদ্ধজয়ের পর মুহূর্তেই যুদ্ধবিরতি ও শস্ত্রত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। অশোক দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয় রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বিজয়দৃপ্ত যুবক অশোক ইচ্ছা করিয়াই সাম্রাজ্য জয়ের প্রেরণা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শক্তি মানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় নিয়োগ করিলেন। বাস্তবিক মহারাজ অশোক **মহামানব**।

দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়

তাঁহার চেষ্টায় শাক্য রাজকুমার প্রবর্তিত একটি ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় পৃথিবীর বিশালতম ধর্মসংঘে রূপান্তরিত হইল ; তাঁহার শক্তি, নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা গুণে বৌদ্ধধর্ম তদানীন্তন সভ্য জগতের বৃহত্তম ধর্মরূপে পরিগণিত হইল। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নরনারী তথাগত বুদ্ধের চরণে শরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। ধর্ম প্রচারের মধ্যে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ভগবান তথাগতের অহিংসা বাণী বহন করিয়া চলিল নব নব দেশে অশোকের মুণ্ডিত কেশ, রক্তকষায়বস্ত্র-শোভিত, দণ্ডপাণি ধর্মদূত। অস্ত্রের অগ্রভাগে ধর্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়া কিংবা বণিকের পণ্যসম্ভারের অন্তরালে অশোক ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। অন্তরের আবেগে তিনি ভগবান বুদ্ধের শান্তিবাণী প্রচার করিয়া স্বয়ং প্রশান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অহিংসা বাণী-প্রচার

অশোক ধর্মচর্চায় ও ধর্মপ্রচারে সমস্ত রাজশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং যে প্রজাপালক এবং রাজ্যশাসক সেই সত্য বিস্মৃত হন নাই। প্রজারঞ্জন ও প্রজার কল্যাণার্থ তিনি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রজার নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে অশোক 'ধর্মমহামাত্র' ও ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য 'বাহক' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রজাহিতার্থ তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাজ্যের সর্বত্র সতত নিবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একাধিক

ধর্ম মহামাত্র ও বাহক

রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মহারাজ অশোকের ন্যায় সমগ্র সৃষ্টজীব ও মানবের কল্যাণের জন্য রাজ-শক্তি নিয়োগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তাঁহার ধর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। স্বধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও অশোক পরধর্মের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন।

বিশ্বমৈত্রী স্থাপন

বিশ্ব-মানবের মৈত্রী ছিল অশোকের জীবনের প্রধান কামনা। কোটি কোটি মানবের ব্যাপক কল্যাণ কামনা অশোককে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবনে রাজকার্যের সঙ্গে ধর্মাচরণের সামঞ্জস্য অপরূপ মধুর। উপদেশ দান করিয়াই

রাজর্ষি অশোক

তিনি কর্তব্য শেষ করেন নাই, স্বয়ং সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়াছেন। সত্যই অশোক রাজা, অশোক ঋষি, অশোক রাজর্ষি।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অশোকের অত্যধিক শান্তিপ্রিয়তার ফলে ভারতে ক্ষাত্রধর্মের অপচয় হইয়াছিল এবং ভারতবাসী নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পরবর্তিকালে ভারতবর্ষ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এই অভিযোগের বিশেষ গুরুত্ব নাই। কারণ, বহু সামরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন রাজ্যই চিরন্তন হয় নাই। রাজ্যের উত্থান হয়, পতনও হয়; ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের বশেই তাঁহার পরবর্তী দুর্বল বংশধরগণ রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং অশোকের ধর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সম্বন্ধ অত্যন্ত পরোক্ষ।

মৌর্যযুগের শাসন-ব্যবস্থা: মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল রাজতান্ত্রিক; সম্রাট ছিলেন রাজ্যের সর্বাধিনায়ক। ভারতের ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সুব্যবস্থিত বিশাল রাষ্ট্র। চন্দ্রগুপ্তের আদর্শ ছিল রাজ্য জয়। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার পিতার রাজ্য সংরক্ষণ ও শাসন করিয়াছিলেন। অশোক রাজ্যজয়ের আদর্শ ত্যাগ করিয়া ধর্ম বিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সংগঠনে এবং শাসনে রাষ্ট্রাদর্শ পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্বপ্রধান শাসক, বিচারক ও সেনানায়ক। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতানুসারে কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। রাজা স্বয়ং স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত অষ্টপ্রহর রাজকার্য নির্বাহের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, কিন্তু অশোক স্বৈরাচারী ছিলেন না।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

রাজা মন্ত্রিন্ (প্রধান মন্ত্রী), পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ—এই চারিজন মন্ত্রিসমন্বিত একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি সমাহর্তা, সন্নিধাতা, প্রদেষ্টা ও দৌবারিক উপাধিধারী সচিব নিযুক্ত করিতেন। সমাহর্তা

রাজকোষ এবং আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যবস্থা করিতেন, সন্নিধাতা ভাণ্ডার এবং অস্ত্রশালার রক্ষক ছিলেন, প্রদেষ্টা রাজস্ব ও বিচারবিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন, দৌবারিক রাজ্যের উৎসব, শোভাযাত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বিভিন্ন বিভাগের জন্য অধিকর্তা বা অধ্যক্ষ নামক কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।
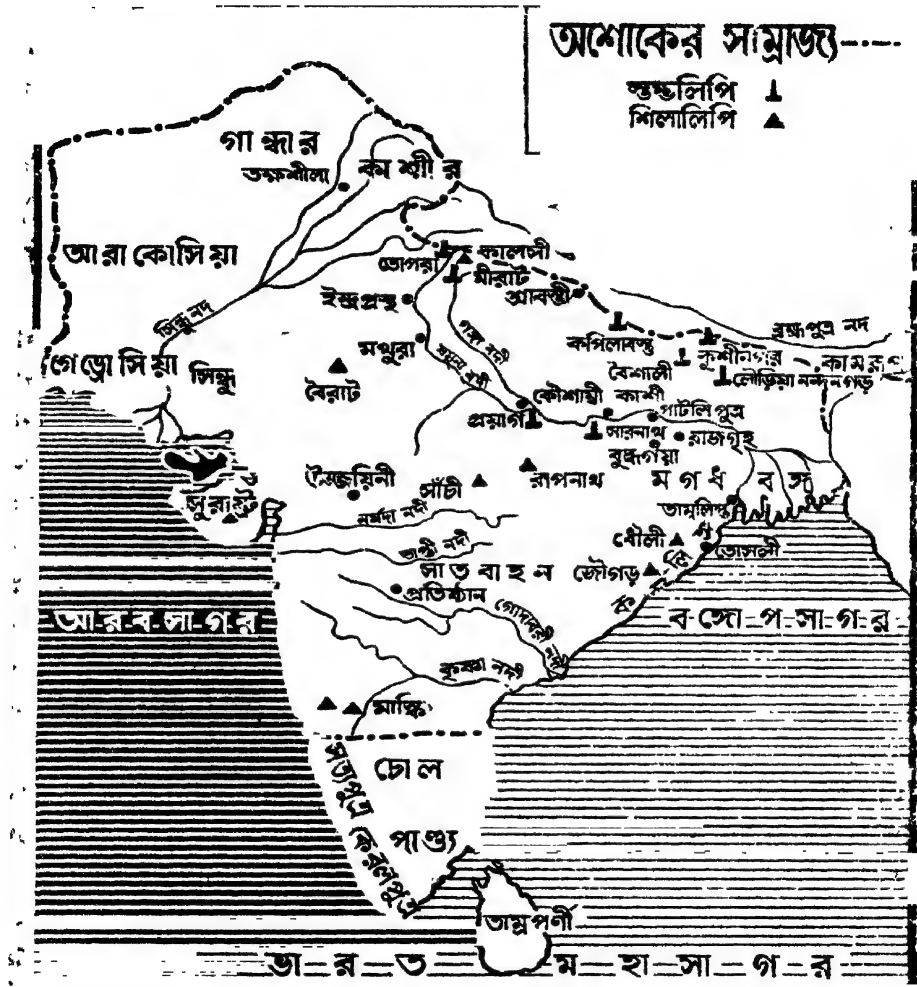
চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি কয়েকটি বিষয়ে (জেলা) বিভক্ত ছিল। এই প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তরাপথ (রাজধানী তক্ষশিলা), অবন্তী (রাজধানী উজ্জয়িনী), দাক্ষিণাত্য (রাজধানী সুবর্ণগিরি) ও মগধের (রাজধানী পাটলীপুত্র) উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট স্বয়ং রাজধানী পাটলীপুত্রের নিকটবর্তী অঞ্চল শাসন করিতেন। সাধারণত রাজকুমারগণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের উপাধি

ছিল কুমারামাত্য বা উপরাজ। আংশিক স্বাধীন জাতির উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অন্তপাল সীমান্তরক্ষী কর্মচারী ছিলেন। রাজা বিদেশে রাজদূত প্রেরণ করিতেন। সম্ভবতঃ দুর্গের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল কূটপাল বা কোটাল। নগরের বিচারক ছিলেন নগর ব্যবহারিক; গ্রামের ভার অর্পিত ছিল গ্রামণী নামক গ্রামের প্রধান ব্যক্তির হস্তে। গ্রামণীর নিযুক্তি রাজার অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। গ্রামের পঞ্চবৃদ্ধ বা পঞ্চায়েৎ গ্রামের ভূমিচাষ, ব্যবসা বাণিজ্য এবং জাতি ও সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেন। গোপ নামক কর্মচারীর উপর প্রতি-দশটি গ্রামের ভার ছিল। কয়েকজন গোপের উপরিস্থ কর্মচারী ছিলেন স্থানিক।

প্রাদেশিক শাসন

তাঁহার উপর রাজস্ব, শান্তিরক্ষা এবং স্থানীয় শাসনের ভার ছিল। এইজন্য গোপের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইত। তাঁহারা গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণের জন্ম, মৃত্যু ও সংখ্যা-তালিকা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা স্থানীয় মন্দির, বিপণি, পান্থনিবাস প্রভৃতির তত্ত্বাবধানও করিতেন।

গ্রাম্য শাসন

মৌর্য নগর-শাসন ও পৌরব্যবস্থা: মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মৌর্য রাজধানী পাটলীপুত্র গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ (শোণ) নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ নগর ছিল। পাটলীপুত্র ছিল নদীতীরের সমান্তরাল—দৈর্ঘ্যে প্রায় নয় মাইল, প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। পাটলীপুত্র সুগভীর পরিখা ও কাষ্ঠ-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মেগাস্থিনিসের মতে ইহা পারস্যের রাজধানী একবাটানা হইতেও সুন্দরতর ছিল। পাটলীপুত্র একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুশাসিত নগর ছিল। আধুনিক পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রায় ত্রিশ জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি পৌরসভার উপর পাটলীপুত্রের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। এই পৌরসভা পাঁচজন সভ্যসমন্বিত ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। কারুশিল্প পর্যবেক্ষণ, বৈদেশিকগণের তত্ত্বাবধান, নাগরিকগণের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা সংকলন, ব্যবসাবাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, বিক্রীত দ্রব্যের উপর এক-দশমাংস শুল্কগ্রহণ প্রভৃতি কর্মভার এক-একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। এই ছয়টি সমিতি উপরন্তু সম্মিলিতভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের পোতাশ্রয়, মন্দির প্রভৃতি সংরক্ষণ ও দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিত।

পাটলীপুত্রের গঠননৈপুণ্য

পৌরশাসন ব্যবস্থা

চন্দ্রগুপ্তের রাজস্ব বিভাগ অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল। সাধারণতঃ গোচারণ ও চাষভূমি, বন, খনি, সেচকর ও বিক্রয়কর হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইত। ভূমিকর ছিল শস্যের এক-চতুর্থাংশ, বিক্রয়-কর ছিল এক-দশমাংস। প্রান্তীয় শুল্ক, পথকর, প্রবেশকর, ব্যবসায়কর এবং বিচারালয়ের অর্থদণ্ড হইতে রাজকোষে অর্থাগম হইত। রাজা, রাজ-পরিবার, রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা

ব্যয়বহুল ছিল। সৈন্য, রাজদূত, গুপ্তচর ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন—মৃত সৈন্য ও কর্মচারীর পরিবারের বৃত্তি—দুর্গনির্মাণ, পথ নির্মাণ, সেচখনন, ধর্মসংস্থা পরিচালন প্রভৃতি ব্যাপারে রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। সাধারণ জিনিসের মূল্য রাজকর্মচারীরা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই যুগে রাজকীয় শিল্পশালার জন্য শ্রমদান বাধ্যতামূলক ছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থা

চন্দ্রগুপ্তের বিচার-বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। ধর্মশাস্ত্র, লৌকিক আচার এবং রাজার অনুশাসন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন হইত। প্রতিদিন প্রভাতে তিনজন বিচারক একসঙ্গে অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে তিনজন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণও উপস্থিত থাকিতেন। বিচারকালে বাদী-বিবাদীর প্রশ্ন, উত্তর-প্রত্যুত্তর এবং সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। প্রজার পুনর্বিচার প্রার্থনা করার অধিকারও ছিল। রাজার প্রতিনিধি সর্বদা বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়া বিচারের নামে অবিচার না হয়, তাহা লক্ষ্য করিতেন। জল, বিষ, অগ্নি ও দ্বৈরথ যুদ্ধ দ্বারা অনেক সময় বিবাদ মীমাংসা করা হইত। বিচারে শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ড, বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ এবং মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এই যুগের অপরাধের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ, পরদ্রব্য অপহরণ, বিষপ্রয়োগ, দ্রব্য-পরিমাপে শঠতা, মুদ্রা জাল, সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিচার ব্যবস্থা

চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যও সুবিশাল ছিল। সুতরাং সামরিক শক্তিই ছিল রাজ্যের ভিত্তি। চন্দ্রগুপ্তের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। সেনাবাহিনীতে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, নয় সহস্র হস্তী ও বহুসংখ্যক রথ ছিল। একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে তাঁহার একটি বিরাট নৌবাহিনীও ছিল। সামরিক বিভাগের ভার ত্রিশ জন সদস্য সমন্বিত একটি সভার উপর ন্যস্ত ছিল। এই সভা আবার পাঁচজন সভ্যবিশিষ্ট ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এই সমিতিগুলির উপর যথাক্রমে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী, হস্তী, নৌবাহিনী এবং রসদ ও যানবাহন-ব্যবস্থার ভার ছিল। সৈন্যগণ রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। সৈন্যদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয় সৈন্য, পার্বত্য সৈন্য এবং বেতনভোগী সৈন্যও ছিল। সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে শিবির, দুর্গ, পতাকা, পরিখা, প্রাচীর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তরবারি, খড়্গ, বাণ, বর্শা, তীর, কুঠার, গদা, অঙ্কুশ, বর্ম ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তচরদল সৈন্য বিভাগের অঙ্গ ছিল। সৈন্য ও পণ্য চলাচলের জন্য পাটলীপুত্রের সঙ্গে সংযোজিত বহু রাজপথ ছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

অশোক ধর্মানুরাগী হইলেও রাজকার্যে অবহেলা করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্মের মহামহিম আদর্শ তাঁহার বিশাল রাজ্যশাসনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ সাধনাই তাঁহার রাজ্যশাসনের প্রধান

লক্ষ্য ছিল। কলিঙ্গ শিলালিপিতে তিনি ঘোষণা করেন—'প্রজাগণ আমার সন্তানতুল্য, তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনই আমার কাম্য।'

অশোকের শাসন-ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব

অশোক দিবারাত্রের কোন সময়েই রাজকার্য সংক্রান্ত সংবাদ শ্রবণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সময়ে দণ্ডবিধির কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। রাজকর্মচারিগণের সময়ানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। অশোকের সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—মগধ, উত্তরাপথ, অবন্তী, দক্ষিণাপথ ও কলিঙ্গ। অশোক কলিঙ্গ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। **রাজুক** উপাধিধারী কর্মচারিগণ ভূমি পরিমাপ ও রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। **প্রাদেশিক** নামক কর্মচারিগণ ছিলেন রাজস্ব সংগ্রাহক ও দণ্ডনীয় অপরাধের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **যুক্ত** বা **যুতগণ** ছিলেন নিম্নতম কর্মচারী; তাঁহারা অন্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সহকারীর কার্য করিতেন। এই সকল কর্মচারী শাসন সংক্রান্ত কার্যের সঙ্গে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্য পরিদর্শন এবং ধর্মের অনুশাসন প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। অশোক **ধর্মমহামাত্র** নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ধর্মপ্রচার ও বিচারকার্য তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। **প্রতিবেদকগণ** অন্যান্য রাজকর্মচারীদের কার্য পরিদর্শন করিয়া রাজধানীতে মহারাজ অশোককে সংবাদ প্রদান করিতেন। মহারাজ অশোকের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মের স্পর্শ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় ছিল।

মৌর্য যুগের সমাজ: চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎসায়নের কামশাস্ত্র এবং গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে মৌর্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র কল্পনা করা যায়। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের অধিবাসিগণ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণ), (২) অমাত্য (রাজকর্মচারী), (৩) প্রতিবেদক (সংবাদ সাংগ্রাহক বা চর), (৪) সৈনিক, (৫) কৃষক, (৬) মৃগয়াজীবী ও পশুপালক, (৭) শিল্পী ও বণিক। মেগাস্থিনিস জীবিকা বা বৃত্তিকেই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি

মেগাস্থিনিসের শ্রেণীবিভাগ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের উল্লেখ না করিয়া বৃত্তিমূলক শ্রেণীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় মৌর্যযুগে শিল্প, কলা, বাণিজ্য, কৃষি এত সমৃদ্ধ ছিল এবং এত অধিকসংখ্যক লোক সমাজ ও রাজ্যের নানা কার্যে নিযুক্ত ছিল যে, স্বভাবতঃই সমাজ-ব্যবস্থার বৃত্তিমূলক দিকটাই বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রেষ্ঠী, বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ই সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিত। শ্রেষ্ঠী ও বণিকগণ বৌদ্ধবিহার ও জৈনমন্দিরে বিশাল ভূসম্পত্তি ও প্রভূত অর্থ দান করিয়া ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকের পাথেয় অর্জন করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে মৌর্যযুগের শেষার্ধে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রায়

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং বৈশ্য বা শূদ্র-কন্যার পরিবেশিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যে কোন মানুষের বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিবার অধিকার ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই বৌদ্ধ মঠ-জীবন গ্রহণ করিয়া জাতিভেদ পরিত্যাগ করিত। বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং জৈন শ্রাবক জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না ; স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে তাঁহারা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও সমাজসেবা করিতেন।

জাতিভেদ-বিলুপ্তি

মৌর্যযুগে শিক্ষা ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। সংস্কৃতি-বিহীন ধনী ব্যক্তি সুধী সমাজে ব্যঙ্গের পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজ চতুরাশ্রম প্রথা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত। নানা কলা ও বিদ্যা পারদর্শিনী বহু সুশিক্ষিতা নারীর কাহিনী সমসাময়িক বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁহারা লোকালয়ে আগমন করিয়া সেবিকা ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। তক্ষশীলা ছিল সমসাময়িক এশিয়ার শিক্ষালয়। বিম্বিসারের পুত্র জীবক, বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি এবং মৌর্যগুরু চাণক্য তক্ষশীলায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিল্প, যন্ত্র, খনি, ধাতু সম্বন্ধীয় নানা বিদ্যা যথেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তবে ঐ সমস্ত বিদ্যা বিভিন্ন পরিবার, শ্রেণী অথবা গোষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেকটি শ্রেণীর মুখ্যব্যক্তি 'মণ্ডলপতি' নামে অভিহিত হইত। মণ্ডলপতির যন্ত্রাগারে বা কর্মশালায় শিল্পশিক্ষার্থীর প্রারম্ভজীবন অথবা শিক্ষাকাল অতিবাহিত হইত। শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে এবং শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিলে তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা কারবার অধিকার লাভ করিত, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ শ্রেণীর নিয়ম ও অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে পারিত না। নগরের শ্রেষ্ঠী ও বণিকগণ যন্ত্র, খনি ও ধাতু-ব্যবসায়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। শিল্পিগণ যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণের জন্য রাজকোষ হইতে নিয়মিত বেতন পাইত। কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্ধারিত ছিল। নদনদীর বহুলতা ও বৃষ্টির প্রাচুর্যহেতু দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ বিরল ছিল।

সমাজ ও শিক্ষা

শিল্প

চিকিৎসাবিদ্যা বৌদ্ধযুগে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাহারা চিকিৎসাশাস্ত্র, ভেষজ-বিজ্ঞান, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনগণ জীবজন্তু সেবার জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিত এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত। মহারাজ অশোক দেশ-বিদেশে মানুষ ও পশু-পক্ষীর কল্যাণার্থে বহু রাজকীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসক ও সেবাময়ী শুশ্রূষাকারিণীর অবস্থিতি হেতুই মহারাজ অশোকের পক্ষে দেশবিদেশে জীব-কল্যাণব্রত প্রচার করা সম্ভব হইয়াছিল।

চিকিৎসা ও সেবা

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীর সৎস্বভাব এবং সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছেন। জনগণ পরস্পর বিশ্বাসপরায়ণ ছিল বলিয়া সহজে কলহ-বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত হইত না। দস্যু-তস্করের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল না। সমাজে কৃষকদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। যুদ্ধকালেও কৃষকের শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইত না। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজকর নির্ধারিত ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের জন্য বিভিন্ন পল্লী নির্দিষ্ট ছিল। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। যজ্ঞকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মদ্যপান গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভারতবাসীর চরিত্র

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন "ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথা ছিল না"--এই উক্তি আংশিক সত্য। সম্ভবতঃ তাঁহার স্বদেশ গ্রীসে প্রচলিত দাসত্বপ্রথার অনুরূপ কঠোরতা এই দেশে ছিল না বলিয়া গ্রীক রাজদূত তুলনামূলক ভাবেই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

মৌর্যযুগে ভারতীয় নাগরিক জীবনঃ মৌর্যযুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শঃ নগরে বাস করিতেন। নগরের গৃহগুলি ফলবান বৃক্ষ ও পুষ্পময় উদ্যানশোভিত থাকিত। পুষ্করিণী ও উদ্যান গৃহবাটিকার অন্যতম অংশ ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চন্দ্রালোক উপভোগের জন্য উদ্যানে বেদী রচিত হইত। বিশ্রাম ও উৎসবের উদ্দেশ্যে পুষ্পবীথির ব্যবস্থা ছিল। গৃহপ্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে গজদন্ত নির্মিত বিভিন্ন আকারের বলয়াধারের (ব্র্যাকেট) ব্যবস্থা থাকিত। বলয়াধারের উপর বাদ্যযন্ত্র, চিত্রাধার ও প্রসাধন সামগ্রী রক্ষিত হইত। গৃহতল কারুকার্য খচিত আস্তরণ দ্বারা আবৃত থাকিত। পুষ্পমাল্যশোভিত গৃহগুলি নগরের শোভাবৃদ্ধি করিত। অলিন্দে রক্ষিত প্রিয় পশুপক্ষীর নয়নতৃপ্তিকর রূপ এবং উহাদের শ্রবণতৃপ্তিকর কূজন গৃহপতি এবং অতিথির নয়ন ও শ্রবণ তৃপ্ত করিত।

নাগরিক পরিবেশ

নারীর বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধন মনোরম ছিল। নারীর দেহ চন্দনাদি অনুলেপ দ্বারা অনুলিপ্ত হইত। অঞ্জনরেখা নারীর নয়ন অনুরঞ্জিত করিত। পুরুষ হস্তে বালা, কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিত। বিভিন্ন বর্ণশোভিত পরিচ্ছদ পুরুষ ও নারীর অঙ্গ শোভিত করিত। লোকচক্ষে সাধারণতঃ পরিচ্ছদের তুলাদণ্ডে মানুষের আভিজাত্য নির্ণীত হইত।

নারীর বেশভূষা

অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে মাংসাহার, মধু (তরল সুরা) পান, আসব (শুষ্ক সুরাচূর্ণ) জনপ্রিয় ছিল। প্রকাশ্য বিপণীতে সুরা বিক্রয়-ব্যবস্থা রাজকীয় বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই সমস্ত বিধান হইতে জনসাধারণের সুরাসক্তি অনুমান করা যায়। সাধারণ ভারতবাসী উৎসবপ্রিয় ছিল। ঋতুতে ঋতুতে উৎসব ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অঙ্গ ছিল। অভিনয়, নৃত্যগীত, পশুপক্ষীর যুদ্ধ, অক্ষ ও দ্যূতক্রীড়া অভিজাত জীবনের অংশ ছিল। বসন্তোৎসব, নববর্ষ, দীপাবলি প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব বিভিন্ন ঋতুতে অতি সমারোহে অনুষ্ঠিত

অভিজাতশ্রেণীর জীবন

হইত। নারীদের মধ্যে কন্দুক ক্রীড়া ও অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ আছে। নৌকা-বিহার, সন্তরণ, ধনুর্বিদ্যা পুরুষদের উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল।

মৌর্যযুগে ভারতীয় সমাজ-জীবন সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত ছিল। ভারতবাসী ইহলোক ও পরলোককে সুসমঞ্জস করিয়া জীবনযাত্রানির্বাহের চেষ্টা করিত। তাহারা ঋষি-প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত। পারিবারিক জীবনে তাহারা কতকগুলি আদর্শ অনুসরণ করিত। মৌর্যযুগে

নূতন দেবতা

অনেকগুলি নূতন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে বাসুদেবের উল্লেখ আছে ; কৃষ্ণ-বলরামের অর্চনা মৌর্যযুগে অজ্ঞাত ছিল না। স্কন্দ ছিলেন মৌর্যযুগের অন্যতম প্রধান দেবতা। শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা মৌর্যসমাজে জনপ্রিয় ছিলেন। তখনও বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের পূজা আরম্ভ হয় নাই।

মৌর্যশিল্প ঃ মৌর্যযুগে ভারতে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক পরিকল্পিত সুদর্শন সেচ-যন্ত্র ভারতের ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। পাটলীপুত্র নগরে কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ, পথ, উদ্যান এবং পয়ঃপ্রণালী বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট ও বিস্মিত করিত। নন্দনগড়, লুম্বিনী, পাটলীপুত্র, সারনাথ, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, বরাবর, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানে মহারাজ অশোকের বহু স্তূপ ও স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালবিজয়ী শিলা-স্তম্ভগুলি এত সুন্দর ও মসৃণ এবং স্তম্ভশীর্ষে পশুর মূর্তিগুলি এত জীবন্ত যে, সুদীর্ঘ দুই সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধানেও উহাদের শিল্পনৈপুণ্য অদ্যাপি মানুষকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। এইগুলি মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। সারনাথের সিংহস্তম্ভ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতীক রূপে গৃহীত হইয়াছে। মহারাজ অশোকের আনুকূল্যে ও উৎসাহে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর এবং নেপালের অন্তর্গত দেবপত্তন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীনগর সত্যই শ্রী বা সৌন্দর্যের নগর, দেবপত্তন সত্যই দেবতার পত্তন বা আবাস। অশোকের আবেষ্টনী নির্বাচন অপূর্ব।
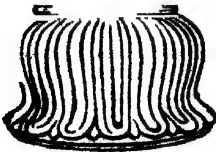
অশোক স্তম্ভ

মৌর্যযুগে গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে আজীবিক গুহা নির্মিত হয়। এই গুহাগাত্রে নানাপ্রকার চিত্র ক্ষোদিত ছিল। পরবর্তিকালে আজীবিক গুহাচিত্রের অনুকরণে অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। মহারাজ অশোকের অর্থানুকূল্যে তন্ত্রাচারী আজীবিকদের জন্য বরাবর পর্বতগুহা নূতনভাবে পরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

মৌর্য শিল্প ও স্থাপত্যে পারসীক প্রভাব: মহারাজ অশোক পিতামহের কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদের পরিবর্তে পাটলীপুত্রে প্রস্তরময় প্রসাদ
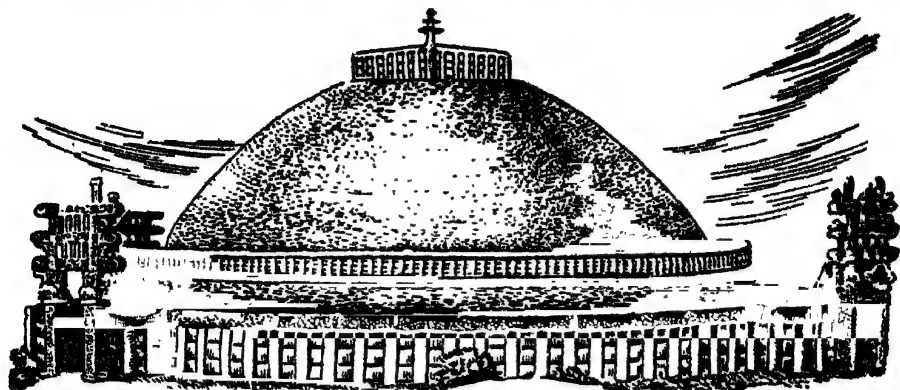
সাঁচীস্তূপ

নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন্ মার্শালের মতে মহারাজ অশোকের রাজপ্রাসাদ আকামেনীয় রাজপ্রাসাদের অনুকরণে পরিকল্পিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, সারনাথের প্রাসাদ ও ঘণ্টাকৃতি রাজপুরী পারস্যের অন্তর্গত বহিস্তানের শিলাক্ষোদিত প্রাসাদের অনুকরণেই নির্মিত হইয়াছিল। বিখ্যাত ফরাসী স্থাপত্যবিশারদ মসিয়েঁ স্পেনহার্তও বলেন যে, মৌর্যযুগের স্তম্ভগুলি পারস্যের রাজধানী পারসিপোলিসের প্রাসাদ-স্তম্ভেরই অনুকরণ এবং অশোকের শিল্পিগণও প্রস্তর-মসৃণায়ন ব্যাপারে পারসিপোলিসের প্রস্তর-শিল্পীদের রীতি অনুসরণ করিয়াছিল। তাঁহার মতে, সারনাথের জীবন্ত সিংহমূর্তির মধ্যে গ্রীক শিল্পাদর্শের সঙ্গে ইরাণীয় শিল্পের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে মৌর্যশিল্প অভূতপূর্ব সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। মার্শালের মতে মৌর্য শিল্পের আদর্শ পারসীক-গ্রীক; নিপুণ ভারতীয় শিল্পিগণ ঐ আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ভারতায়িত করিয়াছে। ভারতীয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক সমালোচক কে, এম, পানিক্কার বলেন---ইওরোপীয় সমালোচকদের ধারণা আছে যে, ভারতের যাহা কিছু শ্লাঘনীয় সম্পদ, উহা সকলই গ্রীস, রোম প্রভৃতি বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ অথবা উহাদের সংস্পর্শজাত। বাস্তুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর তারাপদ বলেন, "অশোকস্তম্ভের পরিকল্পনার মধ্যে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব ছিল না।" স্থাপত্যবিশারদ শ্রীশচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দেবায়তন'-এ বলিয়াছেন—"অশোক-প্রবর্তিত বৌদ্ধ-স্থাপত্য প্রকৃতপক্ষে আর্য, নাগ ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ।"

মৌর্য রাজপুরী

শ্রীশচন্দ্র বৈদিক যুগ হইতে মৌর্যযুগ পর্যন্ত ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পধারা বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'পূর্বভারতীয় শিল্পে পশ্চিমের উল্লেখযোগ্য

কোন প্রভাব ছিল না, বরং ভারতের শিল্পরীতি মধ্যএশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পারস্য ছিল অশোকের রাজধানী হইতে বহু দূরে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে পারস্যের সহিত ভারতের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কোন যোগাযোগ ছিল না ; অশোক পারস্যে কোন ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন নাই। সুতরাং পারস্য-শিল্পধারা অশোকের স্থাপত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করা যায় না। দুইটি একই প্রকার জিনিস প্রত্যক্ষ করিলেই একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে মনে করা সর্বথা যুক্তিবহ নহে। গ্রন্থকার স্বয়ং পারসিপোলিসের ডেরিয়াসের প্রাসাদ ও মন্দির দর্শন করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন যে, সম্ভবতঃ পারসীক শিল্পী মৌর্য প্রাসাদ ও নগর নির্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

মৌর্যযুগে ভারতের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক ঃ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কাহারো মতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকবীরের নিকট হইতে রণকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই উক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ অনুমান সাপেক্ষ। গ্রীক বীর সেলুকসের সহিত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেলুকস পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেলুকস একজন গ্রীকদূত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূতই বিখ্যাত মেগাস্থিনিস। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজসভায় অবস্থানকালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানি তথ্যমূলক বিবরণী রচনা করেন, উহার নাম 'ইণ্ডিকা'। পূরবর্তী কালে গ্রীক লেখকগণ ইণ্ডিকা হইতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বহু সংবাদ বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরবর্তী কালে গ্রীস ও ভারতের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া মনে করা যায়; কারণ, সিরিয়ার গ্রীক নরপতি ডৈইমেকাস নামক একজন দূতকে মহারাজ বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশরের রাজা টলেমীও বিন্দুসারের রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মিশরের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, বিন্দুসার গ্রীকরাজ এ্যান্টিওকস্-এর নিকট একখানি পত্রে মূল্যের বিনিময়ে কিয়ৎ পরিমাণ সুরা, ডুমুর এবং এক জন দার্শনিক প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। এ্যান্টিওকস্ সুরা ও ডুমুর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, পণ্য বিনিময় করিলেও গ্রীকরাজ দার্শনিক বিক্রয় করেন না।

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার অধিপতি এ্যাণ্টওকস্থিয়স, ম্যাসিডনের অধিপতি এ্যান্টিগোনাস গোনেটাস, এপিরাস বা কোরিন্থের অধিপতি আলেকজাণ্ডার এবং মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল-ফাসের নিকট ভারতীয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মানবকল্যাণ উদ্দেশ্যে সেই সব রাজ্যে ভারত সম্রাট নিজ ব্যয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে অশোক বহির্ভারতে ব্রহ্মদেশে শোন ও উত্তর নামক দুইজন প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা সংঘামিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিংহলরাজ তিস্‌স্‌ মৌর্য রাজকুমার মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎস্থল অনুরাধাপুরের অদূরে একটি বিরাট স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সিংহলে অদ্যাপি সেই স্তূপ একটি বৌদ্ধতীর্থস্থান।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন: সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২০৩ অব্দে অশোক পরলোক গমন করেন। অশোকের সময়েই মৌর্য সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি এবং আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের স্বপ্ন এবং নব **মহাভারত** সৃষ্টির পরিকল্পনা সফল হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই এই বিশাল সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। কারণ, তাঁহার এক পুত্র কাশ্মীরের ও অন্য পুত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোকের পরবর্তী রাজগণের যথার্থ বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার কয়েক জন পুত্র ও পৌত্রের নাম পাওয়া যায়। সম্প্রতি নামে অশোকের এক পৌত্র জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গার্গ্যসংহিতা হইতে জানা যায় যে, অশোকের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ অক্ষম, অধার্মিক ও অত্যাচারী ছিলেন। অনেকের মতে মৌর্য সাম্রাজ্য বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাম্রাজ্যের ঐক্য ও শক্তি নষ্ট হইল। অশোকের সময় মগধের সামরিক শক্তি বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় ক্ষীণধার হইয়া পড়িয়াছিল, তবে নষ্ট হয় নাই, অবশ্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভারতবর্ষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন নাই। মৌর্যশক্তির এই দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন ও কলিঙ্গের চেতবংশীয় রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আবার পশ্চিম দিক হইতে বাহ্লীক (ব্যাক্‌ট্রিয়া) দেশের গ্রীক রাজগণ নূতন উৎসাহে বারংবার মৌর্যসাম্রাজ্য আক্রমণ আরম্ভ করেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে মৌর্যবংশের দশম বা শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে সৈন্য পরিদর্শনকালে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশোকের অহিংস নীতির সঙ্গে মৌর্যবংশের পতনের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কোন দেশে কোন রাজ্য সর্বাধিক সামরিক আয়োজন সত্ত্বেও চিরস্থায়ী হয় নাই। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়াছেলেন। রাজ্যের উত্থান হয়, রাজ্যের পতনও হয়—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সেই স্বাভাবিক নিয়মেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল। আত্মকলহ, অযোগ্যতা এবং শুঙ্গশক্তির উত্থানই মৌর্য-বংশের পতনের মুখ্য কারণ।

(১) অশোকের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতা

(২) দীর্ঘকাল অব্যবহারে সামরিক শক্তি হ্রাস

(৩) দাক্ষিণাত্যে নূতন রাজশক্তি

ভারতের ইতিহাসে মৌর্যযুগের দানঃ মৌর্যযুগের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়—ঘটনার স্পষ্টতা এবং উপাদানের বহুলতা। বৈদিক বা মহাকাব্যের যুগের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বন—সাহিত্য, কিংবদন্তি এবং তথ্যাশ্রিত ধর্মের বিশ্লেষণ। কিন্তু মৌর্যযুগে উপনীত হইলে অস্পষ্টতার যবনিকা অপসৃত হইয়া যায়। দেশী-বিদেশী বহু উপাদান মৌর্য ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, একটি বিরাট শক্তিশালী রাজবংশ পুরুষানুক্রমিক ধারায় দুই শতাধিক বৎসর রাজ্য পরিচালনা করিতেছে।

শক্তিশালী রাজবংশ

ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতের প্রান্তদেশ হইতে বিদেশী গ্রীক-সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়া সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। তারপর মৌর্য সম্রাটগণ এক বিরাট একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে শান্তি ও সুশাসনের ছায়াতলে আশ্রয়দান করিয়াছেন। সেই যুগের রাষ্ট্রনীতির পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারতীয় দক্ষতার বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপির মধ্যে দেখিতে পাই মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সুস্পষ্ট নির্দেশ, প্রজার মঙ্গলার্থ রাজার সদাজাগ্রত দৃষ্টির পরিচয়। মৌর্যরাজ্যের কীর্তির মধ্যে রহিয়াছে অতীত যুগের চিরাচরিত রাজ্যবিজয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের প্রয়াস। কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাই—মুণ্ডিত-কেশ পীতবাস-পরিহিত বৌদ্ধ শ্রমণ দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-নদী অতিক্রম করিয়া ভারতের বাহিরে পুণ্যশ্লোক ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণীপ্রচার মানসে চলিয়াছেন।

প্রজার কল্যাণ-প্রচেষ্টা

তাঁহারা ছিলেন যুগ-যুগব্যাপী ভারতীয় চিন্তা ও ধর্মের মূর্ত প্রতীক। অশোকের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সৈন্যাবাসে যুদ্ধবাদ্য বা সমরসংগীত আকাশকে মুখরিত করিত না।

ধর্মবিজয়

মৌর্যযুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের অপরূপ সম্মেলন হইয়াছিল। মহারাজ অশোকের একহস্তে ছিল সুদৃঢ় রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে ছিল মানবের কল্যাণে অকৃপণ আশীর্বাদ। একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে একজন মাত্র মানুষের চেষ্টায় যে কত বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করা সম্ভব, তাহার অপূর্ব নিদর্শন অশোকের জীবনে সার্থক হইয়াছে। বিনা রক্তপাতে এই প্রকার ধর্মবিজয়ের সাফল্য ভারতের পুণ্যভূমিতেই সম্ভব। আশোকের দৃষ্টি যে একমাত্র প্রজার কল্যাণে অথবা বিশ্ববাসী মানবের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল তাহা নহে; তিনি পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গিরিনদী প্রভৃতি সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র অনুভব করিতেন। সেইজন্য বিশ্বমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই অশোক পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন মহারাজ অশোকের মহানুভবতা বিশ্বের সম্পদ।

বিশ্বকল্যাণ কামনা

রাষ্ট্রের, সমাজের ও ধর্মের ঐক্যসাধনের জন্য পালি ভাষায় পর্বতগাত্রে,

পাষাণফলকে তথাগতের উপদেশ উৎকীর্ণ করিয়া অশোক যুগোপযোগী লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অশোকের সেই বিরাট কীর্তি দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধানে আজিও অমলিন রহিয়াছে। রাষ্ট্রে ঐক্য, শাসনে কুশলতা, সমাজে সংহতি, ধর্মে উদারতা, শিক্ষায় সর্বজনীনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বপ্রেম মৌর্য রাজবংশকে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। এই অক্ষয় কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে "ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি"—হয় নাই, হইবে না।

জাতীয় ঐক্য

অনুশীলনী

১। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর।
(Describe the story of Alexander's Indian invasion and its results.)

২। চন্দ্রগুপ্তের জীবন-কাহিনী ও শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
(Trace the career of Chandragupta Maurya and describe his administration.)

৩। অশোকের জীবনী, কার্যাবলী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
(Give in short the story of Asoka's life and give a catalogue of his religious activities.)

৪। অশোকের স্বদেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কার্যাবলীর বিবরণ দাও।
(Describe the activities of Asoka in India and in foreign lands.)

৫। বিশ্বের ইতিহাসে অশোকের স্থান নিরূপণ কর।
(Assess the place of Asoka in World-History.)

৬। মৌর্যযুগের শাসন-প্রণালী বর্ণনা কর ও অশোকের রাষ্ট্রশাসনাদর্শের বিবরণ দাও।
(Give a pen-picture of Maurya administration. What was the principle of administration of Asoka?)

৭। মৌর্যযুগের সমাজ, সভ্যতা ও শিল্পের বিবরণ লিখ।
(Give a short sketch of society, culture and art of the Maurya period.)

৮। ভারত-ইতিহাসে মৌর্যযুগের দান আলোচনা কর।
(Give a short resume of Maurya contribution to Indian life and culture.)

৯। মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণী লিখ।
(Describe India in light of Megasthinis.)

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) দারায়ুস, (খ) অজাতশত্রু, (গ) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।
(Write short notes on: (a) Darius (b) Ajatasatru (c) Kautilya's Arthasastra.)

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণ ঃ সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়

(১৮৫ খ্রীঃ পূঃ—৩২০ খ্রীষ্টাব্দ)

অধ্যায় পরিচয় ঃ মৌর্য যুগের অবসান হইতে গুপ্তযুগের আরম্ভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এই সময়ে পূর্বভারতে শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ, কলিঙ্গে চেতবংশ এবং দক্ষিণ ও মধ্যভারতে সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। বহিরাগত ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, পার্থিয়ান (পহ্লব), শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কয়েকটি অঞ্চল জয় করিয়া বৈদেশিক রাজ্য স্থাপন ও বসতি বিস্তার করিয়াছিল। কালক্রমে এই সমস্ত বহিরাগত জাতি ভারতের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সংঘাতে বৈদিক ধর্মের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন সূচিত হইল। কালক্রমে এই তিন ধর্মের অভ্যন্তরে একটা সামঞ্জস্যের ভাবও দেখা দিল। এই যুগেই ভারতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মের উত্তরাধিকারিরূপে ভারতীয় মন ও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈদেশিক জাতিগুলির সংস্পর্শে ও সংঘাতে ভারতীয় চিন্তা, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিচিত্র সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে প্রথমে সংঘাত, পরে সমন্বয় মৌর্যোত্তর যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগের ভারতবর্ষে এই সমন্বয়ী ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

মগধের শুঙ্গ (আঃ ১৮৫-৭৩ খ্রীঃপূঃ) ও কাণ্ববংশ (৭৩-২৮ খ্রীঃ পূঃ)

পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজ্যলাভ ঃ শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রজাত ব্রাহ্মণসন্তান পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। পুষ্যমিত্র তাঁহার প্রভু বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। শুঙ্গবংশের দশ জন রাজা মোট একশত বার বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের আখ্যান হইতে জানা যায় যে, যবন অর্থাৎ গ্রীকগণ সাকেত (অযোধ্যা) অধিকার করিয়া পাটলীপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র গ্রীকবাহিনীকে পর্যুদস্ত ও প্রতিহত করেন।

স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিজয় গৌরব ঘোষণার জন্ত পুষ্যমিত্র দুই বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে বর্ণিত আছে যে, পুষ্যমিত্রের যজ্ঞাশ্বের গতি গ্রীকগণ সিন্ধুনদের দক্ষিণতটে প্রতিরোধ করিয়াছিল। ফলে গ্রীক ও শুঙ্গবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র গ্রীক বাহিনীকে পরাভূত করিয়া যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার করেন ও গ্রীক বাহিনীকে সিন্ধুর অপর তীরে বিতাড়িত করেন। মহারাজ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বৈয়াকরণ পতঞ্জলি।

পুষ্যমিত্র

পুষ্যমিত্রের কৃতিত্ব : দুর্বল মৌর্য রাজত্বের অবসান করিয়া পূর্বে মগধ, দক্ষিণে নর্মদা ও পশ্চিমে বিপাশা পর্যন্ত বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন পুষ্যমিত্রের কীর্তি। গ্রীকবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণ তাঁহার গৌরব; ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও পুষ্যমিত্র ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নববৃত্তি সার্থক করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহার সামরিক গৌরব এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি প্রমাণ করে। বৈয়াকরণ পতঞ্জলিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া পুষ্যমিত্র গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলিয়া কটূক্তি করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শুঙ্গ বংশের নির্মিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ শিলালিপি এই উক্তির পরিপন্থী।

অগ্নিমিত্র ও তাঁহার বংশধরগণ : অগ্নিমিত্র পিতার জীবদ্দশায় সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার রাজত্বকালে বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনকে পরাজিত করেন। অগ্নিমিত্রের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রচনা করেন। বিখ্যাত নরপতি না হইলে মহাকবি কালিদাস অগ্নিমিত্রকে তাঁহার নাটকের নায়করূপে গ্রহণ করিতেন না। অগ্নিমিত্রের পরে তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠমিত্র ও বসুমিত্র রাজ্যলাভ করেন। পিতামহ পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ বসুমিত্রের সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। বেসনগরের শিলালিপিতে শুঙ্গ বংশীয় ভদ্রক বা ভাগভদ্র নামক একজন নরপতির নাম উল্লিখিত আছে। তক্ষশীলার গ্রীক অধিপতি অন্তলিকিত তাঁহার রাজসভা বিদিশা নগরে হেলিওডোরাস নামক একজন গ্রীক দূত প্রেরণ করেন। অবশ্য পরবর্তী শুঙ্গ নরপতিগণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। অগ্নিমিত্রের পরে আটজন রাজা পর পর স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্ব করেন। এই দ্রুত রাজা পরিবর্তন শুঙ্গ রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা প্রমাণ করে। আনুমানিক ৭৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শুঙ্গবংশের দশম রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব কান্ব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

শুঙ্গ যুগের সভ্যতা : শুঙ্গরাজগণ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। এই বংশের

উপাধি ছিল মিত্র (মিত্র = সূর্য)   কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আরম্ভে এই বংশ মিত্র বা সূর্য উপাসক ছিল। এই সময় ভাগবত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গ্রীক দূত হেলিওডোরাস বেসনগরে ভগবান বাসুদেবের সম্মানার্থ একটি গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করিয়া ভাগবত ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান শুঙ্গবংশের হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রমাণ করে। শুঙ্গরাজগণ ধর্মে উদার ছিলেন, নচেৎ অ-বৌদ্ধ শুঙ্গযুগে বৌদ্ধশিল্প এত বেশী প্রসার লাভ করিতে পারিত না। মধ্য ভারতের ভারহুত নামক স্থানের স্তূপ শুঙ্গযুগের শিল্পোন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিরা শুঙ্গযুগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ পতঞ্জলি ছিলেন পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত। পুষ্যমিত্র ছিলেন পতঞ্জলির পৃষ্ঠপোষক। বাস্তবিক পক্ষে মৌর্যযুগে রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইলেও বৈদিক হিন্দুধর্ম বিলীন হইয়া যায় নাই—ম্রিয়মাণ হইয়াছিল মাত্র। শুঙ্গযুগে বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বৈদিক ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি প্রমাণ করে।

কাণ্ব বংশ (৭৩-২৮ খ্রীঃ পূঃ) ঃ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বাসুদেব এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চারিজন কাণ্ববংশীয় নরপতি মগধে ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম বাসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্মণ। কাণ্বগণ মগধে রাজত্ব করার সময় শুঙ্গবংশীয় কোন নরপতি বিদর্ভ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক মগধের কাণ্ব এবং বিদর্ভের শুঙ্গবংশ বিলোপ করেন।

সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ

অশোকের মৃত্যুর পর সাতবাহন রাজগণ কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যকায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পুরাণে এই রাজবংশকে **অন্ধ্র** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা তামিল ও তেলেগু ভাষা-ভাষী। এই বংশের ত্রিশজন নরপতি আনুমানিক সার্ধ তিন শত বৎসর কিংবা মতান্তরে সার্ধ চারি শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক। গোদাবরীর তীরস্থিত প্রতিষ্ঠান (আওরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত পৈঠান) নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

এই বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি প্রথম শাতকর্ণি। তিনি সম্ভবতঃ মালব জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং 'দক্ষিণাপথ-পতি' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাতবাহন সাম্রাজ্যের কিয়দংশ শকগণ কর্তৃক বিজিত হয়।

সাতবাহান বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শক, যবন (গ্রীক), পহ্লব (পার্থিয়ান) প্রভৃতি

বৈদেশিক জাতিকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্য এবং বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষজীবনে তিনি শক নরপতি রুদ্রদামনের হস্তে পরাজিত হন। ব্রাহ্মণ হইলেও সম্ভবতঃ স্বীয় পুত্র পুলমায়ির সহিত অব্রাহ্মণ অ-ভারতীয় রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও দুই বংশের বিরোধের অবসান হইল না। পুলমায়ি কৃষ্ণা ও গোদবরীর সংগমস্থল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠ সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি

সাতবাহন বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজার নাম যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই বংশের পতন হয় এবং সাতবাহন বংশের বিভিন্ন অংশে —কদম্বগণ উত্তর কানাড়ায়, বাকাটকগণ নাসিক ও বেরারে, পহ্লবগণ কাঞ্চিতে, শালংকায়ণগণ কৃষ্ণা ও পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিল।

সাতবাহন বংশের পতন

সাতবাহন রাজগণ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহাদের রাজ্যে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাই প্রচলিত ছিল। সাতবাহন বংশের পরাক্রমেই বৈদেশিক জাতিসমূহ উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী প্রভাব বা বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। এই বংশের রাজাদের গৌতমীপুত্র, বাসিষ্টীপুত্র ইত্যাদি নাম প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান ঃ শুঙ্গ ও কাম্বযুগে বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই পুনরুত্থানের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের নব রূপায়ণও হইয়াছিল। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতিরও সংস্পর্শ ছিল। এই নব রূপায়িত বৈদিক ধর্ম সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম নামে বর্তমান সমাজে ও ইতিহাসে পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে বৈদিক বা হিন্দুধর্মের কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাতা নাই—যেমন আছেন ইহুদীধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মূসা, বৌদ্ধধর্মের গৌতম বুদ্ধ, জৈনধর্মের বর্ধমান মহাবীর, অগ্নি উপাসক ইরাণীয় ধর্মের জরথুষ্ট্র, খ্রীষ্টান ধর্মের যীশু এবং ইসলাম ধর্মের মুহম্মদ। কেহ কেহ মনে করেন যে, কৃষ্ণকায় ব্যাস নামক একজন অনার্যমাতার সন্তান সুদীর্ঘকাল ব্যাপী আর্য ঋষিগণের ধ্যান ও জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত সত্যগুলিকে বেদ বা জ্ঞানরূপে সংকলন করিয়াছিলেন এবং বেদোক্ত জ্ঞানরাশিকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বেদকে ব্যাস বা বিভাগের জন্য তিনি 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত হইয়াছেন। বেদের কাল হইতে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম প্রায় একই প্রবাহে চলিয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন এবং সমসাময়িক মতবাদের প্লাবনে বৈদিক আর্যধর্মের প্রবাহ সাময়িকভাবে প্রতিহত হইল। শুঙ্গ ও কাম্বগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সহজ-ভাবেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। এই পুনরুত্থানের

সময় কতকগুলি অবৈদিক দেবতার আবির্ভাব হয় এবং বহু বৈদিক দেবতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় হইতে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজার পরিবর্তে শিব, বিষ্ণু এবং কতিপয় নারী-দেবতা প্রাধান্ত লাভ করিল। মূর্তির জন্য মন্দির নির্মাণ এই যুগেই আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত নূতন দেবতার মাহাত্ম্য, পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি বিবৃত করিয়া পুরাণ নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হইল। পুরাণের মধ্যে সমসাময়িক রাজা, রাজবংশ ও তাহাদের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ থাকিলেও ঐগুলি প্রধানতঃ ধর্মগ্রন্থ। পুরাণকারগণ বলেন, – পুরাণ বেদের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা মাত্র। বেদের মন্ত্ররাশি রহস্যময়; ভাবে, ভাষায় বেদের মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞানরাশি সংক্ষিপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই পুরাণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক কর্মফল, পুনর্জন্ম, পরলোক ইত্যাদি বিশ্বাসগুলি পুরাণকারগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদোক্ত আচার-ব্যবহার এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি যুগোপযোগী পরিবর্তন লাভ করিয়া পুরাণে নূতনরূপে গৃহীত হইয়াছে। বৈদিক যুগে জাতিভেদ-প্রথা শ্লথ ছিল; পৌরাণিক সমাজে জাতিভেদ প্রথা আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রচলিত হইল এবং কঠোর রূপ ধারণ করিল। অষ্টাদশ পুরাণ ও উপ-পুরাণ গ্রন্থগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অথবা আরও পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া মুসলিম আগমন পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক বৎসরকাল ব্যাপিয়া রচিত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। বহিরাগত জাতিগুলির উপযোগী করিয়া বৈদিক ধর্মকে নবভাবে রূপায়িত করা হয়। এই নবরূপায়িত ধর্ম সাধারণভাবে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম নামে কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত হয় নাই। হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে পৃথক নয়। পৌরাণিক ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই নবরূপ। পৌরাণিক ধর্ম গুপ্তযুগেই পূর্ণ রূপ লাভ করে। ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে পুরাণের মধ্যে ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আখ্যান বৃহত্তর স্থান লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশখানি পুরাণের মধ্যে ত্রয়োদশ খানিতে প্রাচীনতম আর্য রাজা, বিখ্যাততম ঋষি ও ঋষি-শিষ্যদের দীর্ঘতম বংশপঞ্জী এবং মহাকাব্যে বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্য বংশের বহু কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। পুরাণবর্ণিত ধর্মের ভিত্তি বেদ; কিন্তু পুরাণের মধ্যে অনুষ্ঠান অপেক্ষা হৃদয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বৈদিক পূজাপদ্ধতি হইতে পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি বহু দিক দিয়া পৃথক। সাধারণ লোকের উপযোগী করিয়া এই সমস্ত পূজা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান মুষ্টিমেয় বেদজ্ঞ আর্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি সাধারণ মানুষের উপযোগী করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছে।

পৌরাণিক দেবতা

বেদ ও পুরাণের সম্বন্ধ

পৌরাণিক দেবতা

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ

ভারতে গ্রীক অধিকার : অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে সিরিয়া ও বাহ্লীক হইতে গ্রীকরাজগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি আক্রমণ করে। আনুমানিক ২০৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিরিয়ার আধিপতি **এ্যান্টিওকস্** কাবুল উপত্যকা আক্রমণ করেন এবং ভারতীয় নরপতি সুভাগসেনের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ ও হস্তী উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। বাহ্লীক-রাজ **ডেমিট্রিয়স** আফঘানিস্থান, পঞ্জাব এবং সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চল জয় করেন। ইহার ফলে ডেমিট্রিয়স 'ভারতীয়গণের নরপতি' আখ্যা লাভ করেন। গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে কপিশা (কাফিস্থান ; বর্তমান নুর-ই-স্থান), পুষ্কলাবতী (ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী চাসারদা), শাকল (শিয়ালকোট) বিখ্যাত। **ইউক্রাইটাইডিস** নামে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীক নরপতি ডেমিট্রিয়সকে পরাজিত করিয়া ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরবর্তী গ্রীকরাজগণের মধ্যে **মিনান্দার** বিখ্যাত। তাঁহার রাজ্যসীমা বোধ হয় কাবুল হইতে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিনান্দার মথুরা, অযোধ্যা ও পাটলীপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন ; তাঁহার রাজধানী ছিল শাকল। সম্ভবত: তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। **মিলিন্দপঞ্‌হো** নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহার নাম চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। মিলিন্দপঞ্‌হো গ্রন্থে শাকলের বিরাট প্রাচীর, সুবিশাল প্রাসাদ, প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য উদ্যান, সুসজ্জিত বিপণী, বিচিত্র পণ্যসম্ভার, নানা জাতীয় মানুষের সমাবেশ প্রভৃতি বিষয়ে চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন বংশীয় গ্রীকরাজগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এবং একতার অভাবে তাঁহারা দুর্বল হইয়া পড়েন। শক, পহ্লব (পার্থিয়ান) এবং ইউচি (কুষাণ) প্রভৃতি দুর্ধর্ষ আক্রমণকারিগণের নিকট তাঁহারা পরাভূত হওয়ার ফলে ভারতে গ্রীকশক্তি বিলুপ্ত হয়। গ্রীকগণ পরবর্তিকালে ভারতীয়দের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ভারতে গ্রীকদের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব বিলুপ্ত।

মিনান্দার

ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক প্রভাব : ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে ত্রিশ জন গ্রীক রাজা এবং দুই জন রাজ্ঞী প্রায় আড়াই শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে শক, পহ্লব এবং কুষাণ জাতির

আক্রমণে গ্রীক রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। এই দীর্ঘকালব্যাপী গ্রীক রাজত্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে ভারতবাসীর রক্ত-সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ভারতীয় সমাজে, ধর্মে, স্থাপত্যে ও শিল্পে গ্রীক প্রভাব বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব ঃ প্রাচীন ভারতীয়গণ মুদ্রার ব্যবহার জানিত এবং মুদ্রা ব্যবহার করিত। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ছিল গোলাকৃতি অথবা চতুষ্কোণ। ধাতুর পরিমাণ দ্বারাই মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হইত। ডেমিট্রিয়সের মুদ্রা ভারতীয় ও গ্রীক ভাষায় মুদ্রিত ছিল।

ধাতুখণ্ড কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা 'মুদ্রিত' হইত বলিয়াই উহার নাম ছিল মুদ্রা, অথবা ধাতুখণ্ড দ্বারা কোন দ্রব্য চিহ্নিত বা মুদ্রিত হইত বলিয়া উহার নাম মুদ্রা। গ্রীকগণ বাণিজ্য ও রাজকার্যের জন্য মুদ্রা ব্যবহার করিত। গ্রীক মুদ্রায় সৌষ্ঠব ও সৌন্দয একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। রাজার প্রতিকৃতি, রাজচিহ্ন, রাজনাম, রাজ উপাধি গ্রীক মুদ্রাকে ইতিহাসে বিশেষ স্থান দান কবিয়াছে। গ্রীক মুদ্রা ভারতে গ্রীক অধিকার এবং রাজ্যসীমা নির্ধারণ এবং গ্রীক শাসনের ইতিহাস রচনার বিশেষ মূল্যবান উপাদান। পরবর্তিকালে শক, পহ্লব, কুষাণ এবং গুপ্ত মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, মুদ্রা হইতে সমসাময়িক শিল্প, সৌন্দর্যজ্ঞান, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ পাওয়া যায়।

গ্রীক মুদ্রা

ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাব ঃ গ্রীক জাতি স্বভাবতঃই সুন্দর এবং সৌন্দর্যপ্রিয়। ভারতীয় চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যশিল্পে গ্রীক জাতির অবদান অবিস্মরণীয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টি গ্রীক সন্তানের অন্যতম জীবিকা ছিল। গ্রীক রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে এই শিল্পিগণ জীবিকার্জনের জন্য এশিয়াস্থিত গ্রীক অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে আগমন করিত। অনেক সময় এই গ্রীক শিল্পিগণ ভারতীয় রাজসভায় বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকর্মে নিযুক্ত হইত। বৌদ্ধগণ ভগবান বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের চিত্র এবং জীবনের ঘটনাবলী অঙ্কন পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। পুণ্যার্থী ভারতবাসী গ্রীক চিত্রকর ও ভাস্করদিগকে চিত্রাঙ্কন এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করিত। গান্ধার অঞ্চলে তাহাদের নির্মিত বহু ভাস্কর্য নিদর্শন আজিও অম্লান। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক প্রভাবিত একটি শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় গ্রন্থে তাহারা দেবশিল্পী বা যক্ষ নামে উল্লিখিত। অনেক ঐতিহাসিকের নিকট এই শিল্পকলা গান্ধার শিল্পরীতি নামে পরিচিত।

গান্ধার শিল্প ঃ প্রাচীন গান্ধার অর্থাৎ বর্তমান আফঘানিস্থান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু ভগ্ন,, অর্ধভঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তি এবং ভাস্কর্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ গান্ধার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে

বলিয়া এই ভাস্কর্য 'গান্ধার শিল্প' নামে আখ্যাত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে গ্রীসদেশীয় শিল্পীদের হস্তস্পর্শ ছিল এবং এই শিল্পরীতির মধ্যে ভারতীয় ও গ্রীক কলা-কৌশলের সমন্বয় হইয়াছিল। সুতরাং এই শিল্প ইন্দো-গ্রীক শিল্প নামেও পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

গান্ধার শিল্প—বোধিসত্ত্ব

এই সকল শিল্প নিদর্শনের অধিকাংশই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি অথবা বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর রূপায়ণ। গান্ধার শিল্পের ভাবধারা ছিল ভারতীয়, কলাকৌশল ছিল গ্রীক। গান্ধারে আবিষ্কৃত মূর্তির মধ্যে পাওয়া যায়—একদিকে গ্রীক শিল্পীর বাস্তবতা ও মণ্ডনপ্রিয়তা, অন্যদিকে ভারতীয় মনের আধ্যাত্মিকতা। বুদ্ধমূর্তিগুলির মুখমণ্ডল গ্রীকদেবতা এ্যাপোলোর অনুকরণে পরিকল্পিত—কোথাও গুম্ফ-শোভিত, পেশীরেখা স্ফীত; পরিচ্ছদে বস্ত্রের কুঞ্চনে গ্রীকমূর্তির আচ্ছাদনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। অন্য দিকে ভারতীয় মূর্তির বদনমণ্ডলে ছিল কল্পনার প্রাধান্য।

ভারতীয় ও গান্ধার শিল্পের তুলনা

ভারতীয় শিল্পরীতিতে গঠিত মূর্তির মুখমণ্ডল মসৃণ, গুম্ফবিহীন, পরিচ্ছদ সূক্ষ্ম এবং রেখা দ্বারা সূচিত। গ্রীকগণ দেবতাকে আদর্শ মানুষরূপে কল্পনা করিয়া মূর্তি নির্মাণ করিত। সুতরাং তাহাদের ক্ষোদিত মূর্তিগুলিতে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রূপ দান করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত শিল্পরসিক হ্যাভেল বলেন—"গান্ধার শিল্পের মধ্যে আছে গ্রীক ভাস্কর্য-রীতির অনুকরণ, কিন্তু উহার মধ্যে ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই।" পরবর্তিকালের ভারতীয় শিল্পে গান্ধার রীতির প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

ভারতে পহ্লব অধিকারঃ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পার্থিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলই প্রাচীন ভারতীয় পহ্লব এবং পুরাণ-বর্ণিত পারদ পহ্লব দেশ। পার্থিয়া সেলুকস নিকেটরের অধীন সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেলুকসের মৃত্যুর পর (২০৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে) পার্থিয়া অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই পার্থিয়ার অধিবাসিগণই পার্থিয়ান বা পহ্লব নামে পরিচিত। পহ্লব রাজগণের মধ্যে সম্ভবতঃ মিথ্রিডেটিস ১৩৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তক্ষশীলা অধিকার করেন।

মিথ্রিডেটিসের অনেককাল পরে বিন্দপর্ণ নামক এক বিখ্যাত পহ্লব নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় বিন্দপর্ণ গ্রীকদিগের গণ্ডোফারনিস, আর্মিনিয়দের গথ্সজার এবং সিরিয়ানদের গাস্ফার। খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তকে উল্লেখ আছে যে, গণ্ডোফারনিস আকাশের নক্ষত্র অনুসরণ করিয়া যীশুখ্রীষ্টকে সন্ধান করিবার জন্য বেথেলহামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিংবদন্তি আছে, তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা কাবুল, পেশোয়ার ও কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গণ্ডোফারনিসের মৃত্যুর পর প্রথম কদফিস কাবুল অধিকার করেন। কুষাণ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পহ্লব অধিকার বিলুপ্ত হয়।

গণ্ডোফারনিস

পহ্লবগণ গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এথেন্সের বিখ্যাত পার্থিনন্ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত একটি পহ্লব মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে; ঐ মন্দিরের মধ্যে গ্রীক দেবমূর্তিও আছে। পহ্লবগণ পারস্যের জরথুষ্ট্র ধর্ম অনুসরণ করিত। কিন্তু তাহারা বলপূর্বক তাহাদের ধর্ম ভারতীয় প্রজাদের উপর আরোপ করে নাই।

পহ্লব সংস্কৃতি

ভারতে শকাধিকার: শক জাতি মধ্য এশিয়ার শিরদরিয়া নদীর উত্তরাঞ্চল অথবা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বর্ণিত শক দ্বীপে বাস করিত। খ্রী: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা ইউচি জাতির আক্রমণে এই অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীকদেশে এবং পার্থিয়া বা পহ্লবদেশে আগমন করে। ভারতের প্রত্যন্তদেশের গ্রীকগণ বহুকাল শকজাতিকে ভারতে প্রবেশের পথে প্রতিহত করিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শকগণ গান্ধার হইতে নিম্ন সিন্ধুর উপত্যকা অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। কোন কোন শক রাজ্য প্রথমে পহ্লব, পরে কুষাণ সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। শকগণ ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। অধিকৃত অঞ্চলভেদে শক ক্ষত্রপদিগকে উত্তর ক্ষত্রপ এবং পশ্চিম ক্ষত্রপ নামে অভিহিত করা যায়।

উত্তর ক্ষত্রপগণ ভারতের উত্তরাংশে কপিশা হইতে তক্ষশীলা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল শাসন করিতেন। তক্ষশীলায় মোঘ বা মজেস এবং রঞ্জুবুল নামক দুইজন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহারও মতে মোঘ ছিলেন শকক্ষত্রপ, মতান্তরে তিনি ছিলেন পহ্লব বংশীয়।

উত্তর ক্ষত্রপ

সুরাষ্ট্র, মালব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল শাসনকারী ক্ষত্রপগণ পশ্চিম ক্ষত্রপ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের কাহারো কাহারো উপাধি ছিল ক্ষহ্রাট। পশ্চিম ক্ষত্রপগণের মধ্যে ভূমক এবং নহপান বিখ্যাত। সম্ভবতঃ নহপান সাতবাহন নরপতিদিগকে পরাভূত করিয়া

পশ্চিম ক্ষত্রপ

সাময়িকভাবে মহারাষ্ট্র অঞ্চল অধিকার করেন। কিন্তু সাতবাহন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি নহপানকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল পুনরধিকার করেন।

মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীতে চষ্টান নামক একজন শক ক্ষত্রপ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শক ক্ষত্রপ চষ্টান কুষাণ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। চষ্টানের পৌত্র রুদ্রদামন ছিলেন মালবের শক ক্ষত্রপগণের মধ্যে বিখ্যাততম (১৩০-১৫০ খ্রীঃ)।

মালবের শক ক্ষত্রপ

রুদ্রদামন সাতবাহন নরপতি বাসিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি অথবা তাঁহার ভ্রাতা শাতকর্ণির সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই আত্মীয়তা সত্ত্বেও দুই রাজবংশের মধ্যে কলহের অন্ত ছিল না। রুদ্রদামন সাতবাহনদিগকে একাধিকবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ গুজরাট, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, কচ্ছ এবং রাজপুতানার কিয়দংশ রুদ্রদামনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুদ্রদামনের জুনাগরের গির্ণার শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, গির্ণার অঞ্চলে তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক নির্মিত সুদর্শন হ্রদ বহু শ্রম ও অর্থব্যয়ে সংস্কার করান। রুদ্রদামন ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক এবং বিদ্বানের ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক। তিনি কয়েকজন হিন্দু রাজকন্যা বিবাহ করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর মালবের শক ক্ষত্রপগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অবশেষে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রদামনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া শক ক্ষত্রপদের অধিকার বিলুপ্ত করেন।

শক রাজ্যের অবসান

কুষাণ জাতির অধিকার ঃ পহ্লবগণের পর কুষাণগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। কুষাণগণ চীনদেশীয় ইউচি নামক যাযাবর জাতির শাখা। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ নায়ক **কুজুল কদফিস** সমগ্র ইউচি জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিন্দুকুশের দক্ষিণে অভিযান করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল হিন্দুকুশের অন্তর্গত পঞ্চশির পর্বতের পাদদেশস্থ কপিশা। তিনি পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য সম্ভবতঃ পারস্যের সীমান্ত হইতে বিতস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ছিলেন। আশি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম কদফিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **বিম কদফিস** কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি গান্ধার হইতে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া পিতার আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই ভারতীয় রাজ্য তিনি স্বয়ং

বিম কদফিস

শাসন করেন নাই। সম্ভবতঃ মহা-সেনাপতি উপাধিধারী একজন প্রতিনিধির হস্তে এই বিজিত প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বিম কদফিস রোমের অনুকরণে বিশুদ্ধ সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করেন।

সম্রাট কণিষ্ক: বিম কদফিসের পর কণিষ্ক কুষাণগণের অধিপতি হইলেন। তিনিই ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। মহারাজ কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের কাল স্মরণীয় করিবার জন্য একটি সংবৎ প্রচলিত হয়; তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই বোধ হয় বর্তমানে প্রচলিত **শকাব্দ** আরম্ভ হয়।

কণিষ্ক ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তাঁহার অন্য দুইটি রাজধানী ছিল নগরহার (জালালাবাদ) এবং বামিয়ান। কণিষ্ক চীনের নিকট রাজনৈতিক বশ্যতা অস্বীকার করেন। তুর্কিস্থানের কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থানও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বে পাটলীপুত্রের অধিপতিকে এবং পশ্চিমে পহ্লব রাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি চীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনুমিত হয়, চীনা তুর্কিস্থানে কণিষ্ক স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। চীনা ও তিব্বতীয় সাহিত্যে কণিষ্কের সাকেত (অযোধ্যা), পাটলীপুত্র অভিযানের কাহিনী উল্লিখিত আছে।

কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কুষাণ জাতির ধর্ম ঃ ইউচি জাতি এবং উহার কুষাণশাখা প্রারম্ভে যাযাবর ছিল। জাতিগত কোন বিশেষ ধর্ম বা সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে নাই, সুতরাং কুষাণগণ সহজেই ভারতে প্রচলিত ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কুষাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুজুল কদফিস সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দ্বিতীয় কুষাণ সম্রাট বিম কদফিস সম্ভবতঃ শৈব ধর্ম আচরণ করিতেন। তৃতীয় কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক প্রথমে জয়থুষ্ট্র ধর্ম আচরণ করিলেও পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন ও প্রচার করেন।

কুষাণ ধর্ম

তিনিই কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি বা সম্মেলন আহ্বান করিয়া মহাযান পন্থা প্রচলন করেন। কণিষ্কের পরবর্তী রাজগণ ছিলেন দুর্বল। সমসাময়িক মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কুষাণ যুগে মিত্র (মিহির),

চন্দ্র (মাহ্), অগ্নি (ফারুরো) প্রভৃতি দেবতাও জনপ্রিয় ছিল। কুষাণ জাতির মনে পারিবারিক অথবা বংশগত কোন ধর্মের বিশেষ কোন আবেদন ছিল না বলিয়াই তাহাদের পক্ষে এইরূপ সতত পরিবর্তনশীল ধর্মাচার সম্ভব হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মে কণিষ্কের দান : মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজানুগ্রহপুষ্ট। শুঙ্গযুগে বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজানুগ্রহবঞ্চিত। বহুকাল পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাবে বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে
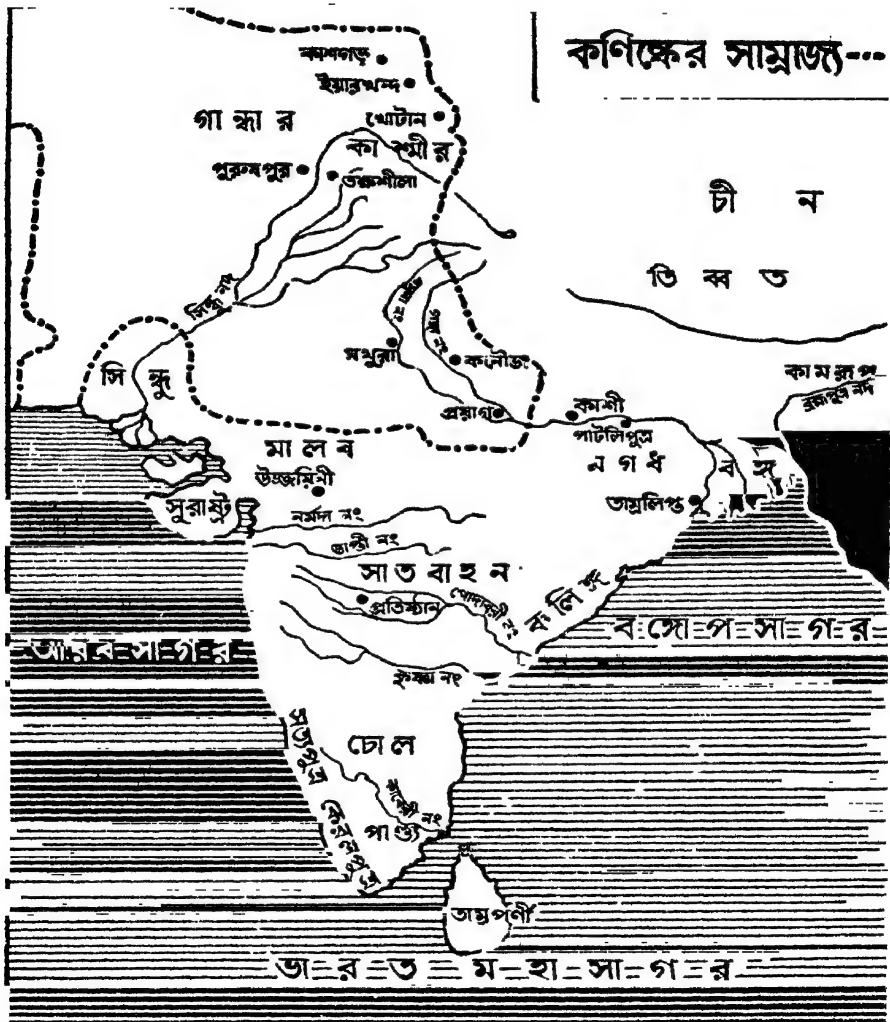
নানা প্রকার মতবাদ সৃষ্টি হয় এবং বৌদ্ধগণ নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়। মহারাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরিক মতবিরোধ সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। এই মতবিরোধের মূলকথা হইল—তথাগত বুদ্ধকে

দেবতাজ্ঞানে দেবতার আসনে স্থাপিত করিয়া ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন দ্বারা পূজা বিধিসম্মত অথবা অবৈধ। মৌর্য যুগের পর হইতে কণিষ্কের যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত তিন শত বৎসরের মধ্যে বহু বহিরাগত সংস্কৃতিবিহীন অর্ধসভ্য এবং অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ, মুক্তি ইত্যাদি দার্শনিক তথ্য সম্যক অনুধাবন করিতে পারিত না। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণ ভগবান বিষ্ণু, তাঁহার অবতার কৃষ্ণ ও সংকর্ষণ (বলরাম) এবং অন্যান্য নানা প্রকার দেবতা ও মূর্তির পূজা করিত। নবাগত নবদীক্ষিত যাযাবর জাতিগুলিও বৌদ্ধধর্মকে তাহাদের গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করিবার জন্য শাক্যবংশীয় শুদ্ধোধন পুত্র সিদ্ধার্থকে দেবতার আসন দান করিল। যুগে যুগে আগত বিষ্ণুর অবতারের অনুরূপ ভগবান বুদ্ধও যুগে যুগে বোধিসত্ত্ব রূপে সহস্রবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক ভাস্কর ও শিল্পীদিগকে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মাণে নিযুক্ত করিল। ধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনাও এই যুগেরই সৃষ্টি। এই সমস্ত পরমসুন্দর মূর্তিগুলির সম্মুখে সহজেই মানুষের মস্তক অবনত হইয়া আসে। কণিষ্কের মুদ্রায় গ্রীক, বৌদ্ধ, পারসীক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখিয়া মনে হয় তিনি ধর্মে উদার ছিলেন।

কণিষ্ক ও বৌদ্ধধর্ম

মহাযান মতবাদ

সাতবাহন যুগের পণ্ডিত নাগার্জুন বিশেষভাবে বুদ্ধপূজার সমর্থক ছিলেন। তিনি বাস্তবিক পক্ষে মহারাজ অশোকের সরল সহজ হীনযান পন্থার পরিবর্তে অনুষ্ঠানবহুল মহাযান পন্থাকে রূপদান করেন। কিন্তু হীনযান ও মহাযান মতবাদী বৌদ্ধগণের মধ্যে তখনও ঘোরতর মতবিরোধ চলিতেছিল। কণিষ্কের সময় প্রায় অষ্টাদশ প্রকার বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বলেন যে, এই মতবিরোধ দূর করিবার উদ্দেশ্যে কুষাণরাজ কণিষ্ক একটি অখিল বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনের স্থান ছিল কাশ্মীরের কুণ্ডলবন*—বিহার অথবা জলন্ধরের কোন অংশ। সুদীর্ঘ আলোচনার পরে এই সম্মেলনে **মহাযান** মতবাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত ও সংকলিত ব্যাখ্যাসমূহ **মহাবিভাষা** নামে বৌদ্ধসাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছে। কথিত আছে, কণিষ্ক এই ব্যাখ্যাগুলি চিরন্তন করিবার উদ্দেশ্যে উহা তাম্রপাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া স্তূপমূলে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি

আনুষ্ঠানিক ভাবে মহাযান পন্থা গৃহীত হইবার পরে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ বহুলাংশে শান্ত হইল। অন্যদিকে বুদ্ধপূজা গ্রহণের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের

* কাল—১১৮ খ্রীষ্টাব্দ; তিন মাসব্যাপী অধিবেশন। উদ্যোক্তা—পার্শ্ব; পাত্র: সভাপতি—বসুমিত্র, সহসভাপতি—অশ্বঘোষ (সভাকবি); আলোচনার ভাষা—সংস্কৃত; আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা; উপস্থিত পণ্ডিত ও শ্রমণ সংখ্যা—পঞ্চ সহস্র।

সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইল। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ ভগবান বুদ্ধকে অবতাররূপে অর্ঘ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

কণিষ্কের ধর্মপ্রচার

কণিষ্কও অশোকের মত তুর্কীস্থান, মধ্য-এশিয়া, চান অঞ্চলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ ও প্রচারক প্রেরণ করিয়া তথাগতের বাণী প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ মতানুযায়ী কণিষ্ক ছিলেন **দ্বিতীয় অশোক**। কণিষ্কের সময় দ্বিতীয়বার ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কণিষ্ক-নির্মিত পুরুষপুর চৈত্য একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থ ছিল।

মৌর্য-পূর্ব ও মৌর্যোত্তর যুগের বিবুধমণ্ডলী (মনীষিবৃন্দ)

এই যুগে ভারতীয় প্রতিভার প্রতীকরূপে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, জীবক, পাণিনি, পতঞ্জলি, গুণাঢ্য, চরক, বসুমিত্র প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হইযাছিল। ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সময় নিরূপণ করা সম্ভব নহে। অধিকাংশ সংবাদই অনুমানসাপেক্ষ।

ভেষজবিদ্‌ জীবক : বুদ্ধের সমসাময়িক নৃপতি বিম্বিসারের সমকালে জীবক আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মস্থান রাজগৃহ। কাহারও মতে জীবক বিম্বিসারের পুত্র, মতান্তরে জীবক বিম্বিসার-পুত্রের পালিত পুত্র। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বৎসর আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে উপাধি প্রদানের জন্য গুরু তাঁহার ভেষজজ্ঞান পরীক্ষা করেন। তক্ষশীলা নগরীর চতুর্দিকস্থ দশ ক্রোশব্যাপী স্থানে জাত বৃক্ষ-লতা-গুল্মের ভেষজশক্তি নির্ণয় করিতে তাঁহার গুরু তাঁহাকে আদেশ দেন। জীবক ঐ স্থানের প্রতিটি লতাগুল্মের ভেষজগুণ গবেষণা করিয়া গুরুর সমীপে নিবেদন করেন। তারপর তিনি উপাধি লাভ করিযা পাটলীপুত্রে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কথিত আছে, তিনি বিম্বিসারকে একবার দূরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় করেন। তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি প্রদ্যোতের চিকিৎসক ছিলেন। জীবন একাধিক বার ভগবান তথাগত বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে জীবকের দান অতুলনীয়।

পণ্ডিত নাগার্জুন : খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন যুগে নাগার্জুন বিদর্ভের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নাগার্জুন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া মহাযান মত এবং তান্ত্রিক আচার প্রবর্তন করেন। এইজন্য তিনি বৌদ্ধাচার্য নামে বিখ্যাত। 'পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামক গ্রন্থ নাগার্জুনের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। নাগার্জুন 'মাধ্যমিক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মকে নূতন রূপ দান করিয়াছেন।

বৈয়াকরণ পাণিনি : পাণিনির জন্মস্থান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শলাতুর গ্রাম। জন্মকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম হইতে চতুর্থ শতাব্দী।

তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ **অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ**—আটটি অধ্যায়ে, চারি সহস্র সূত্রের সমষ্টি। পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা সুসংবদ্ধ করেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ শব্দ-সম্পদে, অর্থ-গৌরবে, ভাষার বিশুদ্ধতায় এবং কলেবরে অপূর্ব। বর্তমান সংস্কৃত ভাষার উন্নতির প্রচ্ছদপটে পাণিনির দান অবিস্মরণীয়। পাণিনির ব্যাকরণ রচনার পর হইতে প্রাকৃত, পৈশাচ, রাক্ষস, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত অর্থাৎ সংশোধিত রূপ ধারণ করিল।

টীকাকার কাত্যায়ন ঃ পাণিনির আনুমানিক দুই শত বৎসর পরে কাত্যায়ন আবির্ভূত হন। তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রগুলির **বার্তিক** রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অনেক স্থলে পাণিনির সূত্রের তীব্র সমালোচনা করেন এবং অনেকগুলি নূতন সূত্র রচনা করেন।

ভাষ্যকার পতঞ্জলি ঃ পতঞ্জলি কাত্যায়নকে সমর্থন করেন নাই। ভাষ্যকার পতঞ্জলির জন্মকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। ইনি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক। পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণের এক মহাভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং যুগোপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। মহাভাষ্যের উপক্রমণিকা **পস্পশাহ্নিক** (পস্পশ) নামে অভিহিত। গল্পচ্ছলে ব্যাকরণের আলোচনা পতঞ্জলির রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষা কাব্যময় অথচ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।

কাহিনীকার গুণাঢ্য ঃ ইনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ—জন্মস্থান অন্ধ্র দেশ; ইনি ছিলেন অন্ধ্র নরপতি হল-এর মন্ত্রী। ইনি পৈশাচী ভাষায় **বৃহৎকথা** নামক একখানি কাহিনী গ্রন্থ রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব 'বৃহৎ কথা'র সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষাও পৈশাচী ভাষার একটি বিশেষ রূপ বলিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর গুণের ধারণা। পৈশাচী ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। বৃহৎকথার বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তিকালে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও গ্রীক ভাষায় বহু কাব্য-কাহিনী রচিত হইয়াছে।

ঋষি চরক ঃ ঋষি চরক ছিলেন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহারাজা কণিষ্কের সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত **চরকসংহিতা** বিশ্ববিখ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত আত্রেয়সংহিতাই চরকসংহিতার মূল। পরিবর্তিকালে চরকসংহিতা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। চরকসংহিতার কিয়দংশ চীনের অন্তর্গত কুচার মঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগদাদের খলিফা মামুন ভারতীয় চিকিৎসকদিগকে তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া চরকসংহিতা অনুবাদ করান। আরবদের মাধ্যমে চরকসংহিতা ইওরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

ঋষি চরক উদ্ভিদ্, ধাতু এবং জীবশরীর হইতে প্রস্তুত প্রায় দুই সহস্র প্রকার ঔষধের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করেন। ঔষধের উপকরণ

সংগ্রহের সময় ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী এবং ঔষধ ব্যবহারের বিধিনিষেধ ঋষি চরক নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিশুপালন ও শিশু-চিকিৎসায় তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্ব ছিল ; তাঁহার নাড়ীজ্ঞান আয়ুর্বেদ জগতে প্রবাদস্বরূপ ছিল। আয়ুর্বেদ ছিল ঋষি চরকের সাধনা—ব্যবসা নয়। ঋষি চরক চিকিৎসা শাস্ত্রকে পঞ্চম **আয়ুর্বেদ** বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

অস্ত্রচিকিৎসক সুশ্রুত ঃ সুশ্রুত ছিলেন অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ। শারীর-বিজ্ঞানে তাঁহার অপূর্ব অধিকার ছিল। অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গবিজোড়ন, ভগ্নাস্থি-সংযোজন, যকৃৎ বিচ্ছেদ ব্যাপারে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অনন্যসাধারণ। অস্ত্রোপচার, শলাকা চিকিৎসা, প্লীহা বিদারণ, গর্ভস্থ সন্তান নিষ্কাষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য তিনি এক শত সাতাশ প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত অস্ত্র দ্বারা তিনি কেশ লম্বালম্বিভাবে বিভাগ করিতে পারিতেন। এই অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসকগণ বিস্মিত হন।

সর্বজ্ঞ অশ্বঘোষ ঃ অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কবি-খ্যাতি ও সংগীত-প্রীতি মহারাজ কণিষ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কণিষ্ক অযোধ্যা হইতে বলপূর্বক তাঁহাকে হরণ করিয়া রাজধানী পুরুষপুরে আনয়ন করেন। অশ্বঘোষ ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক, সুললিত বক্তা, জনপ্রিয় অভিনেতা। তথাগত ভগবান বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলি তিনি নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিতেন, ফলে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। কণিষ্কের চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি বসুমিত্রের সহকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত দ্বাদশখানি গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধচরিত ও সূত্রালংকার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদর্শন মহাবিভাষা শাস্ত্র প্রণেতা বসুমিত্র ছিলেন তাঁহার পরম মিত্র। অশ্বঘোষ ছিলেন সচল বিশ্বকোষ।

তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় ঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সহস্রাধিক বৎসরকাল তক্ষশীলা ছিল ভারতের—তথা এশিয়ার বিদ্যাকেন্দ্র। সুদূর গ্রীস, ইরাণ, গান্ধার, বাহ্লীক, চীন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা তক্ষশীলা নগরে সমবেত হইত। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির দশক্রোশ দূরে, সিন্ধুর অপর তীরে প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহিয়াছে বক্তৃতা-কক্ষ, পাঠগৃহ, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস, অলিন্দ, প্রাঙ্গণ ও পথ। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভেষজবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, কলাবিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং দর্শন আলোচনার জন্য বিখ্যাত। ষোড়শ বর্ষান্তে শিক্ষার্থিগণ জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণার জন্য তক্ষশীলায় সমবেত হইতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (বা ছাত্র) ছিলেন বৈয়াকরণ পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি,

রাজনীতিবিদ্ চাণক্য, শরীর-বিজ্ঞানী জীবক, শল্যাতুর চরক, চিকিৎসক সুশ্রুত প্রভৃতি মনীষিবর্গ। ভারতের বহু রাজপুত্র এই তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন বিখ্যাত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক ও অবৈতনিক। ভারতের
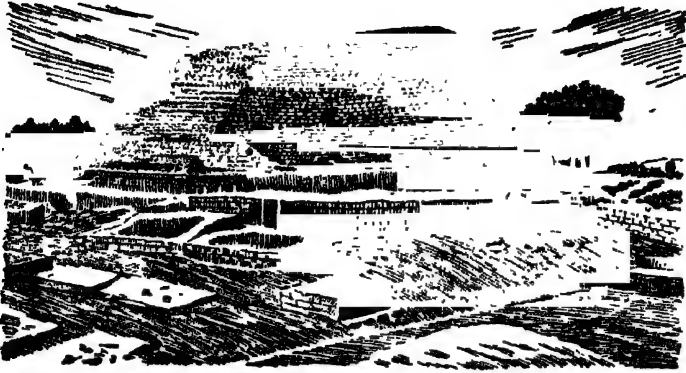
তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ

রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অর্থসাহায্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। তক্ষশীলা ছিল সমসাময়িক ভারতের জ্ঞানতীর্থ।

প্রতিবেশী অঞ্চলের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ কূপ-মণ্ডুক ছিল না। মৌর্যযুগ হইতেই বহির্ভারতের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে যেমন ভারতের বাহির হইতে নানা জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং ভারতের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি ভারতবর্ষও তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যাতায়াত এবং আদান-প্রদানে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত দেশের মধ্যে আফঘানিস্থান, নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, মধ্য এশিয়া এবং চীন উল্লেখযোগ্য।

ভারত ও আফঘানিস্থান ঃ মহাভারতের সমসাময়িক গান্ধার ছিল হস্তিনাপুরাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী গান্ধারীর পিতৃরাজ্য। পারসীক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন যুগে এই অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। অশোক ও কণিষ্কের যুগে গান্ধারগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বহু বৌদ্ধমঠ দর্শন করেন। তখন এই দেশের নাম ছিল কপিশা, পরে কাবুল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ কাবুল জয় করে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশটি আফঘানিস্থান নামে পরিচিত হয়। পঞ্জাবের উদ্‌ভাণ্ডপুরের শাহী বংশ এই দেশের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শাহী বংশ ছিল কুষাণ বংশের একটি শাখা।

ভারত ও নেপাল : নেপাল ভারতের তথা হিমালয়ের অংশবিশেষ। নেপালের উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম, দক্ষিণে উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমে কুমায়ুন। হিমালয়ের এই উপত্যকা বনজ, খনিজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পদে পরিপূর্ণ। নেপালের তুষার-সেবিত উত্তরাংশে মোঙ্গল জাতীয় ভুটিয়া বা তিব্বতী, মধ্যাঞ্চলের উপত্যকায় কিরাত, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতির বাস। তাহাদের দেবতা গোরক্ষনাথ—মহাদেব বা মহাকাল। গোরক্ষনাথের পূজক বলিয়া তাহারা গোরখা বা গুর্খা নামে পরিচিত। অশোকের কন্যা চারুমিত্রা নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। নেপালী বৌদ্ধেরা মহাকালের পূজায় মহিষ বলি প্রদান করে।

ভারত ও তিব্বত : প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় তিব্বত কিংপুরুষবর্ষ নামে অভিহিত হইত। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্বন্ধ অতি গভীর। কিংবদন্তী আছে, তিব্বত ছিল রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী সরমার পিতা শৈলুষের রাজ্য। যদিও তিব্বতীয়গণ রক্তে মোঙ্গল, তবু তাহারা ভারতীয় শাক্য নরপতি শুদ্ধোদনের পুত্র তথাগত বুদ্ধের ধর্ম অনুসরণ করে। ভারতবর্ষকে তিব্বতীয়গণ তাহাদের পুণ্যতীর্থ বলিয়া শ্রদ্ধা করে। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ধর্মীয় সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইদানীং একটি অতি প্রাচীন গুহার মধ্যে দশ সহস্র হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও বহু বৌদ্ধধর্মীয় স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিব্বতীয় লিপি ও সংস্কৃতি বহুলভাবে ভারতীয় লিপি ও সংস্কৃতির রূপান্তর। তিব্বতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নিকটতর।

সপ্তম শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী তিব্বত-রাজ স্রঙ্-সাঙ্-গাম্পো এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-পা-পু ভারতের একাংশ অধিকার করেন। নবম শতাব্দীতে তিব্বত-রাজ স্রং-ৎসান মোঙ্গোলিয়া হইতে গঙ্গা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নেপালাধিপতি অংশুবর্মণ ছিলেন স্রঙ্ সাঙ্ গাম্পোর অধীন সামন্ত রাজা। স্রঙ্ সাঙ্ গাম্পো অংশুবর্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মহিষীর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ : প্রাচীন ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশকে প্রাগ্‌বর্ষ এবং আসামকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আখ্যা দিয়াছিল। হিমালয় পর্বতমালা পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশে আসিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের পূর্বে চীনের অন্তর্বর্তী শানরাজ্য ও ইয়ুনান প্রদেশ; ব্রহ্মের দক্ষিণে শ্যাম, মালয় এবং বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর। ব্রহ্মের অধিবাসীদের রক্তে নানা গোষ্ঠীর রক্ত-সংমিশ্রণ হইয়াছে। ব্রহ্মের অধিবাসিগণ

সাধারণতঃ মোঙ্গল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। স্থল ও জল—উভয় পথেই বাংলা দেশের সঙ্গে ব্রহ্মের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। বাংলা দেশ হইতেই হিন্দু সংস্কৃতি ব্রহ্মদেশে প্রচলিত হয়। ব্রহ্মের এক অংশের নাম গৌড়। ব্রহ্মদেশের পথেও ভারতীয় বণিক ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। ব্রহ্ম নামটিও ভারতীয়। কথিত আছে, অশোক শোণ ও উত্তর নামক দুইজন বৌদ্ধ প্রচারককে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশে পালি ভাষা প্রচলিত হয়। ব্রহ্মদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেকাংশে ভারতবর্ষের ধারা অনুসরণ করিত। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধস্তূপগুলি প্যাগোডার আকার ধারণ করিয়াছে। একমাত্র পেগু নগরই তের হাজার প্যাগোডায় শোভিত ছিল। প্যাগোডার অভ্যন্তরে কোথায়ও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, কোথায় শায়িত বুদ্ধ অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতীয় বিহারের অনুকরণে ব্রহ্মে প্রত্যেক প্যাগোডার সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের অনুকরণে ব্রহ্মী বৌদ্ধগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ফুঙ্গী ব্রত (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতেন; তাঁহারাই ব্রহ্ম দেশের জাতীয় শিক্ষক। ব্রহ্মরাজ অম্বর্থ এবং তাঁহার পুত্রের অর্থানুকূল্যে বুদ্ধগয়াতে মহাবোধি বিহার নির্মিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও পূর্বদ্বীপাঞ্চল (ইন্দোনেশিয়া): ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে এই সুবিশাল অঞ্চল ভারতমহাসাগর হইতে উত্থিত বিরাট ভূখণ্ড। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ ব্রহ্মের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত। এই দ্বীপাঞ্চল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পূর্বে চীন উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ব্রহ্মের দক্ষিণের মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মালাক্কা ও সিঙাপুর; দক্ষিণ-পূর্বে কম্বোজ, কাম্বোডিয়া, চম্পা, আনাম প্রভৃতি রাজ্য। এই রাজ্যগুলি পূর্বে বৃহত্তর মালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে ইহা **ইন্দোচীন** নামে অভিহিত। কম্বোজের পূর্বে রহিয়াছে লাওস্, টঙ্‌কিন ও আনামের অংশ; মালয়ের দক্ষিণে রহিয়াছে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বর্ণিও (সুবর্ণ দ্বীপ) প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপাবলী। ওলন্দাজ অধিকৃত প্রাচীন সুবর্ণদ্বীপের অধিকাংশ দ্বীপ লইয়া বর্তমানে **ইন্দোনেশিয়া** যুক্তরাষ্ট্র গঠিত (১৯৪৬ ৪৭ খ্রীঃ)।

প্রাচীন যুগে এই সুবিশাল দ্বীপাঞ্চলের সহিত ভারতের প্রথমে বাণিজ্যিক, পরে ধর্মীয় এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্প এবং সভ্যতা এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। (এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।)

ভারত ও সিংহল: দ্রাবিড় জাতির ধারণা যে, দাক্ষিণাত্য হইতে দ্রাবিড়গণ সিংহলে সভ্যতা ও শিল্প প্রচার করিয়াছিল। এই ধারণা ভুল; কারণ সিংহলী ভাষা আর্য এবং সংস্কৃতশব্দ-পুষ্ট। রামায়ণ ইতিহাস না হইলেও রামায়ণের কাহিনী হইতে অনুমান করা যায় যে, আর্যাবর্ত হইতে

অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্র লঙ্কা অর্থাৎ সিংহলে আর্যধর্ম ও সংস্কৃত প্রচার করিয়াছিলেন, অবশ্য রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষসদেরও সভ্যতা ছিল।

চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে সাতশত অনুচরসহ বাংলার রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের উল্লেখ আছে।

অশোকের সময় সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মী ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের বিবরণ আছে। সিংহলের রাজা তিস্‌স মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের স্মৃতি স্মরণার্থ অনুরাধাপুরের চার ক্রোশ দূরে মিহিনতাল পর্বতে একটি ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত স্তূপ নির্মাণ করেন। ইহাই সিংহলে প্রথম বৌদ্ধ স্মারক চিহ্ন।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সিংহলরাজ দুত্‌তগমনি রুয়ানবেলীর স্তূপ নির্মাণ করেন এবং তথাগত ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলি মুক্তাখচিত সুবর্ণপাত্রে সংরক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি অনুরাধাপুরে একটি নবতল বিহার নির্মাণ করেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রাজা মহাসেন অভয়গিরির স্তূপ নির্মাণ করেন। সিংহলে পৃথিবীর বৃহত্তম স্তূপ 'জেতবনম' অনুরাধাপুরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়া ঃ সুপ্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া বা তুর্কিস্থান ভারতবাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থে এই অঞ্চল ইলাবৃত বর্ষ, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। ঐতিহাসিক যুগে বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য স্থাপন করেন। এই পথেই ভারতীয় লিপি খোটানের পথ হইয়া তিব্বতে পৌঁছিয়াছিল। ভারতীয় কুষাণ বংশের আদি নিবাস ছিল মধ্য এশিয়াখণ্ড। তাহারা ছিল প্রথম চীনের বশংবদ। মধ্য এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ জাতিও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুপথে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ঐ পথেই চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

দোমোকোর (মধ্য এশিয়া) প্রাপ্ত প্রাচীর চিত্রে অজন্তার প্রভাব

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতির সহিত

ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। তাহারা ভারতীয় লিপি ও ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করে। কালক্রমে তাহারা ভারতীয় ধর্ম আশ্রয় করে ও শিক্ষায়তন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিজেদের দেশকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এই কার্যে তাহারা ভারতীয় ভিক্ষু ও শিল্পীদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। এই কারণেই মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন গুহা-চিত্র ভারতীয় প্রভাব ও অজন্তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

খোটানে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তির ধ্বংসাবশেষ

দুর্ধর্ষ তুর্ক, মুঘল প্রভৃতি জাতির আক্রমণে এশিয়ার এই অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বোধ হয়, ভূমিকম্পের মতন কোন প্রাকৃতিক কারণে মধ্য এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতার বিপুল বিস্তারের স্মৃতি মরু-বালুকার নিম্নে লুপ্ত হইয়া যায়। আজিও সুদূর তাকলামাকান (গোবি মরুভূমি) হইতে আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রতি বৎসর ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। চীনা সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী সত্যই বলিয়াছেন, "মধ্য এশিয়ার এই ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসের এক গরিমাময় অধ্যায়।"

মধ্য এশিয়াতে যে সকল ভারতীয় ভিক্ষু ধর্মপ্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন কুমারজীব (চতুর্থ শতাব্দী)। তাঁহার পিতা ভারতীয় ব্রাহ্মণ, মাতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার কুচা সম্রাটের ভগ্নী। কুমারজীবের জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর চীন দেশে অতিবাহিত হয়। তাঁহার পূর্ববর্তী ভিক্ষু ধর্মরক্ষের নামও স্মরণীয় (তৃতীয় শতাব্দী)।

আধুনিক কালে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের প্রথম আবিষ্কার করেন রুশ পণ্ডিতগণ। অতঃপর ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকা

খোটানে প্রাপ্ত সংস্কৃত অক্ষরে লেখা পুঁথির পৃষ্ঠা

স্তূপনিম্নে সমাহিত বহু পুঁথি, শিব, হর-পার্বতী, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার চিত্র, বহু ভাস্কর্য নিদর্শন এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বিচিত্র সামগ্রী উদ্ধার করেন। ভারত

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডাঃ অরেল স্টাইন খোটান অঞ্চলের কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ ও বালুকা খনন করিয়া মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্পর্কিত বহু তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাঃ অরেল স্টাইন বলেন, "আমি গোবি মরুপথে ভ্রমণের সময়ে বহু বৌদ্ধস্তূপ, বিহার, বুদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে লিখিত বহু নিদর্শন দেখিয়াছিলাম। আমি যখন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন মনে হইতেছিল, আমি যেন প্রাচীন পঞ্জাবের অন্তর্বর্তী কোন পরিচিত নগরের পরিবেশের মধ্যেই রহিয়াছি।" বাস্তবিক মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর ছিল।

ভারত ও চীন ঃ সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থে চীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপর পক্ষে চ্যাঙ-কিয়েং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভারতভূমিকে সেন-তু অথবা সিয়েন-তৌ অর্থাৎ সিন্ধু তীরবর্তী দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হান বংশের সময় চীনাগণ হিন্দুস্থানকে ইন্‌-তু নামে অভিহিত করেন। ভারতের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে চীনের পরম আত্মীয়তা এবং পণ্যের মাধ্যমে চীন-ভারত সুদূরপ্রসারী বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনসী, চীনপট্ট প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তিকালে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থেও চীনাংশুকের উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, চীন হইতে রেশমী বস্ত্রাদি বাহ্লীক দেশের পথে ভারতে আসিত। চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী ইউনান ফু (বর্তমান কুঙ্‌ মিঙ্‌) নগর হইতে শান রাজ্য ও ব্রহ্মের মধ্য দিয়া একটি বাণিজ্যপথ ছিল। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের সহিত এই পথের সংযোগ ছিল। তিব্বতের মধ্য দিয়াও আর একটি বাণিজ্যপথ ছিল। জলপথে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ চীনের সহিত বাণিজ্য চলাচল ছিল। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র, চামর, অভ্র, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী তাম্রলিপ্ত জলপথে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ও বন্দর ছিল। বহু চৈনিক বৌদ্ধ তাম্রলিপ্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ফা হিয়ান তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছিলেন।

চীন-ভারত বাণিজ্য

অশোক চীনে কোন ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন নাই। অশোকের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীন দেশীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, কুষাণ যুগে জনৈক চৈনিক সেনানায়ক সামরিক অভিযানের পরে মধ্য এশিয়া হইতে একটি সুবর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি চীনে আনয়ন করেন। এই সময় ছিল মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারের যুগ। এই বৌদ্ধমূর্তির মাধ্যমে চৈনিকগণ সর্বপ্রথমে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ জানিতে পারিল। ১২১ খ্রীষ্টাব্দে

চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার

হান রাজত্বকালে সম্রাট খিয়াও-য়ু-র সময়ে জনৈক চৈনিক সেনাপতি মধ্য এশিয়া হইতে একটি অতি সুন্দর মূর্তি চীনে আনয়ন করেন এবং অর্চনা করেন। এই মূর্তি ছিল ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। চীনাভাষায় বুদ্ধকে বলা হয় 'ফুটু'। খ্রীষ্ট জন্মের দুই বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ার জনৈক চীনা নরপতি চীনের রাজাকে কয়েকখানি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। চীনের একটি কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, আনুমানিক ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হান বংশীয় নরপতি মিঙ্‌তি স্বপ্নে শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে একজন হিরণ্ময় পুরুষ দর্শন করেন। পরদিন প্রভাতে সভাসদ্‌-বর্গের নিকট তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সভাপণ্ডিত নিবেদন করিলেন যে, এই স্বপ্নদৃষ্ট হিরণ্ময় পুরুষ তথাগত বুদ্ধ। সম্রাট মিঙ্‌তি পশ্চিম দেশে অর্থাৎ ভারতের অভিমুখে এই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে একজন দূত প্রেরণ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ধর্মরত্ন (চু-কালান্‌) এবং কাশ্যপ মাতঙ্গ (কাই-য়হ-মোতাঙ্‌) নামক দুইজন গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধশ্রমণ শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসহ চীনের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সম্রাট মিঙ্‌তি-র আদেশে রাজধানীতে এই বৌদ্ধশ্রমণদের জন্য একটি বিহার নির্মিত হয়। এই বিহার 'শ্বেত অশ্ববিহার' নামে পরিচিত। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ অবশিষ্ট জীবন চীনেই অতিবাহিত করেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়।

এই ঘটনার পরেই ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে ধর্মীয় যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। বহু ভারতীয় শ্রমণ চীনদেশে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কালরুচি (২২১-২৮১ খ্রী:), ধর্মরক্ষ (২৮৬ খ্রী:) এবং কুমারজীব (৪০৪ খ্রী:) প্রভৃতি মহাজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বহু চৈনিক শ্রমণ এবং ভিক্ষু মূল ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি ও বৌদ্ধতীর্থ দর্শনমানসে ভারতে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ফা-হিয়ান (৩৯৯-৪১৪ খ্রী:), হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫ খ্রী:) এবং ইৎসিঙের (৬৭৮-৬৮৫ খ্রী:) ভ্রমণকাহিনী ভারতের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

চীনের সঙ্গে ধর্মীয় যোগাযোগ

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় সামাজিক পরিবর্তন

ভারতীয় সমাজের গতি বৈদিক যুগ হইতে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত একই স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। অবশ্য অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ভারতের পূর্বপ্রান্তে অতি স্বল্প পরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম মহারাজ অশোক কর্তৃক রাজধর্মরূপে গৃহীত হইবার পর উহা সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মৌর্যযুগে ধর্ম পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। শুঙ্গ

এবং কাণ্ব রাজবংশ ব্রাহ্মণ ছিল। এই দুই বংশের একশত সাতায় বৎসর-ব্যাপী রাজত্বে ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা এবং আত্মরক্ষামূলক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ ছিলেন নির্দেশক। রাজাই ছিলেন ধর্ম ও সমাজের রক্ষক। এই সময়ে বাহির হইতে গ্রীক, পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধর্মে ও সমাজে নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পুরাণের প্রচ্ছদপটে বৈদিক বা সনাতন ধর্মের নূতন রূপদান করা হইল। ব্রাহ্মণগণ রামায়ণ-মহাভারতের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ স্পষ্টতর করিয়া অঙ্কিত করিলেন।

ধর্মের সমন্বয়

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করেন এবং বিশৃঙ্খল সমাজে সুশৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করেন। বহিরাগত জাতিগুলিকে আকর্ষণের জন্য সাড়ম্বরে নূতনভাবে পূজাপদ্ধতি ব্যবস্থিত হইল। রাজদূত হেলিওডোরাস, কুজুল (নায়ক) কদফিস, বিম কদফিস প্রভৃতি বিদেশীয় গুণিগণ ভারতীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দুধর্মের প্রভাববিমুক্ত ছিলেন না। তাঁহার সময়ে হিন্দু দেবতা এবং দেবকল্পনা, পূজা ও অনুষ্ঠান মূলতঃ মহাযান পন্থার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সময় হইতে বুদ্ধ অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির আলোচনায় ভাষা ছিল সংস্কৃত। পালির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার পুনরাবির্ভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ইঙ্গিত করে। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে সমাজে নূতন করিয়া জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতি পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদেশী রাজন্যবর্গ এবং রাজ পরিবার ক্ষত্রিয় আখ্যা লাভ করিয়া সমাজে গৃহীত হইল। সমাজের বৃত্তিজীবী শ্রেণী বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। বিদেশাগত নারী-পুরুষের রক্ত-সংমিশ্রণে ভারতে সামাজিক ব্যবস্থা শ্লথ হওয়ায় নানা সংকর বর্ণের উদ্ভব হইল। সংকরগণও ভারতীয় সমাজে অপাংক্তেয় রহিল না। গুপ্তযুগে এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। গুপ্তযুগে চতুর্বেদ ভারতীয় ধর্মের মূলগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থই ভারতীয় আর্যসমাজে ধর্মগ্রন্থ-রূপে প্রাধান্য লাভ করিল।

জাতিভেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় নারীর অধোগতি ঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনের ফলে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুসংবদ্ধ মৌর্য রাজশক্তির প্রভাবে সমাজ ধ্বংস হয় নাই। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক, শক, পারদ, কুষাণ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বৈদেশিক জাতির আক্রমণে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা দ্বিতীয় বার বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। এই বৈদেশিক জাতিগুলি ভারতের সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিল—ভারতীয়দের সহিত বিদেশীয়দের

রক্ত সংমিশ্রণ হইল—ভারতীয় সমাজের শুচিতা নষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মেধাতিথি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার বিধি-নিয়ম সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থগুলি স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। এই গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে নারীসংক্রান্ত বহু বিধি-নিষেধ রহিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত এই বিধি-নিষেধগুলি ভারতীয় নারীর অধোগতি প্রমাণ করে।

মনু ও নারী

ভারতীয় সমাজে নারীর তিনটি রূপ—কন্যা, জায়া, জননী। বৈদিক যুগে উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ হইত—স্বয়ংবর প্রথাও প্রচলিত ছিল। কন্যার পক্ষে বেদপাঠ, শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ ছিল না। নারীর পক্ষে কুমারী-জীবন যাপন অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু বৈদেশিক উপস্থিতির ফলে নারীকে অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখা সমাজপতিগণ সমীচীন মনে করেন নাই, সুতরাং নবম বৎসরের পূর্বে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষার পথও রুদ্ধ হইয়া আসিল; (অবশ্য মনু বলিয়াছেন, নারী-শিক্ষা অবশ্যকর্তব্য) নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল। বিবাহ নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইল। পুত্রলাভই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। কন্যার জন্ম অনেক স্থলেই অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হইত। নারীর পক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত বলিয়া ঘোষিত হইল। পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত—নারীর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ ছিল। নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে ষোড়শ প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া ঘোষিত হইল, যথা—প্রজাপত্য, বার্হস্পত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ ইত্যাদি। সতীদাহ প্রথা রাজপরিবারে এবং সমাজের উচ্চ-বর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মন্দির ও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নারী দেবদাসী বলিয়া সমাজে অপাংক্তেয় ছিল না।

নারী ধর্মপত্নীরূপে সমাজে প্রশস্ত স্থানের অধিকারিণী ছিলেন। জায়ারূপে নারী ছিলেন সংসারের গৃহিণী এবং মাতারূপে নারী ছিলেন সন্তানের শিক্ষাদাত্রী। শাস্ত্রকার মেধাতিথি বলেন—স্ত্রীর নিকট স্বামী দেবতা ও প্রভু; স্বামিসেবা স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামীর কর্তব্য ছিল স্ত্রীর প্রতিপালন। সেই জন্যই স্বামীর অপর নাম পতি বা প্রতিপালক। অসৎ চরিত্রা স্ত্রীর জন্য বংশদণ্ডাঘাত ও রজ্জুবন্ধনের বিধান ছিল। ব্যভিচারের জন্য পুরুষের মৃত্যুদণ্ড বিহিত ছিল। রুগ্না, বন্ধ্যা এবং দুশ্চরিত্রা নারী পরিত্যাগের বিধান শাস্ত্রানু-মোদিত ছিল। সমাজের উচ্চস্তরে—সম্ভ্রান্ত ও রাজ পরিবারে অবরোধ প্রথা ছিল না। অবগুণ্ঠন সম্ভ্রম ও শালীনতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই যুগের বিধিবিধানগুলি পুরুষ কর্তৃক রচিত; সুতরাং অনেক স্থলে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই সকল বিধি ও বিধান রচিত হইয়াছিল।

রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক : এই যুগে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের অন্যতম প্রধান ক্রেতা ছিল রোমান সাম্রাজ্য। ভারতীয় বিলাস-দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, সূক্ষ্মবস্ত্র, সুগন্ধি মশলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিক প্রভূত অর্থ লাভ করিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক অজ্ঞাতনামা মিশরবাসী গ্রীক কর্তৃক লিখিত "পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী" (লোহিত সাগরের পথের বিবরণ) নামক গ্রন্থে ভারতের সহিত পশ্চিমের জলপথ ও বাণিজ্যের বহু চিত্তাকর্ষক বিবরণ রহিয়াছে। গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, কাশ্মীর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পণ্যদ্রব্য ভৃগুকচ্ছ (বারিগাজা) বন্দরের পথে পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত। এই গ্রীক লেখক প্রতিষ্ঠান (পৈঠান), কল্যাণ, সোপরা, মসলিপত্তম, নীলকণ্ঠ (নেল্‌সিন্থিয়া), গঙ্গেরিডি (গঙ্গানদীর মোহানা) প্রভৃতি বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। শকোত্রা বন্দর একটি ভারতীয় জনবহুল উপনিবেশ ছিল।

মুক্তা, হীরক, বৈদূর্যমণি, ফিরোজমণি প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, নীল, গজদন্ত, চন্দনকাষ্ঠ, কার্পাস ও পত্রোর্ণ বা রেশমী সূক্ষবস্ত্র, পশুচর্ম ইত্যাদি বহু দ্রব্য ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত।

অনুশীলনী

১। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতে গ্রীক আক্রমণের বিবরণ দাও। ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব বর্ণনা কর;

(Give a short account of the Greek invasions in the post-Maurya age. Trace the extent of Greek influence on Indian culture.)

২। কুষাণ জাতির পরিচয় দাও এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজার কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(Trace the origin of the Kushanas. Give an estimate of the greatest king of the Kushana dynasty.)

৩। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় ধর্মের রূপ ও বিদেশীয় রাজসভায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব বর্ণনা কর।

(Give an account of the Indian religion in the post-Mauryan age. Trace the influence of Indian culture in foreign courts in that age.)

৪। মৌর্যোত্তর যুগে রোম ও চীন দেশের সহিত ভারতের ধর্ম ও বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

(Give an account of the Indo-Chinese and Indo-Rome relations in the background of religion and commerce.)

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) মিনান্দার, (খ) গান্ধার শিল্প, (গ) ভারতে শক ক্ষত্রপগণ, (ঘ) নহপান, (ঙ) তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়, (চ) পাণিনি, (ছ) চরক, (জ) জীবক।

(Write short notes on: (a) Minandar, (b) Gandhara Art, (c) Saka Kshatraps of India, (d) Nahapana, (e) Taxila University, (f) Panin (g) Charak, (h) Jivaka.

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের গৌরবময় যুগ

গুপ্ত ও পুষ্যভূতি বংশ

অধ্যায় পরিচয়ঃ কণিষ্কের পরবর্তী দুর্বল কুষাণ রাজগণ আনুমানিক ২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল উত্তর-ভারতে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে কোন শক্তিশালী রাজা বা রাজবংশের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এই সময়েই মধ্যভারতে বাকাটকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণে তাঁহাদিগকে বিন্ধ্যশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক লিচ্ছবীগণও এই যুগে পুনরায় বিপুল গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বাকাটক এবং লিচ্ছবীদের সহায়তা লাভে শক্তিশালী হইয়া পাটলীপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া আবার একটি পরাক্রমশালী রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই সাম্রাজ্যই ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত **গুপ্ত সাম্রাজ্য**। গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি পরাক্রমশালী নরপতি ভারতের শক, কুষাণ ইত্যাদি বৈদেশিক রাজবংশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহাদের সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হয়, বৈদেশিক শক্তির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব বিকাশ লাভ করে। এই যুগেই মুদ্রায় স্বর্ণমান প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাই গুপ্তযুগকে **সুবর্ণ যুগ** আখ্যা দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরিক দুর্বলতা ও বহিঃশত্রু হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ঃ গুপ্ত সম্রাটগণের পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহ নহেন। কুষাণ সম্রাটগণের কর্মচারিরূপে গুপ্ত উপাধিধারী একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণের কোন পূর্বপুরুষ হয়ত কুষাণ সম্রাটগণের অধীন কর্মচারী ছিলেন। পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **শ্রীগুপ্ত**। এই যুগের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ মগধের সন্নিহিত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। শ্রীগুপ্তের পুত্র **ঘটোৎকচগুপ্তও** পিতার ন্যায় মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন কিম্বা অন্য কোন সম্রাটের অধীন সামন্ত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ধারিত হয় নাই।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) ঃ এই বংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই গুপ্তবংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রগুপ্ত পরাক্রমশালী লিচ্ছবীবংশীয়া রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় রাজদম্পতির যুগলমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা মগধ হইতে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত আত্মীয়বর্গের সম্মুখে কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট মনোনীত করিয়া যান। সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণ আপনাদিগকে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে লিচ্ছবী-গুপ্ত বিবাহের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় সিংহাসনারোহণকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে **গুপ্তসম্বৎ** প্রচলন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলীপুত্রে। আনুমানিক ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন।

সমুদ্রগুপ্ত (আঃ ৩৩০-৩৭৪ খ্রীঃ) : পিতার মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। সমগ্র আর্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া 'একরাট্' পদ লাভ করাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে কবি হরিষেণ-বিরচিত শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি আর্যাবর্তের নৃপতি রুদ্রদেব, নাগসেন, চন্দ্রবর্মা, গণপতি নাগ, বলবর্মা এবং নন্দীকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর ভারত বিজয় সমাপ্তির পর সমুদ্রগুপ্ত ভারতের পূর্ব উপকূল অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ কোশলের (মহানদী তীরবর্তী) রাজা মহেন্দ্র, মহাকান্তারের (মধ্য ভারতের অরণ্য অঞ্চলে) ব্যাঘ্ররাজ, বেঙ্গীরাজ (গোদাবরী ও কৃষ্ণা-নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) হস্তীবর্মা, কাঞ্চীর পহ্লবরাজ বিষ্ণুগোপ এবং পালক্করাজ (ত্রিচিনোপল্লী) উগ্রসেন প্রভৃতি বহু নরপতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। আনুগত্য স্বীকার করা মাত্রই সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে সুদূর দক্ষিণ ভারতে প্রত্যক্ষভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করা কষ্টসাধ্য মনে করিয়াই সম্ভবতঃ তিনি এই পরাজিত শত্রুদের প্রতি সুফলপ্রসূ উদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করেন নাই।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে নর্মদা এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। পূর্বে কামরূপ (পশ্চিম আসাম),

ডবাক (পূর্ব আসাম), সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ), উত্তরে নেপাল এবং পশ্চিমে পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁহাকে কর প্রদান করিত। পঞ্জাবের শতদ্রু তীরবর্তী যৌধেয়, মধ্য পঞ্জাবের মদ্রক এবং রাজপুতনা ও মালবের অর্জুনায়ন, আভির প্রভৃতি জাতি কেহ কর প্রদান করিয়া, কেহ কন্যা দান করিয়া, কেহ বা রাজ-পতাকায় গুপ্তসম্রাটের প্রতীক গ্রহণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমের শক, কুষাণ রাজন্যবর্গ এবং সুদূর সিংহলের

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসীমা
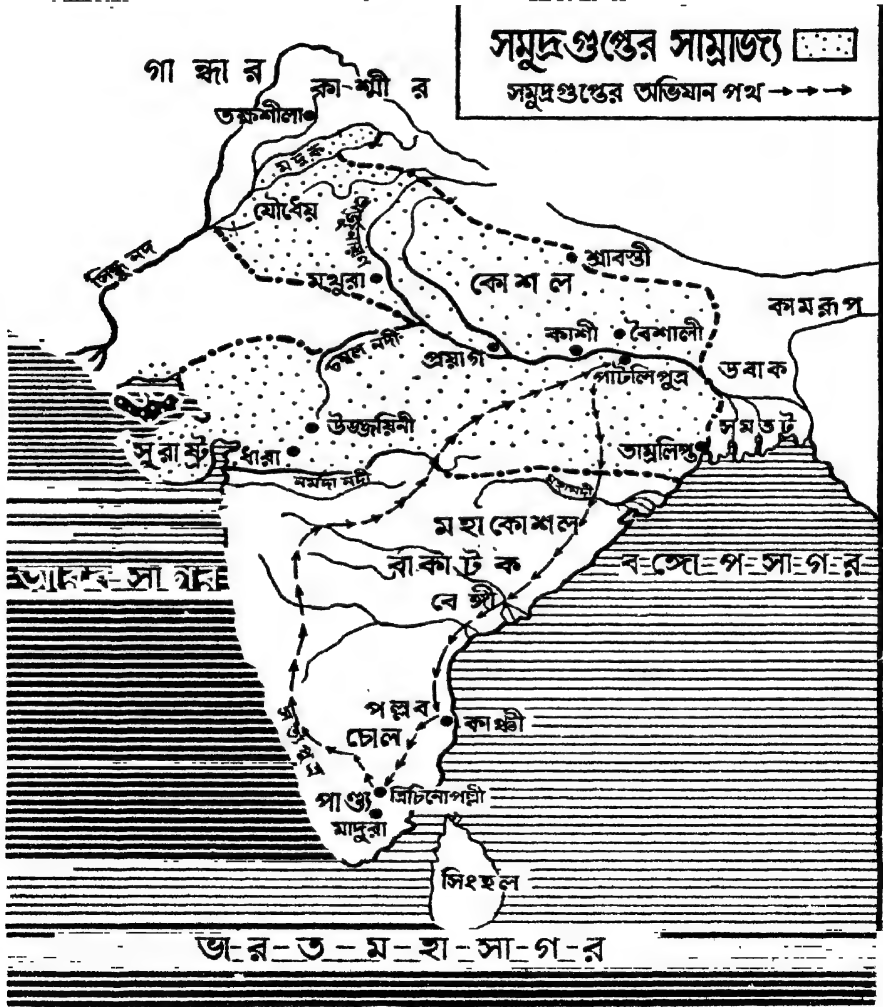
নরপতিও সমুদ্রগুপ্তের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত স্বীয়

ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যরীতি অনুসারে একাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' উপাধি গ্রহণ করেন। এই যজ্ঞের স্মারকরূপে তিনি নূতন সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত করেন। সেই সুবর্ণমুদ্রায় অশ্বমূর্তি উৎকীর্ণ আছে।

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভা

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি একাধারে বীর, যোদ্ধা, সুকবি, সংগীতজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী এবং উদার ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। পিতার ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত দিগ্বিজয় ও 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি তাঁহার সামরিক শক্তি ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন, তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি ইহার নিদর্শন। সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় ক্ষোদিত তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি তাঁহার সংগীত-প্রীতি প্রমাণ করে। সুবিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ লেখক বসুবন্ধু ও সভাকবি হরিষেণের প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দেয়; স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও সমুদ্রগুপ্ত সকল ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একজন চৈনিক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে গয়াক্ষেত্রে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণের অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রাগুলির শিল্পোৎকর্ষ সম্রাটের শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়।

সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (আ: ৩৮০-৪১৫ খ্রী:) : গুপ্তযুগের পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকেই পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

বৈবাহিক নীতি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি কুবেরনাগ নাম্নী এক নাগবংশীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত বাকাটক বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত স্বীয় কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দেন। এই সকল বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা তিনি আপন প্রভাব বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা সুরক্ষিত করেন। এই দুইটি বৈবাহিক সম্বন্ধই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া মালব ও সুরাষ্ট্র অধিকার করেন এবং 'শকারি' নামে পরিচিত হন। শকবিজয় দ্বারা ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিলোপসাধনই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরগুলির মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলির সহিত জলপথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য প্রভূত সমৃদ্ধ এবং ধনৈশ্বর্যশালী হইয়া উঠিল। তিনি উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী মেহেরৌলীর লৌহস্তম্ভের গাত্রে জনৈক চন্দ্ররাজের বিজয়কাহিনী ক্ষোদিত আছে। অনেকের মতে এই চন্দ্ররাজ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। এই লিপিপাঠে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া বাহ্লিক দেশ পর্যন্ত জয় করেন এবং বঙ্গের রাজন্যবর্গকে পরাভূত করেন। তিনি **বিক্রমাদিত্য** উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

পিতা সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী নরপতি ছিলেন। কোন কোন মুদ্রায় এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের প্রাচীন লিপিতে তাঁহাকে 'সূর্যের মতন বিক্রমশীল' এবং 'পাটলীপুত্র ও উজ্জয়িনীর অধীশ্বর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিশেষণ হইতে ইতিহাসকারগণ অনুমান করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ **নবরত্নসভার** পৃষ্ঠপোষক 'শকারি বিক্রমাদিত্য'। বিখ্যাত কবি বীরসেন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, একই সময়ে কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ এবং শঙ্কু নামক সমসাময়িক ভারতের নয় জন মনীষী তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বাকাটক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই মৈত্রী দ্বারা তিনি শক-শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপন করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল **পরম ভাগবত**। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; কিন্তু অন্য ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার একজন সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মধ্যে অন্ততঃ একজন ছিলেন শৈব।

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (আঃ ৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ): দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিও পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের স্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের পুষ্যমিত্র নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত ও বিকম্পিত হয়। পুষ্যমিত্রগণ সম্ভবতঃ নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত বীরবিক্রমে পুষ্যমিত্রদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আসন্ন পতন হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তারপরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হূণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিয়া যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) ঃ কুমারগুপ্তের পর পুষ্যমিত্র ও হূণবিজয়ী স্কন্দগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্থায় তিনিও বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তাঁহার পিতার রাজত্বকালেই তিনি সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হূণ আক্রমণ আরম্ভ হয়। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বুদ্ধি ও বাহুবলে হূণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন। তাঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য সমুদ্র হইতে সমুদ্র—বঙ্গদেশ হইতে সুরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্কন্দগুপ্তের জীবদ্দশায় হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিতে পারে নাই। হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তে কয়েকজন গোপতৃ বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার ইতিহাসে পুরু, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রভৃতির মতন স্কন্দগুপ্তের নামও ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমকালেই মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণগণ পাশ্চাত্যদেশে হত্যা ও ধ্বংসের মহাতাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছিল। এমন কি, বিপুল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও এই ধ্বংসলীলার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। ঐ সময়েই শ্বেতহূণ নামে হূণজাতির একটি শাখা হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণদিগকে প্রতিহত করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সমৃদ্ধি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির স্থায় বিনষ্ট হইয়া যাইত। পরবর্তী কালে হূণগণ খণ্ড ভাবে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে স্কন্দগুপ্তই প্রতিহত করিয়াছিলেন এবং প্রারম্ভেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে না পারিলে সমগ্র ভারতবর্ষকে হূণদিগের ধ্বংস-লীলা হইতে রক্ষা করা কঠিন হইত।

হূণ প্রতিরোধের ফল

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঃ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার পর যথাক্রমে পুরুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য

এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালই ছিল স্বল্পস্থায়ী। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে **বুধগুপ্তের** মৃত্যুর পর অন্তর্বিরোধ এবং হূণগণের প্রবল আক্রমণে গুপ্ত রাজশক্তি বিচূর্ণ হইয়া যায়; পঞ্জাব হইতে মধ্যভারত পর্যন্ত হূণগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মালবের অন্তর্গত মান্দাশোরের অধিপতি যশোধর্মণ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং হূণনেতা মিহিরগুল তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন। এই সময়ে সুরাষ্ট্র, কনৌজ, বঙ্গ এবং অন্যান্য অঞ্চলের সামন্ত রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের সামরিক দুর্বলতা, বারংবার হূণ আক্রমণ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব এবং সিংহাসনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

বঙ্গদেশে গুপ্তাধিকার ঃ সমুদ্রগুপ্ত সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) ব্যতীত প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক ও সমতট। প্রত্যন্ত প্রদেশ হইলেও সমতটের রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। পৌণ্ড্রবর্ধন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বলিয়াই গুপ্ত সম্রাটগণ স্বয়ং এই স্থানের জন্য উপরিক বা ঔপরিক এবং মহারাজ উপাধিধারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন এবং মৌর্যযুগের মতন রাজকুমারগণও কখন কখন এই পদে নিযুক্ত হইতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন। ৫০৭।৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই পূর্ববঙ্গ ও সমতটে গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। একখানি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামক গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন একজন সামন্ত নরপতি ত্রিপুরা অঞ্চলে একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। গুপ্ত রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া বৈন্যগুপ্ত পূর্ববঙ্গে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা। বাংলা দেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসানুসারে তাঁহারাই বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা। এই যুগে বাঙ্গালীর নাম ও উপাধি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যথা—দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের তাম্রশাসনে আছে উপরিকের নাম চিরাতদত্ত; নগর-শ্রেষ্ঠীদের নাম ধৃতিপাল, বিভুপাল ইত্যাদি। কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থদের নাম কৃষ্ণমিত্র, গুহবিষ্ণু, ভবদত্ত, ভদ্রনন্দী, নন্দদাস, রতিভদ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ইত্যাদি। এই সকল নাম ও উপাধি অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত। ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী গুপ্তরাজাদের প্রভাবে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের বর্ণসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং কালক্রমে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সমাজ গড়িয়া উঠে।

ফা-হিয়ানের বিবরণঃ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৌদ্ধ তীর্থ ও বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থাবলী সংগ্রহের জন্য স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কান্দাহার ও পেশোয়ারের পথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং বহু তীর্থ ও প্রসিদ্ধ নগর পরিভ্রমণ করেন। তিনি প্রায় পনর বৎসর (৩৯৯-৪১৪ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জলপথে সিংহল, মালয় এবং যবদ্বীপ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিরানব্বইখানি রেশম বস্ত্রে লিখিত তাঁহার বিবরণ গুপ্তযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সংকলনের অতি মূল্যবান উপাদান।

পাটলীপুত্র

ফা-হিয়ান পাটলীপুত্রে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে পাটলীপুত্র ছিল সুরম্য অট্টালিকা-শোভিত। পাটলীপুত্রের অধিবাসিগণ সমৃদ্ধ ও অর্থশালী ছিল। রোগীর চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলী-পুত্রের পুরাতন রাজপ্রাসাদের শিল্প ও গঠননৈপুণ্যে ফা-হিয়ান বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটলীপুত্রে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় ছাত্রগণ সমভাবে শিক্ষা লাভ করিত।

ফা-হিয়ান গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজা ও রাজকর্মচারিগণ কাহাকেও উৎপীড়ন করিতেন না। দণ্ডবিধি বিশেষ কঠোর ছিল না। প্রজাগণ উৎপন্ন শস্যের অনধিক ষষ্ঠাংশ রাজকর দিত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। সাধারণ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মুদ্রার পরিবর্তে সাধারণতঃ কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ন্যায় ফা-হিয়ান ভারতবাসীর সংযম, চরিত্র ও সামাজিক রীতিনীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত গুপ্তযুগে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে বাঙালী বণিকগণ প্রকাণ্ড জাহাজে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূর দূরান্তর দেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাতায়াত করিত। তাম্রলিপ্তে দুই বৎসর অবস্থানের পর ফা-হিয়ান শীতের প্রারম্ভে বৌদ্ধতীর্থ দর্শন মানসে সিংহল যাত্রা করেন।

ফা-হিয়ান ছিলেন উত্তর চীনের কোন্-সি প্রদেশের অধিবাসী। অতি বাল্যকালে তিনি পিতামাতার ইচ্ছানুসারে বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করেন। শাই (শাক্য) ফা-হিয়ান তাঁহার আশ্রম জীবনের নাম। বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করার পর চৈনিক বৌদ্ধগণ পারিবারিক নাম পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ আশ্রমিক নাম গ্রহণ করিতেন। শাই ফা-হিয়ান নামের অর্থ 'শাক্য-ধর্ম-প্রকাশানন্দ'। **প্রথম চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক রূপে তাঁহার ভারত আগমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আগমনের ফলে চীনের সহিত**

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ছিয়াশি বৎসর বয়সে দক্ষিণ চীনে এই মহাপ্রাণ শ্রমণের দেহাবসান হয়।

গুপ্তযুগের রাষ্ট্রশাসন: গুপ্ত সম্রাটগণ কেবল সুদক্ষ সমরনায়কই ছিলেন না, তাঁহারা সুনিপুণ শাসকও ছিলেন। মৌর্যযুগের ন্যায় গুপ্তযুগও ছিল রাজতন্ত্রের যুগ; উভয় যুগেই রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজা ছিলেন রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক অর্থাৎ তিনি ছিলেন একধারে শাসক, বিচারক ও সমরনায়ক। রাষ্ট্রশাসনে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতিই অনুসৃত হইত। রাষ্ট্রশাসনের সুপরিচালনার জন্য রাজা মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। মন্ত্রী ব্যতিরেকে রাজা মহাবলাধক্ষ্য (প্রধান সেনাপতি), মহাদণ্ডনায়ক (প্রধান বিচারক) এবং কুমারামাত্য (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) নিয়োগ করিতেন। রাজা বৈদেশিক বিভাগের জন্য সন্ধিবিগ্রহিক নিযুক্ত করিতেন। অসংখ্য চর নিযুক্তির জন্য রাজার অন্য নাম ছিল 'সহস্রচক্ষু'।

কেন্দ্রীয় শাসন

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্য দেশ (প্রদেশ), ভুক্তি (বিভাগ), বিষয় (জিলা) এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। দেশের শাসক ছিলেন কুমারামাত্য, ভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে কুমারামাত্য এবং কোথাও বা উপরিক; বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন বিষয়পতি; গ্রামে ছিলেন গ্রামিক। নগর শাসনের জন্য পরিষদ ছিল। অধিকারী নামক কর্মচারী নগরের কার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য জল, অগ্নি ও বিষ দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। মৌর্যযুগের তুলনায় গুপ্তযুগে দণ্ডবিধি লঘু ছিল। উৎপন্ন শস্যের অনধিক ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। ইহা ব্যতীত সামন্ত রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর, খনিকর, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি রাজার প্রাপ্য ছিল।

প্রাদেশিক শাসন

গুপ্তযুগের সামাজিক অবস্থা: গুপ্তযুগ হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের পুনরুত্থান আরম্ভ হয় এবং জাতিভেদ প্রথা প্রসারলাভ করে। গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ফা-হিয়ানের বিবরণে ভারতীয় সমাজের উচ্চ আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ভারতবাসীর সংযত চরিত্র ও ধর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবাসী স্বভাবতঃ ধর্মভীরু ও সত্যবাদী ছিল। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল না। চণ্ডালগণ নগরের বহির্দেশে বাস করিত। সমাজে নারীর স্থান উন্নত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী শাসনকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিতেন। সমাজে রাজমহিষীর বিশেষ সম্মান ছিল। প্রাচীন যুগের স্বয়ম্বর প্রথা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত। উচ্চবর্ণের নারীর পক্ষে বাল্য বিবাহ বা বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। গুপ্তযুগের সমাজে জ্ঞানচর্চা প্রশংসনীয় ছিল। পাটলীপুত্রের বৌদ্ধ মঠ সমসাময়িক বিশ্ববিদ্যায়তনে পরিণত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত সে যুগের একটি প্রসিদ্ধ

শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ভারতের নগরগুলি জনবহুল ও সমৃদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ ভারতবাসী বদান্য ছিল। গৃহস্থ অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে অতিথির জন্য ভিন্ন বাসকক্ষ, শয্যা ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিত। চিকিৎসার জন্য বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন। দরিদ্র রোগীর জন্য সেবায়তন, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা থাকিত। এই সেবায়তনগুলি সাধারণতঃ মঠ, বিহার বা মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ধনী ও বদান্য ব্যক্তিগণ এই সৎকার্যে সহায়তা করিতেন। গুপ্তযুগে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল।

গুপ্তযুগের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায় বাণিজ্য : গুপ্ত সম্রাটগণের সুশাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি হয় এবং ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্যশালী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ে মুদ্রার স্বর্ণমান নির্ধারিত হয়। গুপ্তযুগে বণিকগণ সিংহল, মালয়, কম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে যাতায়াত করিত। এই যুগেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারতীয় বণিক এই সকল দেশে কেবল পণ্যসম্ভারই বহন করেন নাই, ভারতীয় ধর্ম এবং সভ্যতার বাণীও তাঁহারা এই সকল অঞ্চলে প্রচার করিয়াছিলেন। ফলে এশিয়ার বহু স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে এবং গুপ্তযুগের সমকালে ভারতের বাহিরে এক **বৃহত্তর ভারত** গড়িয়া উঠে।

পণ্য

গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের বয়ন ও বস্ত্রশিল্পের অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই যুগের চিত্র, ভাস্কর্য এবং 'অমরকোষ' নামক গ্রন্থ হইতে গুপ্তযুগে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির প্রমাণও পাওয়া যায়। কার্পাস, ক্ষৌম, কাষায় প্রভৃতি সকল প্রকার বস্ত্রই এই যুগে প্রস্তুত হইত। বঙ্গের মসৃণ বস্ত্র বা মসলিন ও বারাণসীর রেশমী বস্ত্র বিখ্যাত ছিল। গজদন্ত শিল্পেও গুপ্তযুগের খ্যাতি অপূর্ব। স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মণি ও রত্ন শিল্পে এত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, রত্নপরীক্ষা বিদ্যা চৌষট্টি কলাবিদ্যার অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইত। গুপ্তযুগে মুক্তাশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মেহেরৌলীতে চন্দ্র-রাজের নামাঙ্কিত লৌহস্তম্ভ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়।

বন্দর

গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বহুসংখ্যক সমুদ্র-বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ ছিল বিখ্যাততম। গঙ্গা নদীর মোহনায় তাম্রলিপ্ত ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সকল বন্দর হইতেই ভারতীয় বাণিজ্যতরী পণ্যসম্ভার বহন করিয়া পশ্চিমে পারস্য ও আফ্রিকা এবং পূর্বে মালয়, ইন্দোচীন, চীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত হইতে একটি বাণিজ্য-তরীতে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করেন। তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল ছিল চৌদ্দ দিনের পথ।

ভারতবর্ষ হইতে চন্দন, তিল, জাফরান, কর্পূর, মুক্তা, প্রবাল, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য দেশবিদেশে রপ্তানি হইত। চীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত রেশম এবং মসলা ভারতীয় বণিক পশ্চিম দেশে বিক্রয় করিত।

ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদও ছিল প্রচুর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খনি হইতে বহু পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লবণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইত। শ্রেণী, নিগম প্রভৃতি সংস্থা পূর্বে ভারতবর্ষের উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিত। গুপ্তযুগে সেই সকল সংস্থার প্রভূত উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিগ্রন্থাদিতে এই সংস্থাগুলির গঠন, কার্যক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে লভ্যাংশ বিতরণ, ঋণ গ্রহণ বা দান, কুসীদের অনুপাত (বা সুদের হার) নির্ধারণ, অসাধুতার প্রতীকার-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা হইতে অনুমিত হয় যে, গুপ্তযুগের এই বাণিজ্য সংস্থাগুলি অত্যন্ত সুপরিচালিত ছিল। এই যুগের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে এই সংস্থাগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

বণিক-সংস্থা

গুপ্তযুগের ধর্ম: গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজার ধর্ম ছিল। অনেকের ধারণা গুপ্তযুগ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম কখনও ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই ; এমন কি, মৃতকল্পও হয় নাই। অশোকের সময় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অশোক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আঘাত করেন নাই। মৌর্যবংশের অবসানেই গাঙ্গেয় অঞ্চলে শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক রাজা বাজপেয়, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুঙ্গ ও কাণ্বংশের রাজগণ বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে আগত রাজবংশগুলি সমভাবে বৌদ্ধ, শৈব এবং ভাগবত (বৈষ্ণব) ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শৈব ও ভাগবত ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল ভক্তি।

গুপ্তযুগের ধর্মে ভক্তির আধিক্য সুস্পষ্ট। ভাগবত বৈষ্ণব অথবা ভক্তিধর্মের মূল কথা হইল—ভগবানে অনুরক্তি এবং জীবে দয়া। ভগবানকে রূপময় কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন ও তাঁহার করুণা যাচ্ঞা করাই ভাগবত ও শৈব ধর্মের বিশেষত্ব। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মে বৈদিক যুগের যজ্ঞবিধি অপেক্ষা ভক্তিমূলক পূজার অনুষ্ঠান অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই যুগের শিল্পনিদর্শনে বিষ্ণু, সূর্য, কার্তিকেয়, তীর্থংকর ও বুদ্ধের উৎকীর্ণ মূর্তি দেখিয়া মনে হয়, এই সকল দেবতা সমভাবে পূজিত হইতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে পরম ভাগবত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগবত ধর্ম

ধর্মে উদারতা গুপ্তযুগের বিশেষত্ব। গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণব হইলেও

শৈব ও বৌদ্ধদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ তীর্থংকর এবং বুদ্ধকে দ্বিধাহীন অর্ঘ্যও প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এই সময় বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপেও অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। ফা-হিয়ান বলিয়াছেন,—গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের ভারতবাসীর পূজা-অনুষ্ঠানের সময় বিপুল আড়ম্বর সহকারে উৎসব ও দেবমূর্তিসহ শোভাযাত্রা করিত। পূজা উপলক্ষে উৎসব এবং শোভাযাত্রা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। গুপ্তযুগের ধর্মে উদারতা ফা-হিয়ানকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাণ-রচিত হর্ষচরিতে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন, ভাগবত (বৈষ্ণব), সৌগত (বৌদ্ধ), আজীবিক (তান্ত্রিক) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, গুপ্তযুগেও এই সকল ধর্মসম্প্রদায় বর্তমান ছিল। ইহা ভিন্ন বৈদান্তিক নৈয়ায়িক, বৈশেষিক মতবাদী এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

সারনাথের বুদ্ধমূর্তি

গুপ্তযুগে কয়েকজন খ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যথা—অনঙ্গ, বসুবন্ধু, কুমারজীব এবং দিঙ্‌নাগ। তাঁহাদের মতবাদ অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় গঠিত হয়।

শৈব ও বৈষ্ণবগণ জৈন তীর্থংকরদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। এই সময় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রাচারী বৌদ্ধদের আচার ও নিয়মপদ্ধতি গ্রহণ করে। গুপ্তযুগের ধর্মে একটা সমন্বয়ী উদার ভাব ছিল, অবশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম নূতন ভাবে রূপায়িত হইয়া সর্বভারতে জনপ্রিয় হইয়াছিল। গুপ্তযুগকে পৌরাণিক ধর্ম বা হিন্দুধর্মের পূর্ণ বিকাশের যুগ বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য ঃ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসেও গুপ্তযুগ এক পরম গৌরবময় যুগ। এই সময় ভারতীয় সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি তাঁহার সংগীতের প্রতি অনুরাগ জ্ঞাপন করে। গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুধর্মে দেবদেবীর মূর্তিপূজা বা মূর্তি নির্মাণের বিশেষ প্রচলন

ছিল না। গুপ্তযুগে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী নির্মিত হয়। উহাদের মধ্যে মথুরার ব্রোঞ্জ ও সারনাথের প্রশান্ত বুদ্ধ মূর্তি এবং মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত দেওগাঁয়ের শিব ও বিষ্ণুমূর্তি বিখ্যাত। গুপ্ত ভাস্কর্য বহুলাংশে বিদেশী প্রভাবমুক্ত। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মূর্তিশিল্পের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে মূর্তিশিল্পে ভারতীয় মনীষা ও নৈপুণ্যের চরম বিকাশ হইয়াছিল। গুপ্তযুগের শিল্পে ভারতীয় আদর্শের নির্মলতা, চিন্তার গভীরতা এবং গঠনে সূক্ষ্ম নিপুণতার সমন্বয় এবং সুষ্ঠু বিকাশ হইয়াছিল।

মূর্তি শিল্প বা ভাস্কর্য

বৈদিকযুগের যজ্ঞশালার পরিবর্তে মূর্তি, মন্দির ও দেবায়তন রচনা গুপ্তযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির নির্মাণশিল্পও এই যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। গুপ্ত যুগের দেবায়তনগুলি এক হইতে ষোড়শতল পর্যন্ত উচ্চ ছিল। ঐগুলি ব্রহ্মচ্ছন্দ (চতুর্ভুজ), বিষ্ণুচ্ছন্দ (অষ্টভুজ), ইন্দ্রচ্ছন্দ (ষোড়শভুজ), রুদ্রচ্ছন্দ (বৃত্তাকার) ছিল। বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক শিল্পগ্রন্থে ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যার অপূর্ব বিবরণ পাওয়া যায়। এই শিল্পগ্রন্থ ভারতীয় জ্যামিতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ প্রমাণ করে। গুপ্তযুগের বহু গৃহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল। গুপ্তযুগের মন্দিরগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও মধ্যপ্রদেশের দেওগাঁও এবং ভিতর গাঁওয়ের মন্দির গুপ্ত স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। গুপ্তযুগে তীর্থ, বিগ্রহ ও দেবায়তনকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ, শৈব, ভাগবতগণ সর্বভারতে এক নূতন ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছিল।

অজন্তার চিত্র

গুপ্তযুগে ভারতীয় চিত্র-শিল্পেরও চরম উন্নতি হইয়াছিল। বিখ্যাত অজন্তা গুহাগাত্রের চিত্রাবলীর অধিকাংশই গুপ্তযুগের অবদান। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই গুহা খনন, গুহাগাত্রে চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি রচনা কার্য চলিয়াছিল। সুদীর্ঘ আট শত বৎসরকাল একই আদর্শে এইরূপ গভীর নিষ্ঠাসহকারে শিল্পসাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অজন্তা সত্যই ভারতের শিল্পতীর্থ। এই সকল চিত্রের মহতী ভাবকল্পনা, সুচারু বর্ণবিন্যাস ও সুনিপুণ রেখাঙ্কনের যে সামান্য আভাস অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই পৃথিবীর শিল্প-

গুপ্তযুগের চিত্রশিল্প

রসিকগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। গুপ্তযুগের শিল্প, পরবর্তী কালের ভারতীয় শিল্পের আদর্শ ছিল। বহির্ভারতের যবদ্বীপ, বরবুদুর, শ্যাম, কাম্বোজের শিল্পে গুপ্তযুগের শিল্পের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গুপ্তযুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন পাটলীপুত্রের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট এবং মালবের বরাহমিহির। আর্যভট্টই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ বিজ্ঞানজগতের অমূল্য সম্পদ। এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্য সংখ্যার সাহায্যে সকল অঙ্ক লিখন, দশমিক পদ্ধতি, ঘনমূল, বর্গমূল, দ্বিঘাতসমীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি এই যুগেরই দান। বরাহমিহিরের পৌলিশ সিদ্ধান্তে অলকসন্দার (আলেকজান্দ্রিয়া) অধিবাসী গ্রীক জ্যোতির্বিদ পল এবং রোমক সিদ্ধান্তে রোমের জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেখ হইতে মনে হয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা কূপমণ্ডুক ছিল না। দিল্লীর অদূরবর্তী চন্দ্ররাজ (বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) নির্মিত লৌহস্তম্ভ ধাতুশিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। পনর শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইলেও আজিও উহা অমলিন রহিয়াছে। জার্মাণ বৈজ্ঞানিকগণও এই স্তম্ভে ব্যবহৃত লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই।
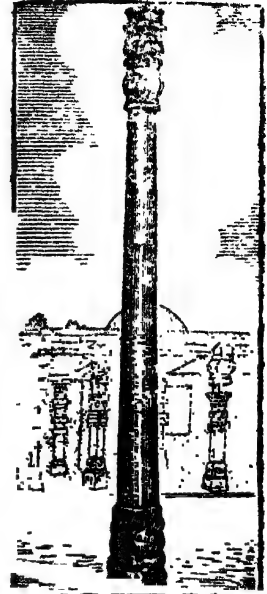
দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও সমৃদ্ধিলাভ করে। গুপ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কবি ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল কবিরাজ। তাঁহার সভাকবি হরিষেণ একটি বিরাট রাজপ্রশস্তি রচনা করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনেরও কবিখ্যাতি ছিল। অনেকের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় মহাকবি কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের সমাবেশ হইয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য ও নাটকগুলি রচনা করেন। তাঁহার রচিত কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটক বিশ্ব সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা শূদ্রক এবং মুদ্রারাক্ষস নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত ছিলেন গুপ্তযুগের অলংকার। বৌদ্ধ দর্শনের উজ্জ্বলতম রত্ন অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামক ভ্রাতৃদ্বয় এই গুপ্তযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরাশর, মনুস্মৃতি ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র গুপ্তযুগেই পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই যুগেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় এবং বর্তমান আকার ধারণ করে।

গুপ্তযুগের সাহিত্য

গুপ্ত সুবর্ণ যুগঃ রাজবংশের সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব, ক্রমান্বয়ে পাঁচজন শক্তিশালী সম্রাটের অস্তিত্ব, সুবিশাল দিগ্বিজয় ও সুশাসনের কৃতিত্ব, বৈদেশিক শত্রু বিতাড়ন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিকাশ এবং সাহিত্য ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই গুপ্তযুগের অপূর্ব উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া যায়, অবশ্য গুপ্তযুগের পূর্বে কুষাণ যুগের শেষভাগ হইতেই এক নব জাগরণের সূচনা হইয়াছিল, গুপ্তযুগে উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বিখ্যাত সমালোচক কুমারস্বামী গুপ্তযুগকে 'ভারতীয় মনীষার চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের যুগ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বার্ণেট গুপ্তযুগকে এথেন্সের পেরিক্লিয়ান, রোমের অগস্টান এবং ইংলণ্ডের এলিজাবেথান যুগের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাঃ গুপ্ত বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতেই গুপ্ত সাম্রাজ্য অতি দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইল। দুর্ধর্ষ হুনজাতির প্রবল আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল, হুনজাতি পঞ্জাব হইতে মধ্য ভারত পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের এই বিপর্যয়ের সুযোগে বঙ্গ, কনৌজ, মালব, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্ত নরপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। গুপ্তবংশীয় রাজগণ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিলেও গুপ্তবংশের লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার হইল না। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারতীয় নরপতিগণ হুন আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য আত্মপ্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তাঁহাদের মধ্যে চলিতেছিল। বিবদমান রাজ্য ও রাজন্যবর্গের মধ্যে মান্দাশোরের যশোধর্মণ, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ, কনৌজের মৌখরী রাজগণ থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশ, গুজরাটের অন্তর্গত বলভীর মৈত্রকবংশ এবং কলিঙ্গের চেতবংশ বিখ্যাত। এই সময় দাক্ষিণাত্যে শক্তিশালী চালুক্য বংশ এবং সুদূর দক্ষিণে পহ্লবগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

হুণ আক্রমণঃ হুন নায়ক তোরমান ও মিহিরগুল শিয়ালকোট হইতে রাজপুতনা পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় নরপতি বালাদিত্য হুনদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু হুনজাতি পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করে। অবশেষে মালব-রাজ যশোধর্মণ হুননায়ক মিহিরগুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু মাতার অনুরোধে যশোধর্মণ মিহিরগুলকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মিহিরগুল কাশ্মীরে আশ্রয় লাভ করিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই কাশ্মীররাজকে হত্যা করিয়া তিনি কাশ্মীর অধিকার করিলেন। অতঃপর মিহিরগুল পঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু অধিবাসীকে হত্যা করিলেন। তারপর তিনি ঐ অঞ্চলের বহু বৌদ্ধ স্তূপ, মূর্তি

মিহিরগুল

ও বিহার ধ্বংস করিলেন। এইভাবে কুষাণ নরপতিগণ কর্তৃক নির্মিত বহু শিল্পনিদর্শন হূননায়ক কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মিহির-গুলের মৃত্যু হয়। ইহার পরেও ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বিভিন্ন হূনদল বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিতে থাকে।

মিহিরগুল

কামরূপ: বর্তমান আসাম প্রদেশেই প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপরাজ্য অবস্থিত ছিল। কামরূপে বর্মণ উপাধিধারী দ্বাদশ জন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কামরূপ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ ছিল এবং কামরূপরাজ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কর প্রদান করিতেন। এই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে এই বংশের প্রথম নরপতি পুষ্যবর্মণকে স্বীয় সামন্তরূপে কামরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামরূপ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বংশের অষ্টম নরপতি মহারাজাধিরাজ ভূতিবর্মণ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডবাত রাজ্য (বর্তমান নওগাঁ অঞ্চল) এবং সুরমা উপত্যকা অঞ্চল জয় করিয়া স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে যে, মহারাজ ভূতিবর্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বংশের একাদশতম নরপতি সুস্থিতবর্মণ পরবর্তী গুপ্ত-বংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু এই পরাজয়েও কামরূপ রাজ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুস্থিতবর্মণের পর তাঁহার পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মণ কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, কামরূপরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত-বর্মণ ও তাঁহার ভ্রাতা ভাস্করবর্মণ জনৈক গৌড় নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনুমান করেন যে, এই নরপতি গৌড়াধিপতি মহাসেনগুপ্ত। সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মণের পর ভাস্করবর্মণ কামরূপ রাজ্য লাভ করেন। ভাস্করবর্মণ গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে উত্তরাপথনাথ হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় কামরূপরাজ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল।

কামরূপরাজ
ভূতবর্মণ

যশোধর্মণ: খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে যশোধর্মণ নামক এক অসাধারণ সমরকুশল নরপতি মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্দাশোর বা দশপুরে। ৫৩২-৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মান্দাশোর লিপিতে তাঁহার বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি হূন দলপতি মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে

যে, তাঁহার বিজয়বাহিনী পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য এই বিজয়কাহিনীর বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতো যশোধর্মণই কিংবদন্তীর বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য। কিন্তু যশোধর্মণ শকারি ছিলেন না—তিনি হূন বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্দাশোরে, উজ্জয়িনীতে নহে। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কোন প্রমাণ নাই। যশোধর্মণের কোন বংশধরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রাজ্য এবং বংশের অবসান হয় এবং তাঁহার সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়।

গৌড়াধিপতি বৈন্যগুপ্ত : হূনজাতির আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলে বৈন্যগুপ্ত নামে গুপ্তবংশের একজন সামন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্বে গৌড় অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশের ইতিহাসে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব (৫২৫-৫৭৫ খ্রীঃ) নামক তিন জন স্বাধীন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ এখনও অজ্ঞাত। লিপি-প্রমাণ হইতে ধারণা হয় যে, গোপচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। গোপচন্দ্রের রাজ্য বর্তমান বর্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমতট অঞ্চলে খড়্গ ও রাতবংশীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙের গুরু শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণবংশীয় রাজকুমার ছিলেন।

রাজা শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০৩-৬৩৮ খ্রীঃ) : সপ্তম শতকের প্রারম্ভে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামক একজন স্বাধীন নরপতি গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন মহাসামন্ত ছিলেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণসুবর্ণের (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা) স্বাধীন নরপতিরূপে শশাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালবরাজ দেবগুপ্ত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সহায়তায় মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে আক্রমণ ও নিহত করিয়া গ্রহবর্মার মহিষী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী করেন। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাভূত করেন, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিবার পূর্বেই শশাঙ্কের কূট চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। ইহার পর হর্ষবর্ধন গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু শশাঙ্ককে তিনি পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শশাঙ্ক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, বুদ্ধগয়া ও উৎকল অঞ্চলে সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল ও গঞ্জাম এবং পশ্চিমে মগধ জয় করেন।

শশাঙ্ক ও কনৌজ

শশাঙ্কের রাজ্যসীমা

শশাঙ্কের কৃতিত্ব: গুপ্ত সম্রাটের অধীনে সামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া শশাঙ্ক সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতিরূপে জীবন অবসান করেন। তিনি স্থানেশ্বর ও মৌখরির মতন সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুকে প্রতিরোধ করিয়া বাংলার রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। হর্ষবর্ধন এবং ভাস্করবর্মনের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের সময় বাংলা দেশ প্রথম উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন ;—এই কাহিনী সমসাময়িক ইতিহাস সম্পূর্ণ সমর্থন করে না। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেন, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম স্বহস্তে কর্তন এবং বুদ্ধমূর্তিটি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং এই পাপের ফলে শশাঙ্কের কুষ্ঠ রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। এই কাহিনী হয়ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ পরিব্রাজকের বিদ্বেষমূলক উপাখ্যান মাত্র।

উড়িষ্যা: উড়িষ্যার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। মহারাজ অশোক কলিঙ্গ বিজয় করিয়া এই রাজ্য মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাতিগুম্ফার ধ্বংসাবশিষ্ট শিলালিপির বিবরণ হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, অশোকের পরবর্তী কালে মহামেঘবাহন নামক চেদীবংশীয় একজন রাজকুমার কলিঙ্গে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শিলালিপিতে এই বংশ 'চেদীবংশ' এবং 'মহামেঘবংশ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই এই রাজবংশ সমকালীন ভারতবর্ষের প্রবলতম শক্তিগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বংশের তৃতীয় নরপতিই বিখ্যাত **খারবেল**। তিনি ষোড়শ বৎসরব্যাপী নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া চতুর্বিংশতি বর্ষে সিংহাসনারোহন করেন। সিংহাসনারোহনের সঙ্গে সঙ্গে খারবেল দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং পরবর্তী দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যথাক্রমে রাজগৃহ, কৃষ্ণানদীর তীরভূমি, বিদর্ভ (বেরার) অঞ্চলের রাষ্ট্রিক ও ভোজক, অন্ধ্রদেশ অঞ্চলের পৃথুড়দিগকে এবং মগধের বহসতিমিত (বৃহস্পতিমিত্র) নামক নরপতিকে পরাভূত করেন বলিয়া শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। খারবেল সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজকেও পরাভূত করিয়াছিলেন।

খারবেল

খারবেল নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। তাহাকে 'ভিক্ষুরাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। কিন্তু তিনি পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। খারবেল স্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পুনর্গঠনে তিনি নিপুণ ছিলেন। তাঁহার প্রজানুরঞ্জন-প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল নৃত্যগীত ও উৎসবের ব্যবস্থা। তিনি ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত রাজধানীর সংস্কার করেন এবং একটি প্রাচীন জলসেচ সংস্কার করেন। ভুবনেশ্বরের নিকট খণ্ডগিরিতে তিনি বহু গুহা খনন করাইয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়।

খারবেলের গুণাবলী

পরবর্তী কলিঙ্গ রাজগণ : অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা —খারবেলের মৃত্যুর পরেই কলিঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে কলিঙ্গের অবদান অপরিসীম। কথিত আছে, কলিঙ্গ হইতে বিংশতি সহস্র সন্তান ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে একটি বিরাট উপনিবেশ গঠন করিয়াছিল। পরবর্তী কালে কলিঙ্গরাজ্য গুপ্ত সামাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই ঐতিহাসিকগণের অনুমান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের যুগে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলে **মানবংশ** এবং দক্ষিণাঞ্চলে **শৈলোদ্ভবগণ** রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই রাজবংশের পরস্পর সম্বন্ধ অজ্ঞাত। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়রাজ শশাঙ্ক এই দুইটি রাজ্যই অধিকার করিয়াছিলেন। শৈলোদ্ভব বংশীয় দ্বিতীয় সৈন্যভীত (দ্বিতীয় মাধবরাজ) মহারাজ শশাঙ্কের অধীনে সামন্ত নরপতি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু তিনি মানবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বীয় কর্মচারী সোমদত্তকে প্রথমে উৎকল ও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা এবং পরে সামন্ত মহারাজ রূপে নিয়োগ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শৈলোদ্ভব বংশীয় সৈন্যভীত নামক রাজা উড়িষ্যার বহুলাংশ অধিকার করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই হর্ষবর্ধন উৎকল এবং কোঙ্গদরাজ্য (কলিঙ্গের উত্তরাংশ) অনায়াসে জয় করেন।

কনৌজের মৌখরী বংশ : খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া মৌখরী নামক এক শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। যশোধর্মণের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কাল মৌখরীগণই হুণ আক্রমন প্রতিহত করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মণ এই বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি। মৌখরীগণের প্রভাব বিস্তারের ফলে মগধের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের সহিত তাঁহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সংগ্রামে কখনও গুপ্তগণ এবং কখনও মৌখরীগণ জয়লাভ করেন---কিন্তু অবশেষে মৌখরীগণই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠেন। গঙ্গা-যমুনার দো-আব অঞ্চল এবং অযোধ্যা-মগধেও তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই বংশের শেষ নরপতি গ্রহবর্মণ স্থানেশ্বরাধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ইহাতে মৌখরী-বংশের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পরই মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহায়তায় কনৌজ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গ্রহবর্মনের মৃত্যু হয় এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন।

স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব পঞ্জাবে বৈশ্যজাতীয় পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশের রাজধানী ছিল স্থানেশ্বর। পুষ্যভূতিরাজ **প্রভাকর-বর্দ্ধন** হূন, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া

শক্তি সঞ্চয় করেন। তিনি কনৌজের অধিপতি গ্রহবর্মণের সহিত স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **রাজ্যবর্ধন** স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬৩০ খ্রীঃ)। কিন্তু

রাজ্যবর্ধন ও রাজ্যশ্রী

এই সময়েই মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণ নিহত হইলেন এবং তাঁহার মহিষী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হইলেন। সম্ভবতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধা রাজ্যশ্রী একজন অমাত্যের সহায়তায় পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রহবর্মণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাজ্যবর্ধন কনৌজ আক্রমণ করেন এবং দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গৌড় বা কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক কর্তৃক (অথবা শশাঙ্কের প্ররোচনায়) তিনি নিহত হন।

হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য (৬০৬-৬৪৭ খ্রী): রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কুমার **হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য** ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবিলম্বে তিনি ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজ্যশ্রী নিরাশ হইয়া বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আত্মবিসর্জনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর হঠাৎ হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হন ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। ভগ্নীর উদ্ধার সাধন করিয়া তিনি কনৌজে

হর্ষবর্ধন

প্রত্যাবর্তন করেন এবং মন্ত্রী ভাণ্ডী ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর অনুরোধে কনৌজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই **হর্ষাব্দ** আরম্ভ হয়। হর্ষবর্ধন কনৌজের

হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর

ইতিহাসে **কুমার শিলাদিত্য** নামে পরিচিত। তাঁহার কুমার উপাধি হইতে ধারণা করা যায় যে, হয়ত বা হর্ষবর্ধন আনুষ্ঠানিকভাবে কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। কিন্তু হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজধানী স্থানেশ্বর হইতে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতে কনৌজ নগরী উত্তরাপথের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে পাটলীপুত্রের মতন প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধি ছিল মরীচিকার মতন লোভনীয়—সর্বনাশিনী।

হর্ষবর্ধন ছিলেন পরাক্রমশালী নরপতি। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে শাস্তিদানের জন্য হর্ষবর্ধন পশ্চিমে মালবরাজ

মাধবগুপ্ত এবং পূর্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এই মৈত্রী তাঁহার ভেদনীতি, শক্তিসাম্য স্থাপন ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শশাঙ্ক যে ৬১৯ হইতে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে স্বাধীনভাবে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। হর্ষবর্ধনের পাঁচ সহস্র হস্তী, বিশ সহস্র অশ্ব এবং অর্ধলক্ষ পদাতিক সৈন্য
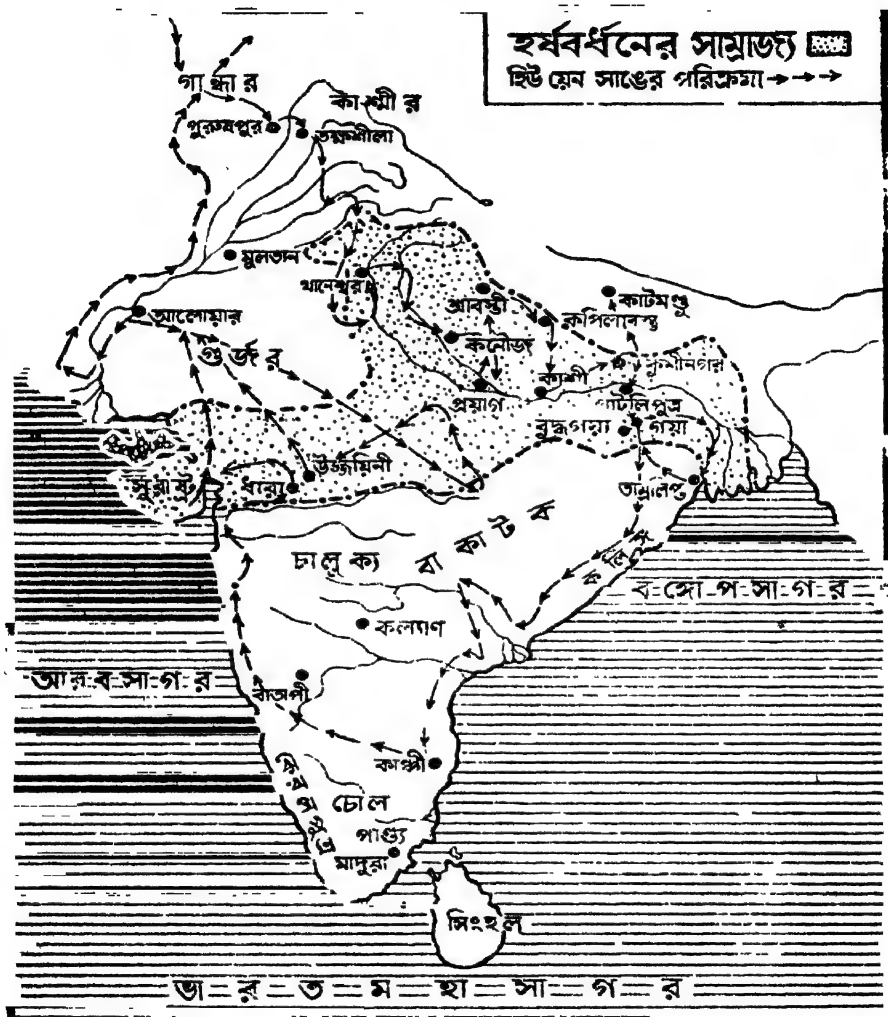
সমন্বিত বিজয়বাহিনী উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য জয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চালুক্য নরপতি পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। সুরাষ্ট্রের বলভীরাজ ধ্রুবসেন (মতান্তরে ধ্রুবভট্ট) হর্ষবর্ধনের নিকট পরাভূত হইয়া কনৌজের অধীনতা স্বীকার করেন। বলভীরাজ ধ্রুবসেন হর্ষবর্ধনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ পর্যন্ত জয় করেন এবং মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে গঞ্জাম জেলার কোঙ্গদ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা পূর্ব পঞ্জাব হইতে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি ছিলেন 'সকলোত্তরপথনাথ'। ডাঃ ত্রিপাঠী হর্ষবর্ধনের এই রাজ্যসীমা কাল্পনিক বিবেচনা করেন।

হর্ষের দিগ্বিজয়

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি স্বয়ং শাসনব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসরান্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিতেন। শাসনসংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই তাঁহার নিজের হস্তে ছিল, অবশ্য রাজ্যে একটি 'রাজ-কর্মচারী সভা' ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি ভুক্তি বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি ভুক্তি কতকগুলি বিষয় বা জেলার সমবায়ে গঠিত হইত। জনসাধারণ করভারে প্রপীড়িত হইত না। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। তাঁহার সময় দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া যেখানে যাইতেন, সেখানে সদ্য প্রস্তুত প্রাসাদে বাস করিতেন, কারণ তখন গুপ্তহত্যার সম্ভাবনা ছিল। দুইবার হীনযানী বৌদ্ধগণ এবং ব্রাহ্মণগণ হর্ষবর্ধনকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

হর্ষবর্ধনের রাষ্ট্রবিভাগ

মহারাজ হর্ষবর্ধন প্রজানুরঞ্জক নরপতি ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালের ন্যায় তাঁহার শাসনকালও পান্থশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের জন্য স্মরণীয়।

হর্ষবর্ধন যে কেবল নিপুণ যোদ্ধা ও শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন তাহা নহে, তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, পঞ্চাঙ্ক নাটক, নাগানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট, সূর্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্ট প্রভৃতি কবি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের প্রতি তাঁহার বন্ধু প্রীতি, বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্মানুরাগের পরিচায়ক।

হর্ষবর্ধনের বিদ্যোৎসাহিতা

হর্ষবর্ধনের পিতা ছিলেন সূর্য উপাসক। তিনি তাঁহার বংশানুক্রমিক রীতি অনুসারে শিব ও সূর্য দেবতার উপাসনা করিতেন। তিনি আজীবন

হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে বোধ হয় রাজ্যশ্রী ও হিউয়েন সাঙের প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ: হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা হিউয়েন সাঙ এর ভারতে আগমন, ভারত ভ্রমণ এবং ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপন। ভারত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই চৈনিক সন্ন্যাসী ভারতের তথা চীনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আগমনের পর হইতে শত শত ভারতীয় ও চৈনিক পরিব্রাজক, শ্রমণ এবং সন্ন্যাসী চীন ও ভারতের মধ্যে একটি অপূর্ব মিলনের সেতু রচনা করেন। দুই মহাদেশের মধ্যে সুদৃঢ় আত্মীয়তা, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হয়। এই মৈত্রী কোন যুদ্ধের অবসানে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত বাধ্যতামূলক মৈত্রী নহে, কোন পণ্য বিনিময়ের জন্য কোন সন্ধি নহে অথবা রাজার সঙ্গে রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ নহে। এই মৈত্রী ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে ভারত ও চীনের মঠে মঠে একই স্বর ধ্বনিয়া উঠিত—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। সেই স্বর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিত।

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ-এর প্রথম জীবন: হিউয়েন সাঙ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের হুনান প্রদেশে এক রক্ষণশীল কনফুসীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দীর্ঘদেহ, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, গম্ভীর মুখশ্রী—সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। ভ্রাতার অনুপ্রেরণায় হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ মঠে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে মহাযান শাস্ত্র আয়ত্ত করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং পূর্ণ সন্ন্যাস বা ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য ভগবান তথাগতের দেশে আগমনের সংকল্প করিলেন। অন্য উদ্দেশ্য ছিল, বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করিয়া তিনি পুণ্য অর্জন করিবেন এবং ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিবেন। পথে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া গোবি মরুপথে চীনের প্রাচীরকে উত্তর-পূর্বে

ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য

রাখিয়া তুরফান, কারাশর, কুচা, তিয়ানশান, তাসখন্দ, সমরখন্দ, বাহ্লীক, কপিশা, নগরহার ও পুরুষপুরের পথে ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। এই সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ছিল এবং এখানে বৌদ্ধগণ বাস করিত। ইতিমধ্যেই এই চৈনিক পণ্ডিতের খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধ জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। কাশ্মীরাধিপতি দুর্লভবর্মণ স্বয়ং পাত্র-মিত্রসহ রাজধানী

প্রবরপুর—তথা শ্রীনগরের বহির্ভাগে বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীররাজ মূল ধর্মশাস্ত্র অনুলিখনের জন্য হিউয়েন সাঙের অধীনে কুড়ি জন লেখক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

দুই বৎসর কাল হিউয়েন সাঙ কাশ্মীরে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ভারতীয় পণ্ডিতের নিকট পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তর্ক, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পূর্ণ দুই বৎসর কাশ্মীরে বসবাসের পর তিনি প্রথমে শাকলে (বর্তমান শিয়ালকোট) আগমন করেন। তারপর জলন্ধর হইয়া তিনি মথুরায় উপস্থিত হইলেন। হিন্দু তীর্থ মথুরা ছিল বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র তীর্থ। মথুরায় তথাগতের প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত, মুদ্‌গল্যায়ন, আনন্দ এবং রাহুলের স্মারক স্তূপ ছিল। মহারাজ অশোকের গুরু সন্ন্যাসী উপগুপ্তের জন্মভূমি ছিল মথুরা।

মথুরা ও কনৌজ দর্শন

মথুরা তীর্থ দর্শনান্তে নদীপথে হিউয়েন সাঙ স্থানেশ্বর (বর্তমান থানেশ্বর), হৃষীকেশ অঞ্চলে হরিদ্বার, অহিচ্ছত্র ও রামনগর দর্শন করিয়া ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমসাময়িক ভারতের শ্রেষ্ঠনগর কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন।

তারপর প্রয়াগে তীর্থদর্শন করিয়া হিউয়েন সাঙ কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলেন। কৌশাম্বীতেই বৌদ্ধগুরু বসুবন্ধু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহাযানপন্থী পণ্ডিত অসঙ্গ এখানেই ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জের অভ্যন্তরে একটি পর্ণ কুটীরে বাস করিতেন। কৌশাম্বীর সঙ্গে বহু বৌদ্ধস্মৃতি জড়িত ছিল।

কৌশাম্বী পরিদর্শনের পরে হিউয়েন সাঙ তথাগতের জন্মভূমি দর্শন মানসে অচিরবতী (রাপ্তা নদী) তীরে শ্রাবস্তীপুরে উপস্থিত হইলেন।

শ্রাবস্তীপুর দর্শনাস্তে সাত ক্রোশ দূরে সিদ্ধার্থের জন্মস্থান কপিলবাস্তুর ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দর্শন করেন। সিদ্ধার্থ-জননী মায়াদেবীর গৃহ এবং অশোকস্তম্ভ এইখানেই ছিল—হিউয়েন সাঙ এইবার তথাগতের পরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর দর্শন করেন।

কুশীনগর হইতে হিউয়েন সাঙ বারাণসী অতিক্রম করিয়া সারনাথে উপস্থিত হইলেন। সারনাথ, মৃগদাব ও বারাণসী দর্শন করিয়া তিনি বৈশালীতে গমন করেন ; এইখানেই দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল।

বৈশালী হইতে হিউয়েন সাঙ পাটলীপুত্রে আগমন করেন। পাটলীপুত্রে

নালন্দা মঠের সীলমোহর

বুদ্ধ মৃগদাব বনে ধর্মচক্র প্রবর্তনের উপদেশ দান করেন। সেইজন্য সীলমোহরে ধর্মচক্রের দুই দিকে মৃগ অঙ্কিত আছে।

অসংখ্য প্রাসাদের ও বিহারের মধ্যে তখন মাত্র তিনটি বিশাল ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল। হিউয়েন সাঙ তাঁহার বিবরণীতে পাটলীপুত্র ও মহারাজ অশোকের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন।

পাটলীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া হিউয়েন সাঙ বুদ্ধগয়াতে উপস্থিত হইলেন। হিউয়েন সাঙ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া গয়া হইয়া তাঁহার অতি অভিলষিত নালন্দার অভিমুখে যাত্রা করেন।

হিউয়েন সাঙ-এর খ্যাতি আট বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণে উল্লসিত হইয়া এই বিদেশী জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুই শত ভিক্ষু এবং এক সহস্র গৃহস্থ শোভাযাত্রা করিয়া নগর সীমান্তে উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে

পতাকা, ছত্র' বাদ্য, পুষ্প, ধূপ-চন্দন। হিউয়েন সাঙ নালন্দার মঠপ্রাচীরের অভ্যন্তরে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বহু শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল—এ যেন দেবার্চনার মঙ্গল বাদ্য। চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবাসীর অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—সামান্য ভিক্ষুর প্রতি কি অপূর্ব রাজসম্মান! কি আন্তরিক
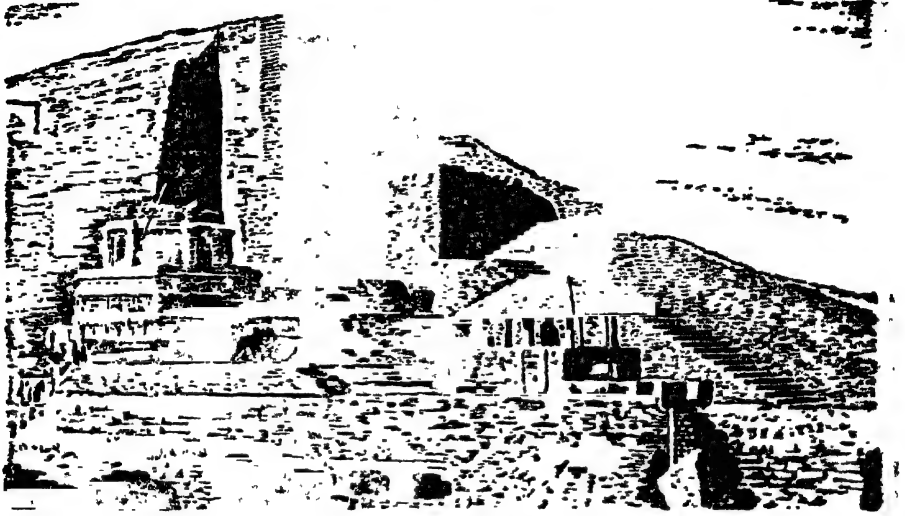
নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

শ্রদ্ধা! তারপর হিউয়েন সাঙকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাস্থবির ধর্মরত্ন শীলভদ্রের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। দুইজনের চক্ষু আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিল, বহুবাঞ্ছিত গুরু দর্শন, বহুশ্রুত শিষ্যের সাক্ষাৎ—গুরুশিষ্য উভয়েই তৃপ্ত হইলেন। হিউয়েন সাঙ গুরু শীলভদ্রের চরণ চুম্বন করিয়া অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের গৌরব। সেই লুপ্ত গৌরবের একমাত্র মূক অথচ মুখর সাক্ষী হিউয়েন সাঙের বিবরণ। গুপ্তযুগে নালন্দা ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। ফা-হিয়ান এর বিবরণে নালন্দার নাম মাত্র উল্লিখিত

নালন্দা

হইয়াছে। কুমারগুপ্তের একটি তাম্রমুদ্রা এবং সমুদ্রগুপ্তের একটি তাম্রশাসনে নালন্দা গ্রামের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমে ভারতের বিদ্যাকেন্দ্র তক্ষশীলা শ্বেতহূন কর্তৃক ধ্বংসীভূত হওয়ার পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই সময়ে নালন্দার নিকটবর্তী পাটলীপুত্র ছিল গুপ্ত রাজ্যের কেন্দ্র। গুপ্ত রাজগণ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, সুতরাং অতি সহজভাবে রাজানুগ্রহে নালন্দা সর্ব ভারতীয় বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হইল। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে, জনৈক গুপ্তরাজা নালন্দার ব্যয় নির্বাহের

জন্য ছয়খানি গ্রামের উপস্বত্ব দান করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন একশতখানি গ্রামের উপস্বত্ব নালন্দার জন্য দান করেন। এই অর্থ হইতে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের পুস্তক, বাসস্থান, বেতন, খাদ্য, বস্ত্র এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর চীন, কোরিয়া, তিব্বত হইতে শিক্ষার্থী নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আগমন করিত। নালন্দার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল শিক্ষকমণ্ডলী এবং গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার পল্লীর নাম ছিল 'জ্ঞানবিপণি'। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষাসাপেক্ষ ছিল। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, প্রতি দশ জন প্রবেশপ্রার্থীর মধ্যে দুই-এক জনের অধিক নালন্দায় প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। হিউয়েন সাঙের সময়কালে কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত।

নালন্দার শিক্ষা

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মহাযান দর্শন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত ছিল। মহাজ্ঞানী শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির, বয়স একশত সাত বৎসর। তিনি ছিলেন সমতটের রাজবংশীয় সন্তান। প্রধানতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রের অষ্টাদশ শাখা নালন্দার অধ্যয়নবস্তু হইলেও এখানে ব্রাহ্মণ্য দর্শন সাংখ্য, বেদ, ব্যাকরণ, অঙ্ক, সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠেরও সু-উত্তম ব্যবস্থা ছিল। নালন্দার শিক্ষা বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক বিভাগে অত্যন্ত অভিজ্ঞ জ্ঞানী অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিদিন একশতটি কক্ষে একশত জন অধ্যাপক অধ্যপনা করিতেন। সমস্ত দিনব্যাপী আলোচনা করিলেও ছাত্র বা অধ্যাপক কেহই ক্লান্ত হইতেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নোত্তর দান ছিল অধ্যাপনার ধারা। সূত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা ছিল জ্ঞানের পরিমাপ। সময পরিমাপের জন্য এখানে জলঘটিকা ছিল, জলঘটিকা দ্বারা পরিমিত সময় শঙ্খধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ বলিয়াছেন—"চীনের বালুকা-ঘটিকা অপেক্ষা ভারতের জলঘটিকা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।"

নালন্দার আতিথ্য

ধর্মরত্ন শীলভদ্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রের উপর চৈনিক অতিথির সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অতিথির জন্য একটি চতুস্তলগৃহ, একজন পাচক, একজন বহুভাষিক পরিচালক এবং গমনাগমনের জন্য একটি হস্তী নির্দিষ্ট ছিল। প্রায় সমস্ত বিদেশী ছাত্র বা ভিক্ষু অতিথিদের জন্যই রাজসিক আতিথেয়তার ব্যবস্থা ছিল। নালন্দায় বাস করিলেও হিউয়েন সাঙ প্রায়ই তীর্থস্থান রাজগৃহে যাতায়াত করিতেন। হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের নিকট মহাযান মতের সমস্ত মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 'সিদ্ধি' নামক একখানি মহাযান-মত সমর্থক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা

করিয়াছিলেন। চীন ও জাপানের বৌদ্ধ সমাজে সিদ্ধি গ্রন্থখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি পনর মাস নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তীর্থের আহ্বান চৈনিক পরিব্রাজককে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

নালন্দা ত্যাগ করিয়া তিনি মুদ্গগিরি (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর) ও কজঙ্গলে (রাজমহল) বহু হীনযান বিহার ও জৈনমন্দির দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিখ্যাত মহাস্থান গড়ের সংঘারাম। এখানে ছিল শত শত অ-বৌদ্ধ দেবালয়, এক সঙ্গে দ্বাদশটি সংঘারামে তিন সহস্র শ্রমণ এবং অসংখ্য নগ্ন নিগ্রন্থ জৈন সাধুর আবাসে। মহাস্থান গড় পরিদর্শনের পর তিনি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কানসোনা) ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন করেন।

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন—বাংলার অধিবাসী ছিল কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, পরিশ্রমী, বিদ্যানুরাগী এবং ধর্মে বিশ্বাসী। এখানে বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ বহু লোকের বাস ছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধদের ত্রিশটি সংঘারাম এবং দুই সহস্র ভিক্ষু অ-বৌদ্ধের একশত মন্দির; নির্গন্থ জৈনদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ধর্মের উষ্মা এদেশে অজ্ঞাত। এখানে সম্পূর্ণ নীলস্ফটিক দ্বারা গঠিত একটি বুদ্ধমূর্তির নিত্যস্ফুরিত নীল আলোক দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। নালন্দায় বিরাট একটি বৌদ্ধ বিদ্যালয় ছিল। তিনি তাম্রলিপ্তের পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পদের উল্লেখ করিয়াছেন।

বাংলার প্রশস্তি

পূর্ব-ভারত পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া হিউয়েন সাঙ সিংহলে তথাগত বুদ্ধের দন্তবিহার দর্শনমানসে পদব্রজে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি ওড্র বা কলিঙ্গ এবং বিদর্ভ বা দক্ষিণ কোশলে (বর্তমান ছত্রিশগড়ে) উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহাযান মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের জন্মভূমি দর্শন করিলেন। তিনি তারপর বিখ্যাত অমরাবতীর বহুশ্রুত বিহার নাগার্জুনকুণ্ড, কাঞ্চী এবং মহাবলীপুরম পরিদর্শন করেন। সুতরাং চৈনিক পরিব্রাজক দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে চালুক্য রাজ্য (বর্তমান মহারাষ্ট্র) পরিদর্শন করেন। চালুক্যের রাজা শৈব হইলেও সেই দেশে দুই শত বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং শত শত অ-বৌদ্ধ ও অ-শিব মন্দির ছিল। হিউয়েন সাঙ মহারাষ্ট্র দেশের পূর্বভাগে অবস্থিত পর্বতের গুহাগাত্রে ক্ষোদিত অজন্তার অপূর্ব সংঘারামের উল্লেখ করেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

হর্ষবর্ধনের জামাতা মৈত্ররাজ বৌদ্ধ ধ্রুবসেনের সম্বন্ধে ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, তাঁহার শ্বশুরের অনুকরণে প্রতি বৎসর সপ্ত দিবসব্যাপী ধর্ম উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন। উৎসব উপলক্ষে তিনি নানা দেশের ভিক্ষুদিগকে উপাদেয় খাদ্য, উজ্জ্বল বস্ত্র, মূল্যবান রত্ন এবং সদ্যফলদায়ক ঔষধ বিতরণ করিতেন।

তারপর মূলস্থানের (বর্তমান মূলতান) পথে হিউয়েন সাঙ পুনরায় "পর্বতের দেশে (অর্থাৎ জম্মুতে) উপস্থিত হইলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে একজন বিদেশীর পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা সম্পন্ন করা অলীক রূপকথার মত মনে হয়। কি অপূর্ব নিষ্ঠা! কি অদ্ভুত ধর্মজিজ্ঞাসা! কি অক্লান্ত পরিশ্রম! অন্যদিকে ভারতবাসী যদি এই বিদেশী অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইত, তবে তাঁহার এই পুর্ণ তীর্থযাত্রা সফল হইত কিনা সন্দেহ। ভারতের পথঘাট যে খুব বিপদসংকুল ছিল তাহাও মনে হয় না। পনর বৎসরব্যাপী এই নদী পর্বত অরণ্য-কান্তার সমন্বিত সুবিশাল দেশ ভ্রমণের মধ্যে তিনি মাত্র দুইবার দস্যুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সেই যুগে ভারতের পথঘাট নিরাপদ ছিল না। এই উক্তি ও অপবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে।

তখনও হিউয়েন সাঙএর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তিনি শাস্ত্রানুলিপি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন সমাপ্তির জন্য পুনরায় নালন্দায় আগমন করিলেন।

দ্বিতীয়বার নালন্দায় আগমন

বৈদিক ও বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বিভিন্ন মত সমন্বয় করিয়া তিন সহস্র শ্লোকে সমাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। চীনা ভাষায় এই গ্রন্থের নাম 'হুই-চুঙ-লিন' বা মত-সমন্বয়। পুস্তকখানি চীন, জাপান ও কোরিয়া অঞ্চলে সর্বসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি কামরূপের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কামরূপ ছিল অ-বৌদ্ধ দেশ। চৈনিক সন্ন্যাসীর প্রেরণায় ভাস্করবর্মণ বুদ্ধের মত ও পথ অনুসরণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন; চৈনিকভিক্ষুর উদ্দেশ্য সফল হইল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

কামরূপ ভ্রমণ

এই সময় কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজ্যে মহাযান ও হীনযান মতবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি ধর্ম বিচার সভা আহ্বান করেন। তিনি সেই সভায় বিচারের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রকে উভয় যান শাস্ত্রে অভিজ্ঞ চারিজন পণ্ডিত প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুণগ্রাহী শীলভদ্র হর্ষবর্ধনের অনুরোধে চারিজন পণ্ডিত তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন—তাঁহাদের মধ্যে চৈনিক পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ ছিলেন অন্যতম। কামরূপ হইতে রাজা ভাস্করবর্মন চৈনিক অতিথির সঙ্গে হর্ষবর্ধনের ধর্মসভায় বিচার শ্রবণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

ধর্ম বিচার-সভা

চৈনিক ভিক্ষু রাজনিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন। কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মণ, কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য এবং চৈনিক অতিথি সহ কনৌজে উপস্থিত হইলেন। সভা আরম্ভ হইল—তিন সহস্র ভিক্ষু, তিন সহস্র ব্রাহ্মণ, বহু নিগ্রন্থ জৈন সন্ন্যাসী, বহু তান্ত্রিক, বহু দর্শক এবং অষ্টাদশ জন সামন্ত নরপতি মহারাজ হর্ষের অতিথিরূপে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহবিষ্ণুর সিংহাসনারোহণের সঙ্গে পহ্লব বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সিংহবিষ্ণু বাহুবলে চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়া তামিলগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি সিংহলরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিংহবিষ্ণু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মামল্লপুরমের বরাহগুহায় সিংহবিষ্ণু এবং তাঁহার দুই মহিষীর ক্ষোদিত মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পহ্লবরাজ সিংহবিষ্ণু

সিংহবিষ্ণুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই পহ্লব ও চালুক্য বংশের বংশানুক্রমিক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয় বাহিনী পহ্লব রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের পরাজয়ের পরেও চোল-চালুক্য সংঘর্ষের অবসান হয় নাই।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণ পহ্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লইয়া চালুক্য রাজধানী বাতাপী অবরোধ করিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী নরসিংহবর্মণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নরসিংহ মহামল্ল বা মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরমের) দুর্গটি নির্মাণ করেন। মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলি তাঁহার শিল্পানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। এক-একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

নরসিংহবর্মণ

দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পহ্লবরাজ নরসিংহবর্মণকে পরাজিত করেন এবং পহ্লব রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। অবশ্য পহ্লবগণ কাঞ্চী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চালুক্যগণ পুনরায় পহ্লবরাজ্য আক্রমণ করে। পহ্লবরাজ নন্দবর্মণ চালুক্যদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। রাজধানী কাঞ্চী চালুক্যদের হস্তগত হইল। পহ্লবগণ এই সময় দক্ষিণের পাণ্ড্যগণ কর্তৃকও আক্রান্ত হইয়াছিল—পাণ্ড্যগণ কাবেরী নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল। অবশেষে চোল নরপতি আদিত্য চোল নবম শতাব্দীর শেষভাগে শেষ পহ্লবরাজ অপরাজিতবর্মণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন।

চালুক্য-পহ্লব সংগ্রাম

ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পহ্লবগণের রাজত্বকাল স্মরণীয় যুগ। পহ্লবগণই প্রথম দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যসীমা উত্তরে তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার হইতে দক্ষিণে প্রায় সিংহল

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু বৈষ্ণব, আলভার এবং শৈব নায়নার পহ্লব রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পহ্লবদের অধীনে কাঞ্চী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পহ্লবগণ শিল্পের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কাঞ্চীর অসংখ্য মন্দির তাঁহাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যপ্রীতির নিদর্শন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মণের অমর কীর্তি।

পহ্লব বংশের কৃতিত্ব

বাতাপীর চালুক্য বংশ ঃ সাতবাহন শক্তির পতনের পর প্রায় তিন শত বৎসর দাক্ষিণাত্যে কোন প্রবল রাজশক্তির উদ্ভব হয় নাই। অবশেষে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে কর্ণাট প্রদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য শক্তির অভ্যুদয় হয়। চালুক্যগণের বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন চালুক্যগণ অযোধ্যার সূর্য বংশ সম্ভূত। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে চালুক্যগণ উত্তর ভারতের বৈদেশিক গুর্জর জাতির বংশধর। কিন্তু চালুক্যগণ ভাবধারা ও রাজনীতিতে দক্ষিণ দেশীয়। এই বংশের রাজধানী ছিল বাতাপী নগরী (বর্তমান বিজাপুর জেলার বাদামী গ্রাম)।

চালুক্যগণের বংশ পরিচয়

চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ এবং বঙ্গলেশ পার্শ্ববর্তী নরপতিদিগকে পরাজিত করিয়া চালুক্য রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। তাঁহারা কঙ্কণের মৌর্যবংশ, বৈজয়ন্তীর কদম্ব এবং উত্তর মহারাষ্ট্র ও মালবের কলচুরিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

প্রথম পুলকেশী

কীর্তিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০২-৬৪২ খ্রীঃ) চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার বিজয়বাহিনী উত্তরে গুজরাট ও মালব অর্থাৎ নর্মদা হইতে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কাঞ্চীর পহ্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণের চের, চোল এবং পাণ্ড্যরাজ্যেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি নর্মদা তীরে উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধনকে প্রতিহত করিয়া চালুক্য সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি গোদাবরী তীরস্থ পিষ্টপুরম অধিকার করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনই কৃষ্ণা-গোদাবরীর মোহনা অঞ্চলে বেঙ্গীতে পূর্বদেশীয় চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে দ্বিতীয় পুলকেশী সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির মত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির পত্র ও উপহার বিনিময় হইয়াছিল। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার

দ্বিতীয় পুলকেশী

রাজসভা পরিদর্শন করেন। তিনি চালুক্য নরপতির প্রচণ্ড সামরিক শক্তি, বিপুল ঐশ্বর্য এবং প্রজাপুঞ্জের শৌর্যবীর্য দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়গৌরব দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পহ্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। রাজধানী বাতাপীও বিধ্বস্ত হইল। এই পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যশক্তি খর্ব হইয়া গেল।

কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর এই পরাজয়েও চালুক্য-পহ্লব প্রতিযোগিতার অবসান হইল না। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পহ্লব রাজধানী কাঞ্চী অবরোধ করিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করিলেন। পহ্লব বংশের শক্তি ও গৌরব বিলুপ্ত হইল। তাঁহার অধীন একজন মহাসামন্ত সিন্ধুর আরবদিগকে প্রতিহত করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্য ও পহ্লব বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয়েই হীনবল হইয়া পড়ে। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া চালুক্যবংশের উচ্ছেদসাধন করেন এবং একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন রাজবংশই মহারাষ্ট্র অঞ্চলের রাষ্ট্রকূট বংশ।

চালুক্য বংশের অবসান

চালুক্য রাজগণের পরাক্রমেই আরব আক্রমণকারিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চালুক্য নরপতিগণও দেশের শিল্পস্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। অজন্তা ভারতের শিল্প-তীর্থ—অজন্তার গুহাচিত্র বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু এই অজন্তা চালুক্যরাজ্যেই অবস্থিত ছিল এবং অজন্তার গুহা নির্মাণে চালুক্যরাজগণের অবদানও উপেক্ষণীয় নহে।

চালুক্য বংশের কৃতিত্ব

সুদূর দক্ষিণের রাষ্ট্র চতুষ্টয়ঃ এই যুগে সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। শক্তিশালী পহ্লব ও চালুক্য রাজগণের আক্রমণে রাজ্যগুলি প্রায়ই বিপর্যস্ত হইত।

হর্ষোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত

হর্ষোত্তর যুগে তিনটি পরাক্রমশালী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়—(১) মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশ, (২) কল্যাণে পরবর্তী চালুক্য বংশ এবং (৩) তাঞ্জোরে চোল বংশ। দাক্ষিণাত্যের আধিপত্যকে কেন্দ্র করিয়া চোল ও চালুক্যগণের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলিয়াছিল। রাষ্ট্রকূট নরপতিগণ কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য বাংলার পাল ও গুর্জর-প্রতিহার শক্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চোলগণও উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে একাধিক

অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বহির্ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫৩ খ্রীঃ) বাতাপীর চালুক্য শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দন্তিদুর্গ নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূটগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুচর যাদববংশীয় সাত্যকির বংশধর বলিয়া গর্ব করে। কেহ বলেন, রাষ্ট্রকূটগণ তেলেগু রেড্ডীগণের বংশধর, কেহ বা বলেন, রাষ্ট্রকূটগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত এবং রাষ্ট্রকূটদের নামানুসারেই দেশটির নামকরণ হইয়াছে মহারাষ্ট্র। কাহারও মতে প্রথমে রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্য রাজগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটগণ জাতিতে দ্রাবিড় এবং বৃত্তিতে কৃষিজীবী ছিল। পরে তাহারা চালুক্যরাজগণের অধীনে বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করে এবং পরবর্তিকালের মারাঠা দেশমুখগণের মত শক্তিশালী হইয়া একটি সুবিশাল রাষ্ট্র গঠন করেন। রাষ্ট্রকূটদের আদি রাজধানী মান্যখেট।

প্রথম কৃষ্ণ

রাষ্ট্রকূট বংশের দ্বিতীয় নরপতি ছিলেন দন্তিদুর্গের পিতৃব্য **প্রথম কৃষ্ণ**। তাঁহারই রাজত্বকালে ইলোরায় বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল (’৫৮-৭৭৩ খ্রীঃ)। এই মন্দিরটি একটি বিরাট প্রস্তরপর্বত ক্ষোদিত করিয়া নির্মিত। এইরূপ স্থাপত্য-রীতি পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না এবং এই ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি ভারতীয় শিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

বংশ পরিচয়

পহ্লব-চালুক্য সংঘর্ষের মত প্রথম কৃষ্ণের পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজগণের ইতিহাস কনৌজের প্রতিহারগণের সহিত সংঘর্ষেরই কাহিনী। কৃষ্ণের পুত্র **ধ্রুব** প্রতিহারবংশীয় নরপতি **বৎসরাজকে** পরাভূত করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুবই সম্ভবতঃ গৌড়াধিপতি ধর্মপালকেও দো-আব অঞ্চল হইতে বিতাড়িত ও অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার সংঘর্ষ

মহারাজ ধ্রুবের পুত্র **তৃতীয় গোবিন্দ** (৭৯৩-৮১৫ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পহ্লবরাজ **দন্তিবর্মণকে** পরাজিত করিয়া করপ্রদানে বাধ্য করেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনি কনৌজের প্রতিহাররাজ **দ্বিতীয় নাগভট্টকে** পরাজিত করিলেন। এমন কি, বাংলার দিগ্বিজয়ী সম্রাট **ধর্মপাল** এবং তাঁহার সামন্ত চক্রায়ুধও **তৃতীয় গোবিন্দের** প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল তাঁহার বশংবদ ছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দ

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র **প্রথম অমোঘবর্ষ** (৮১৫-৮৭৭ খ্রীঃ) মান্যখেট বা মালখেড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বেঙ্গীর চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তিনি পিতার উত্তরাপথ বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে পারেন নাই কিংবা উত্তরাপথের ইতিহাসে কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য পাল-প্রতিহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রতিহাররাজ **প্রথম ভোজের** দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি রাষ্ট্র ও যুদ্ধনীতি অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিই অধিক অনুরাগী ছিলেন। সমসাময়িক একজন আরব লেখক বলিয়াছেন, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটরাজ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং তিনি চীন সম্রাট, বাগদাদের খলিফা এবং রুমের বা কনস্টান্টিনোপলের সুলতানের সমকক্ষ ছিলেন। অমোঘবর্ষ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রথম অমোঘবর্ষ

অমোঘবর্ষের পুত্র **তৃতীয় ইন্দ্র** রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি প্রতিহাররাজ **প্রথম মহীপালকে** (৯৮৮ খ্রীঃ) আক্রমণ করিয়া তাঁহার রাজধানী কনৌজ সাময়িকভাবে অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র **তৃতীয় কৃষ্ণ** চোলগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ইন্দ্র

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাজধানী মান্যখেট পরমাররাজ কর্তৃক বিজিত ও লুণ্ঠিত হয় (৯৭২ খ্রীঃ)। উহার পরেই তৃতীয় কৃষ্ণের সামন্ত চালুক্য বংশীয় **দ্বিতীয় তৈল** শেষ রাষ্ট্রকূট নরপতিকে পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগরে চালুক্য বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (৯৭৩ খ্রীঃ)।

রাষ্ট্রকূটবংশের অবসান

পরবর্তী চালুক্য বংশ (কল্যাণের চালুক্য বংশ)ঃ কল্যাণের চালুক্য বংশ বাতাপীর চালুক্য বংশেরই একটি শাখা। দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৭৩ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূটগণকে পরাভূত করিয়া চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মালবের পরমাররাজ **মুঞ্জকে** পরাজিত ও নিহত করেন। দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্বকে কেন্দ্র করিয়া চালুক্য ও চোলগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। চালুক্য নরপতি **সোমেশ্বর আহবমল্ল** (১০৪১-১০৬৮ খ্রীঃ) শক্তিমান চোলরাজ **রাজাধিরাজকে** যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া চোল রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন এবং কল্যাণ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

চালুক্য বংশের অভ্যুদয়

সোমেশ্বর আহবমল্ল

সোমেশ্বরের পুত্র **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য** (১০৭৬-১১২৬ খ্রীঃ) ছিলেন পরাক্রান্ত এবং বিদ্যানুরাগী নরপতি। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিহ্লন এবং স্মার্তপণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। পুরাতন শকাব্দের পরিবর্তে বিক্রমাদিত্য একটি নূতন সম্বৎ প্রচলন করেন। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী **তৃতীয় সোমেশ্বরও** বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

চালুক্য বংশের অবসান

তৃতীয় সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার কলচুরীবংশীয় সেনাপতি **বিজ্জল** কল্যাণের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বিখ্যাত মন্ত্রী **বসব** ছিলেন বীর শৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে) চালুক্য রাজবংশ বিভক্ত হইয়া দেবগিরিতে যাদব, মহীশূরে হোয়সল এবং অন্ধ্রদেশে কাকতীয় বংশের উদ্ভব হয়।

তাঞ্জোরের চোল বংশ : নবম শতাব্দীতে পহ্লব বংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে দক্ষিণ ভারতে চোল বংশ ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। **বিজয়ালয়** ছিলেন চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র **আদিত্য** (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) শেষ পহ্লবরাজ **অপরাজিতবর্মণকে** পরাজিত করিয়া শক্তিশালী হন। আদিত্যের পুত্র **প্রথম পরান্তক** (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) সিংহল পর্যন্ত অভিযান করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণে তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। চোল-রাজ **রাজরাজের** সিংহাসন লাভের সময় (৯৮৫ খ্রীঃ) হইতে স্বনামধন্য চোল বংশের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়।

রাজরাজ চোল শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তিনি উত্তরে কলিঙ্গ এবং দক্ষিণে সিংহল দেশ পর্যন্ত জয় করেন। তাঁহার পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও অধিকার করিয়াছিল। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করেন। রাজরাজ চোল কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোরের রাজ রাজেশ্বর মন্দির দাক্ষিণাত্যের—তথা ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অতি অপরূপ নিদর্শন।

রাজরাজ চোলের মুদ্রা

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

রাজরাজের পুত্র **প্রথম রাজেন্দ্র চোল** (১০১১-১০৪৪ খ্রীঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি কল্যাণের চালুক্য এবং মহীশূরের গঙ্গবংশ ধ্বংস করেন এবং সমগ্র সিংহল দ্বীপে চোল আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার বিজয়বাহিনী উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পূর্বদিকে বাংলা দেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পূর্ববাংলার গোবিন্দচন্দ্র, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রণশূর এবং গৌড়াধিপতি মহীপালকেও পরাজিত করে। তাঁহার নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া বর্তমান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপের কতকাংশ এবং সুমাত্রা দ্বীপাঞ্চল অধিকার করে। এই সময়ে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ সুমাত্রায় রাজত্ব করিতেন। তিনি গঙ্গৈকোণ্ড (গঙ্গাতীর বিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন এবং ত্রিচিনোপল্লী জিলায় গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্

নামক নগরী নির্মাণ করিয়া তথায় নূতন একটি রাজধানী স্থাপন করেন। পিতা রাজরাজ চোলের ন্যায় রাজেন্দ্র চোলও চীনদেশে একাধিক বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের পুত্র **রাজাধিরাজ** কল্যাণের চালুক্য বংশীয় নরপতি সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কিছুকাল পরে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র **কুলোত্তুঙ্গ** সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৭০-১১২২ খ্রীঃ)। তিনি প্রাচ্য চালুক্য বংশ সম্ভূত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ 'চোল-চালুক্য' বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। তিনি ভূমিকর নির্ধারণের জন্য রাজ্যের সমস্ত ভূমি পরিমাপ করাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চোলগণ হীনবল হইয়া পড়িলে পাণ্ড্য, কাকতীয়, হোয়সল প্রভৃতি রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরের হস্তে চোলগণের চরম পরাজয় হয়।

রাজাধিরাজ ও কুলোত্তুঙ্গ

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্প : দক্ষিণ ভারত দেবতা এবং মন্দিরের দেশ। দাক্ষিণাত্যে প্রতি পাঁচ ক্রোশ অন্তর এক-একটি মন্দির। এখনও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি প্রায় অক্ষত; উত্তর ভারতের বহু মন্দির প্রায় অবলুপ্ত। মুসলমানগণ উত্তর ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংস অথবা বিকৃত করিয়া দিয়াছে। কারণ, মূর্তিপূজা-বিরোধী মুসলমানগণ দেবতার মন্দির ধ্বংস করা পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রেরণা ছিল ধর্মমূলক। ভারতীয় মঠ-মন্দির-চৈত্য-বিহার—সবই ছিল মূর্তিপূজক বিধর্মীর ধর্মস্পর্শ সংজাত। হিন্দুমন্দিরে ছিল দেবদেবী মূর্তি, বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারে ছিল বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি, জৈন মন্দিরে ছিল গুরু পার্শ্বনাথ মহাবীর ও জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি। সুতরাং ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রথম উত্তেজনা ও উন্মাদনায় উত্তর ভারতের মন্দির, বিগ্রহ ও মূর্তিগুলির বিরুদ্ধে মুসলমানদের উষ্মা ও আক্রোশ প্রকাশ পাইল। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিরৌরীর যুদ্ধের এক শত বৎসর পরে ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। ততদিনে মুসলমানদের মূর্তির বিরুদ্ধে সহজাত উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর স্থাপিত হইয়াছিল। মুঘলযুগে সম্রাট আওরঙ্গজেব মাদুরা পর্যন্ত জয় করেন এই সময়ে হিন্দুধর্মের প্রতীকরূপে শিবাজী আবির্ভূত হন। ফলে মারাঠা জাতি হইয়া পড়িল হিন্দু মন্দির ও দেবতার প্রতিহারী। সুতরাং আওরঙ্গজেব যেভাবে উত্তর ভারত ও রাজপুতনার মন্দির, মূর্তি ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে তাঁহার পক্ষে উহা করা সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর দক্ষিণ ভারত ছিল খরস্রোতা নদী দ্বারা

দক্ষিণী মন্দির অক্ষত

বিভক্ত এবং পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন ; যাতায়াত ছিল বিপদ সংকুল ; সর্বশেষে মুঘল রাজধানী হইতে দক্ষিণ ভারতের দূরত্ব ছিল সহস্রাধিক মাইল। এই সব কারণে দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে আজও অক্ষত শরীরে পহ্লব, চোল, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি বংশের সময়ে নির্মিত মন্দির, মূর্তি ও বিগ্রহ ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের স্বর্ণ যুগ। অবশ্য এই শিল্পের মধ্যে মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি গঠনই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্থাপত্যে প্রস্তর ও ইষ্টক, ভাস্কর্যে প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তাম্র ও কাষ্ঠই ছিল এই সমস্ত শিল্পের প্রধান উপাদান। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে পহ্লব, চোল, রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজবংশের দান অবিস্মরণীয়। নগর স্থাপন, প্রাসাদ, মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণ এবং সরোবর খনন এই রাজবংশ পুণ্য কর্ম অথবা বংশগৌরবের চিহ্নরূপে বিবেচনা করিতেন। প্রাসাদ ও মন্দির পরিকল্পনায় আয়তন, অনুপাত, গোপুরম্ (তোরণ), বিমান, শিখর, নাটমন্দির, সরোবর ও পুষ্পোদ্যান দক্ষিণী মন্দিরের বিশেষত্ব।

দক্ষিণী মন্দিরের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

উত্তর ভারতের মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণী মন্দিরের নানা বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। দক্ষিণের মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্দিরের সু-উচ্চ গোপুরম বা প্রবেশ তোরণ ; প্রবেশ তোরণের গাত্রে অপূর্ব চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ। ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী এই প্রবেশ তোরণেরগাত্রে প্রায়শঃ চিত্রিত ও ক্ষোদিত দেখা যায়। গোপুরমের পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীরবেষ্টিত সুবিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণ। মন্দির-প্রাঙ্গণের একদিকে প্রায়ই দেখা যায় সুগভীর সরোবর ও প্রশস্ত উদ্যান। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি পথে আসে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ—স্তম্ভগাত্রে অনুপম কারুকার্য। নাটমন্দিরের এক প্রান্তে দেবতার গর্ভ মন্দির- এই মন্দির কোথাও একতল, কোথাও একাধিক তল। গর্ভ মন্দিরের পশ্চাতে বা পার্শ্বেই মন্দিরের কোষাগার, ভাণ্ডারগৃহ, যাত্রী নিবাস। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের সকল ব্যবস্থাই সুপরিকল্পিত, সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত।

মন্দির বিন্যাস

মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ বা বণিকগণ ভূমি বা ভূমির উপস্বত্ব দান করিতেন। মন্দিরের জন্য বাদক, গায়ক, রজক, মালাকার, গণক, পুরোহিত প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইত। কোন কোন মন্দিরে নাটমন্দির এবং স্থায়ী নট-নাট্যকারও থাকিত। মন্দিরের সঙ্গে চতুষ্পাঠী, অতিথিশালা ব্রাহ্মণভোজন ও ভিখারী বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল। রোগীর জন্য বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন। দেবতার সম্মুখে কর্পূর, ধূপ, প্রদীপ, মাল্যচন্দন ও নৈবেদ্য নিবেদন করা হইত। পুণ্যার্থী দক্ষিণাস্বরূপ

মন্দিরের ব্যবস্থা

দেবতার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাখচিত অলংকার প্রদান করিতেন। কোন কোন মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গিত ছিল।

পহ্লব শিল্প: পহ্লবযুগের মন্দিরগুলির মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিচয় লাভ করা যায়। পহ্লব রাজধানী কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির এবং মামল্লপুরমের রথমন্দির পহ্লবযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। কৈলাসনাথের মন্দিরের ভাস্কর্য অপূর্ব। দ্রাবিড় শিল্পরীতি অনুসরণে নির্মিত প্রথম যুগের ইহাই শ্রেষ্ঠ মন্দির। পরবর্তিকালের মন্দির-শিল্প বিশ্বের বিস্ময়।

পহ্লবরাজ নরসিংহবর্মণ সপ্তম শতাব্দীতে (৬৪২-৬৬৮ খ্রীঃ) সমুদ্রতীরে প্রকৃতির পরম রমণীয় পরিবেশের মধ্যে মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরমে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ডকে বিবিধ আকারে ক্ষোদিত করিয়া নানা প্রকার ভাস্কর্য সুষমামণ্ডিত করিয়া মামল্লপুরমের মন্দিরগুলি রচিত হইয়াছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের এবং তাঁহাদের পত্নী দ্রৌপদীর নামানুসারে মামল্লপুরমের মন্দিরগুলির নামকরণ হইয়াছে; যথা—ধর্মরাজ (বা যুধিষ্ঠির) মন্দির, ভীম মন্দির, অর্জুন মন্দির, দ্রৌপদী মন্দির ইত্যাদি। এই মন্দিরগুলি রথমন্দির নামে পরিচিত; কারণ মন্দিরগুলির আকৃতি রথের অনুরূপ, রথের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে বিভিন্ন বিগ্রহ। বিগ্রহগুলি অনেক সময় প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত হইত; যথা—বৃষ ছিল শিবের প্রতীক, সিংহ ছিল দুর্গার প্রতীক, ঐরাবৎ ছিল ইন্দ্রের প্রতীক। সীমাহীন সময়, ক্লান্তিবিহীন শ্রম এবং অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া এই শিল্পপ্রচেষ্টা সার্থক করা হইয়াছে। পহ্লব মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয়—বহু যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অধিকারী না হইলে এই প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর, বিজ্ঞান-সম্মত এবং সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও কারুকার্য সমন্বিত মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হইত না।
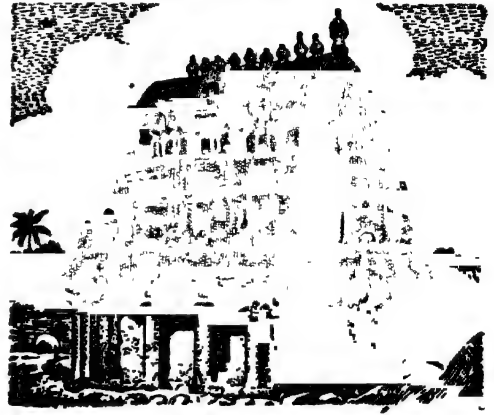
গণেশরথ মন্দির—মামল্লপুরম

মামল্লপুরমের রথমন্দির

পহ্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি পরিবর্তিকালে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শিল্পাদর্শ-রূপে গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, বহির্ভারতে যবদ্বীপ, কাম্বোজ, আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে পহ্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। অবশ্য বহির্ভারতীয় স্থাপত্যে পহ্লব মন্দিরের অনুরূপ স্তম্ভ ছিল না। কিন্তু শিখর ছিল বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চোল স্থাপত্য ঃ পল্লব বংশের পরবর্তী চোল রাজবংশের সময় দক্ষিণী শিল্পোন্নতি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চোলরাজ প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১১০৪ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে একটি অপরূপ শিবমন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের দেবতা নটরাজের নৃত্যরত বিগ্রহ। ভারতীয় ধাতু-বিদ্যা, দুঃসাহসিক কল্পনা, অপরূপ নৃত্য-ব্যঞ্জনা, গঠন রীতিতে অপূর্ব। নটরাজ শিবের অঙ্গে মহাকালের অপূর্ব উল্লাস। রাজরাজ মন্দিরের বিমান চৌদ্দ-তল, উচ্চতায় একশত পঁচিশ হস্ত। মন্দিরশীর্ষের গম্বুজটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া সর্বোচ্চ তলের উপরিভাগে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু মূল মন্দিরের সঙ্গে এই গম্বুজটির কোন ছেদচিহ্ন নাই।

শিবমন্দির—তাঞ্জোর

এই সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড কি উপায়ে মন্দিরশীর্ষোপরি উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। মন্দিরের প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর গাত্রের অপরূপ ভাস্কর্য-নিদর্শন সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধানে আজিও অমলিন। দূর হইতে মন্দির দর্শনার্থীর দৃষ্টি সহজ শ্রদ্ধায় অবনমিত হয়।

তাঞ্জোরের নটরাজ
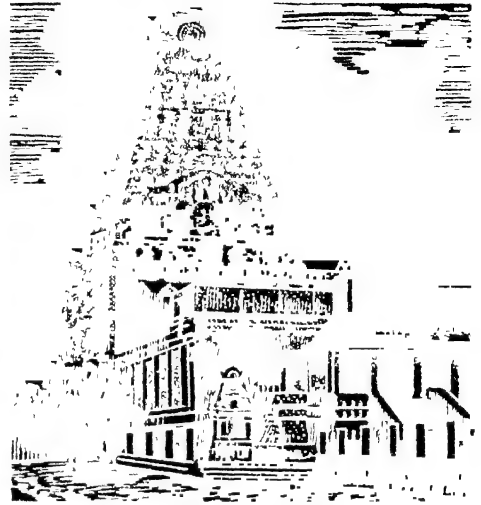
চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খ্রীঃ) তাঁহার নব স্থাপিত রাজধানী গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরমে সপ্তক্রোশ দীর্ঘ বিশাল নগর স্থাপন করেন। সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত প্রাসাদ, সুবিশাল সরোবর এবং

প্রশস্ত প্রস্তর-বেদী ছিল এই নগরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গঙ্গৈকোণ্ডচোল-পুরমে রাজেন্দ্র চোল একটি অপরূপ মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছিলেন। চোল

গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম

স্থাপত্যের বিশেষ আবেদন উহার আয়তনের বিশালতা এবং কারুকার্যের সূক্ষ্ম নিপুণতা। ইহা দর্শনে দর্শক সহজেই অভিভূত হয়। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ফারগুসন সত্যই বলিয়াছেন—চোল স্থাপত্যের পরিকল্পনা করিয়াছে দানব, সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ করিয়াছে নিপুণ রত্নশিল্পী।

অমরাবতীর স্তূপটি অনবদ্য। স্তূপের পরিকল্পনা ছিল ভগবান বুদ্ধের জীবনের ঘটনা। কথিত আছে, গৌতমের ঈর্ষান্ধ জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত গৌতমকে বধ করিবার জন্য একটি সুরামত্ত হস্তী প্রেরণ করেন। মত্ত হস্তীটি বাম পার্শ্বস্থিত একজন ভীত পথিককে পদতলে পিষ্ট করিতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের চিত্রে সেই মত্ত হস্তীটি তথাগতের প্রশান্ত মূর্তির সম্মুখে আসিয়া শান্ত হইয়াছে, যেন তথাগতের চরণে সে
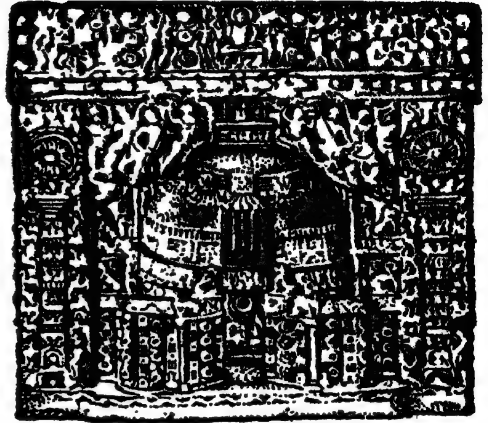
শ্বেত প্রস্তরে ক্ষোদিত অমরাবতী স্তূপের চিত্র

আত্মনিবেদন করিতেছে। চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে যুক্তকরে দণ্ডায়মান বৌদ্ধ

অমরাবতী

শ্রমণগণ সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। এই সমস্ত দৃশ্য প্রস্তরের উপরে ক্ষোদিত—কি সূক্ষ্ম কারুকার্য! অমরাবতীর শিল্পরীতি দাক্ষিণাত্যের নিজস্ব সম্পদ। অবশ্য কেহ কেহ অমরাবতী শিল্পে গান্ধার শিল্পের প্রভাব কল্পনা করেন।

চোল যুগের শেষভাগে স্থাপত্যে গোপুরম্ (তোরণ)-এর অবতারণা হয়। প্রথম যুগে গোপুরম্ ছিল সামান্য তোরণ মাত্র, ক্রমশঃ গোপুরমের উপরিভাগে

গোপুরম্ বা তোরণ

সংযুক্ত হইল দ্বিতল গৃহ,—এমন কি, সপ্ততল পর্যন্ত। কাল-ক্রমে গোপুরম্ এত বেশী বৃহৎ আকার ধারণ করিল এবং এত সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত হইল যে, মূল মন্দির অপেক্ষা গোপুরম্ই অধিকতর আকর্ষণীয় বস্তু হইয়া উঠিল। কুম্ভকোণমের গোপুরম্ চোল স্থাপত্যের চরম নিদর্শন।

গোপুরমের সহিত যুক্ত হইল স্তম্ভোপরি স্থাপিত সুবৃহৎ প্রাচীরবিহীন কক্ষ। শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ কি অপূর্ব জ্যামিতিজ্ঞানের পরিচয়! মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভশীর্ষ কক্ষগুলি দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। সহস্র স্তম্ভোপরি মন্দির চোল রাজবংশের অদ্বিতীয় কৃতিত্ব। দূর হইতে

দেখিলে মনে হয়, শ্রেণিবদ্ধ স্তম্ভগুলি যেন দিকচক্রবালে যেখানে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সহজেই মানুষের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া যায়।

চোলরাজগণের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির হইল রাজরাজ চোল কর্তৃক নির্মিত চৌদ্দতল বিশিষ্ট তাঞ্জোরের শিব মন্দির। এই মন্দির প্রাঙ্গণের পরিবেষ্টনী ১৬৬ × ৩৩২ হস্ত। মন্দিরের একটি গম্বুজ প্রায় ২২৫০ মণ। এই চোল মন্দিরের প্রাচীর-ভাস্কর্যও অনবদ্য। মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত দেবদেবী, মনুষ্য, জীবজন্তুর চিত্র অত্যন্ত সজীব ও জীবন্ত। প্রস্তরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চোলরাজগণ অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ একটি সেচপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ-বেলগোলায় প্রস্তর ক্ষোদিত দ্বিচত্বারিংশ হস্ত উচ্চ গোমত মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য ছিল অপূর্ব, অনবদ্য।

গোমত—শ্রবণবেলগোলা

চালুক্য শিল্প কীর্তি : উত্তর ভারতে ও সুদূর দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজ্য অবস্থিত ছিল। চালুক্য রাজধানী বাদামী বহু গুহামন্দির বিভূষিত ; এই মন্দিরগুলি হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত। মন্দিরের অভ্যন্তরের দেবমূর্তিগুলি অপূর্ব ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। বাদামীতে অনেকগুলি প্রস্তর ক্ষোদিত মন্দিরও রহিয়াছে, ঐগুলি পহ্লব ও দ্রাবিড় শিল্পের অনুকরণ। অহিওলিতে আবিষ্কৃত মেগুতি মন্দির (৬০৪ খ্রীঃ) এবং পট্টাডকলে আবিষ্কৃত সঙ্গমেশ্বরের মন্দির (আঃ ৭২০ খ্রীঃ) প্রভৃতি চালুক্য শিল্পের অতি সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন।

রাষ্ট্রকূট শিল্প ও ভাস্কর্য : রাষ্ট্রকূটগণ পহ্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করিত। রাষ্ট্রকূটদের প্রধান কীর্তি ইলোরার কৈলাস মন্দির। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণবর্মণ ইলোরার মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের মুখ্য-দেবতা শিব, শিবের আবাস রূপে পরিকল্পিত আবেষ্টনী হিমালয় পর্বতশ্রেণী অপূর্ব ; মন্দিরের সম্মুখে দুইটি ঐরাবত দ্বারপালরূপে দণ্ডায়মান ; অদূরে শিবের প্রিয় অনুচর নন্দীর মন্দির। শিব মন্দিরের সঙ্গে নন্দী মন্দির সেতু দ্বারা সংযুক্ত। শৈবমন্দির হইলেও ইলোরাতে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু, গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং

ইলোরার কৈলাস মন্দির

পুণ্যসলিলা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে। ইলপুর বা ইলোরার মন্দিরগুলিতে মামল্লপুরম রথমন্দিরের ভাস্কর্যরীতি অনুসৃত হইয়াছিল—অবশ্য আকারে এই মন্দিরটি বৃহত্তর ছিল। ইলোরার মন্দিরগুলি বাস্তবিক পক্ষে এক-একটি পার্বত্য প্রস্তরখণ্ড। একটি বিশাল পর্বতপার্শ্বকে মূল পর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক করা হইয়াছিল। তারপর পৃথকীকৃত প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছিল। স্থাপত্য সমালোচকগণ বলেন, ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির মামল্লপুরম মন্দিরের বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র।

ইলোরার কৈলাস মন্দির ব্যতীত ইলোরার গুহা মন্দিরগুলিও ভারতীয় গুহাশিল্প স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুহাগুলিকে ক্ষোদিত করিয়া প্রার্থনা অথবা সভা-সম্মেলনের জন্য বিরাট কক্ষে পরিণত করা হইয়াছে—প্রাচীরগুলির মধ্যে নানা দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত করা হইয়াছে।

ইলোরা ও অজন্তার তুলনা

ইলোরাতে অজন্তার গুহা মন্দিরের প্রশান্তভাবের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইলোরা মন্দিরে পৌরাণিক দেবতা বহুহস্ত, বহুচক্ষু; সেখানে দেবতারা যুদ্ধ করে, ভালবাসে, হত্যা করে; মন্দিরের দেবতা কখনও মনুষ্যদেহ—সিংহ, অশ্ব অথবা বরাহ মুখ। ইলোরার সমস্ত আবেষ্টনী চঞ্চল এবং মুখর। এই চাঞ্চল্য, এই মুখরতা ইলোরা মন্দিরের প্রতি প্রস্তরখণ্ডে অত্যন্ত সজীব। পৃথিবীর কোন দেশের ভাস্কর্যের মধ্যে দেবতার এমন রূপ কল্পিত হয় নাই।

ইলোরার অনুকরণে পরবর্তী কালে (অষ্টম শতাব্দীতে) বোম্বাই এর নিকটবর্তী এলিফ্যান্টা দ্বীপের শিবমন্দির নির্মিত হয়। এলিফ্যান্টার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি (অর্ধ শিব ও অর্ধ গৌরী) এবং ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালনকর্তা) ও শিব (সংহারকর্তা)—এই ত্রিমূর্তি মানব কল্পনার চরম মূর্ত বিকাশ। প্রত্যেকটি মূর্তিই মুদ্রিতচক্ষু—ধ্যানমগ্ন। এলিফ্যাণ্টার আবেষ্টনী—দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, অসীম নীলাকাশ, মন্দিরের আবেশময় দেবমূর্তি যুগপৎ মানুষের মনে অতীন্দ্রিয় জগৎ রচনা করে।

ত্রিমূর্তি—এলিফ্যাণ্টা

দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন: পহ্লব, পাণ্ড্য এবং চোল শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গ্রামই ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলভিত্তি। গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। গ্রামবাসীদের

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও গ্রামের শিল্পিগণ উৎপাদন করিত; ফলে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। দক্ষিণদেশে প্রথমে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু সমাজে বৃত্তিগত বিভাগ ছিল। কালক্রমে বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়। গ্রামবৃদ্ধগণের উপর গ্রামের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। গ্রামবৃদ্ধ নির্বাচনের অভিনব ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের ভূমির অধিকারী সচ্চরিত্র প্রবীণ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা নাম লিখিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিত। পরে ঐ পাত্র হইতে নাম উত্তোলন করা হইত। যাহার নাম উত্তোলিত হইত, তিনিই গ্রামবৃদ্ধ নির্বাচিত হইতেন। তাঁহারা কোন বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া গ্রামের সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। বৃক্ষরোপণ, জলাশয় খনন, রাজস্ব সংগ্রহ, মন্দির সংরক্ষণ, চৌর্যাদি নিবারণের জন্য অপরাধীকে শাস্তিদান ইত্যাদি গ্রামবৃদ্ধের প্রধান কর্তব্য ছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলে কেন্দ্রের শাসকগণ গ্রামের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ফলে দাক্ষিণাত্যের গ্রামগুলি প্রায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ভোগ করিত।

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম : দাক্ষিণাত্যে আর্যধর্ম ও সভ্যতা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। রামায়ণে দক্ষিণ ভারতের বানর ও রাক্ষস সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়। অগস্ত্য ঋষি ও শ্রীরামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য গমনের কাহিনীর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার মিলনের একটা ইঙ্গিত রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রাক্-মৌর্যকালের ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ কয়েকটি অনুমান ভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন রীতি অনুসরণ করিয়া মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মই অধিক বিস্তৃত ছিল। মৌর্যোত্তর যুগে সাতবাহন ও পহ্লবদের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ধর্মের একটা স্পন্দন অনুভব করা যায়। প্রথম পুলকেশীর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে বিশেষ ধর্মবিরোধ ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্ণবগণ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ভক্তি। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা, হিন্দু দার্শনিক এবং যুগান্তকারী ধর্মপ্রচারক-গণের আবির্ভাব জৈন ও বৌদ্ধ প্লাবনের পর হিন্দুধর্মের নবজাগরণে ও নব রূপায়ণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম

দক্ষিণের শৈব প্রচারকগণের মধ্যে তেষট্টি জন বিখ্যাত। তাহারা 'নাইনার' নামে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে **অপ্পর, তিরুজ্ঞানসম্বন্দর, সুন্দরমূর্তি:** এবং **মানিক্ক ভাসগর** বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ সাধারণতঃ আলভার নামে পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের দ্বাদশ জন আলভার রচিত সহস্র স্তোত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সকল বৈষ্ণব আলভারদের মধ্যে নম্ম, কুলশেখর এবং শ্রীমতী গোদা (বা অন্দল) বিখ্যাত। কিন্তু এই সমস্ত মহাজনের কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রভাব দক্ষিণ ভারতেই নিবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতে দাক্ষিণাত্যের মহাজনদের নাম প্রায় অজ্ঞাত।

সুন্দরমূর্তি

এই যুগে দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক **কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ** এবং **বসব** সর্বভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কুমারিল ভট্ট : কুমারিল ভট্ট ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

শংকরাচার্য : শংকরাচার্য অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে শংকর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি বেদ বেদান্ত আয়ত্ত করেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা ; ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই—ইহাই শংকরের **অদ্বৈতবাদ**। তাঁহার রচিত উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য অপূর্ব মনীষা ও প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠা করেন—দক্ষিণে মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠ, উত্তরে হিমালয়ের ক্রোড়ে বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, পূর্ব উপকূলে পুরীতে গোবর্ধনমঠ এবং পশ্চিম উপকূলে দ্বারকায় সারদামঠ। দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে শংকরাচার্য দেহত্যাগ করেন।

রামানুজ : রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনি ছিলেন মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। তাঁহার ধর্মের মূলকথা হইল, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। তাঁহার মতবাদ **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** নামে পরিচিত। তাঁহার মতে জীবমাত্রই ব্রহ্মের অংশ এবং জ্ঞানের পরিবর্তে ভক্তিই মোক্ষ লাভের প্রধান সোপান। তিনি সর্বভারতে চুয়াত্তরটি বৈষ্ণব-ক্ষেত্র স্থাপন করেন। তাঁহার শিষ্যগণ **শ্রীবৈষ্ণব** নামে পরিচিত।

বসব: শৈব প্রচারকদের মধ্যে বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি কল্যাণের কলচুরি বংশীয় রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ **বীরশৈব** বা **লিঙ্গায়েৎ** নামে খ্যাত। শিবলিঙ্গের উপাসনাই লিঙ্গায়েৎ ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বীরশৈবগণ বেদের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কঠোর জাতিভেদ স্বীকার করেন না। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। তাঁহারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে দাহ করে না।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যা প্রাচীন যুগের ইতিহাসে সাধারণতঃ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। গুপ্তযুগের শেষভাগে কলিঙ্গ দেশে গঙ্গদেশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। মহানদী হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলিঙ্গ নামে পরিচিত। কলিঙ্গ নামে একটি নগরও ছিল। বর্তমান গঞ্জাম জেলার মুখলিঙ্গম্ গ্রামের সহিত উহার নাম-সামঞ্জস্য রহিয়াছে। গঙ্গ বংশের একটি শাখা মহীশূর অঞ্চলে এবং অন্য একটি শাখা কলিঙ্গ অঞ্চলে রাজত্ব করিত। মহীশূরের কলিঙ্গ রাজগণ ছিলেন পশ্চিম গঙ্গ বংশজাত। কলিঙ্গের রাজগণ প্রাচ্যগঙ্গ নামে উল্লিখিত হইতেন।

গঙ্গ বংশ

ইন্দ্রবর্মণ ছিলেন প্রাচ্য গঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশধরগণ 'সকল-কলিঙ্গাধিপতি' বা 'ত্রি-কলিঙ্গাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাধি হইতে মনে হয় একাধিক কলিঙ্গ ছিল। ইন্দ্রবর্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গঙ্গবংশ প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাচ্য চালুক্য ও চোলরাজগণ কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ্য বারংবার আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

প্রাচ্য গঙ্গ বংশের একটি শাখা ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে **বজ্রহস্ত অনন্তবর্মণ** নামক একজন নায়কের অধীনে কলিঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার পৌত্র **অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ** ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি (১০৬৮-১১৪৭ খ্রীঃ)। অনন্তবর্মণ দক্ষিণের চোলরাজ এবং বাংলার বিখ্যাত পালরাজকে পরাজিত করিয়া গোদাবরী হইতে গঙ্গার তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। উৎকল জয় করিয়া অনন্তবর্মণ 'উৎকলাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তবর্মণের রাজত্বকালে পুরীর বিখ্যাত **জগন্নাথ মন্দির** নির্মিত হয়।

অনন্তবর্মণের পরেই বাংলার সেনরাজগণের প্রতাপে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ গঙ্গরাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। বঙ্গের সেনবংশ মুসলিম কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে গঙ্গবংশ পূর্ব-দক্ষিণে মুসলিমদিগের অগ্রগতি পূর্ণ একশত বৎসর পর্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছিল।

উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্প: মন্দির উড়িষ্যার বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক পক্ষে

সমগ্র ভারতবর্ষে যত মন্দির আছে, একমাত্র উড়িষ্যায়ই ততোধিক মন্দির আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ "উড়িষ্যাবাসীদের নেশায়' পরিণত হইয়াছিল। এই মন্দিরগুলি অধিকাংশই নাগর রীতি অনুসারে অর্থাৎ চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যায় বেসর অর্থাৎ গোলাকৃতি মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল।

উড়িষ্যার মন্দির প্রধানতঃ ভুবনেশ্বর, পুরী এবং কোনারককে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ মন্দিরের আদর্শ ছিল ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির (১০০০ খ্রীঃ)। ভুবনেশ্বর নগরেই ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রায় পাঁচশত মন্দির রহিয়াছে। বিভিন্ন রাজবংশের অর্থানুকূল্য, শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অনবদ্য নিপুণতা এই মন্দির প্রচেষ্টা সার্থক করিয়াছিল। অবশ্য উড়িষ্যা ভারতের সুদূর পূর্বপ্রান্তে মুসলিম রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল বলিয়াই অদ্যাপি অনেকগুলি মন্দির অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।
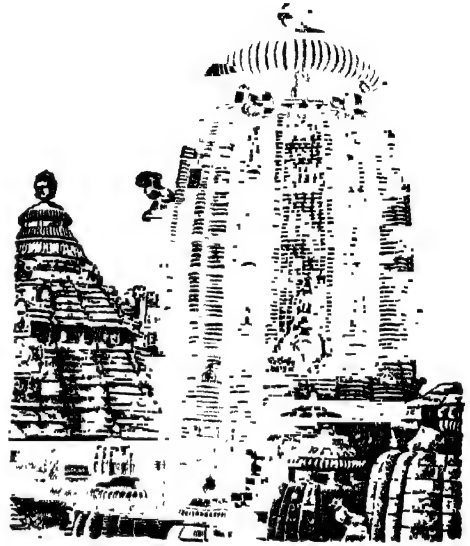
লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি আয়তনে বিশাল, অনুপাতে নির্ভুল, সৌন্দর্যে গম্ভীর, অলংকরণে অপূর্ব এবং রূপায়ণে বাস্তব জীবনের চিত্র।

উড়িষ্যার প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখেই বিরাট জগমোহন বা মুখ্য মণ্ডপ এবং নাটমন্দির সর্বপ্রথম দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভুবনেশ্বরে রামেশ্বর মন্দিরের জগমোহন যেমন বিশাল, তেমনি ভাবগম্ভীর। জগমোহনের সঙ্গে উঠিয়াছে রেখ দেউল এবং ভদ্র বা পীড়া দেউল। জগমোহনের স্থাপত্যে চারিটি অংশ—পিষ্ঠ, বাড়, শিখর এবং মস্তক অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মুখ্যমণ্ডপ বা জগমোহন অতিক্রম করিয়া দর্শনার্থী মন্দিরের চতুর্দিকব্যাপী অলিন্দে আরোহণ করে। তারপর পুণ্যার্থী গর্ভগৃহে মন্দিরের দেবতার দর্শন লাভ করে। কোনারকের সূর্যমন্দিরেও (আঃ ১২৫০ খ্রীঃ) ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনুরূপ শিল্পরীতি অনুসৃত হইয়াছে। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে পরমেশ্বর মন্দির (আঃ ৭৫০ খ্রীঃ), মুক্তেশ্বর মন্দির ও ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দির (আঃ ১১৫০ খ্রীঃ) সর্বাপেক্ষা দর্শনীয়, 'রাজরাণীয়া' নামক হরিদ্রাভ বালুপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত

ভুবনেশ্বর

বলিয়া এই মন্দিরের নাম রাজারাণী মন্দির। রাজারাণী মন্দিরের স্থাপত্যরীতি ভুবনেশ্বরের অন্যান্য মন্দির হইতে পৃথক। আবেষ্টনী, উপাদান, শিল্পরীতি, অঙ্গরেখা, শিখর ও রথভাগ অত্যন্ত মনোরম। রাজারাণী মন্দিরের মুখ্যমণ্ডপ অসম্পূর্ণ। মন্দিরের শীর্ষোপরি আমলক শিলা (আকারে আমলকী ফলের ন্যায় বৃত্তাকার) মানুষের দৃষ্টিপথে বিভ্রম সৃষ্টি করে। রাজারাণীর মন্দির সত্যই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। রাজারাণী মন্দিরের কল্পনা এবং নামকরণ উভয়ই সার্থক।

রাজারাণী মন্দির

পুরীর জগন্নাথ মন্দির : পুণ্যলোভী ভারতবাসীর অন্যতম লোভনীয় আকর্ষণ পুরীর জগন্নাথ মন্দির (আ: ১১৯৮ খ্রী:)। লিঙ্গরাজের মন্দিরের অনুকরণে এই বিশাল মন্দিরের চারিদিকে চারিটি তোরণ। পূর্বদিকের প্রধান তোরণটির নাম 'অরুণ স্তম্ভ'। তোরণটি একটি স্তম্ভের উপরে অবস্থিত। কোনারক হইতে এই বৃহৎ স্তম্ভটি সম্পূর্ণ স্থানান্তরিত করিয়া পুরীর মন্দিরদ্বারে স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমে এই মন্দির ছিল বৌদ্ধ মন্দির। পরবর্তিকালে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। এই পুরীতেই শংকরাচার্য মঠ, গৌরাঙ্গদেবের মন্দির, স্বর্গদ্বার (সমুদ্রতীরস্থ শ্মশান ঘাট), আনন্দবাজার (মন্দির প্রাঙ্গণস্থ রন্ধনশালা ও প্রসাদ বিক্রয় ভূমি) প্রভৃতি উল্লেখনীয় ও দর্শনীয় স্থান। পুরীতে জাতিভেদ নাই; অবশ্য জাতিভেদবিহীন আচরণ বৌদ্ধ রীতির প্রভাব; এখানে হিন্দু বিধবার একাদশী উপবাস নাই। বৎসরান্তে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা একটি আকর্ষণীয় উৎসব। দ্বাদশ বৎসরান্তে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা দারুময় মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের পাদস্পর্শে পুরী অপূর্ব মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। পুরী বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ; স্থাপত্যের দিক দিয়া লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনুরূপ পুরীর মন্দিরে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। লিঙ্গরাজ মন্দিরের মতন পুরীর মন্দির চারি অংশে বিভক্ত; সম্মুখের দুটি অংশ চতুর্দশ শতাব্দীতে সংযুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মের আদর্শে বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক জগন্নাথদেবের মন্দির পরিকল্পিত ও নির্মিত হওয়ায় এই মন্দিরের ধারাবাহিকতা ও আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পুরীর মন্দিরে শিল্প অপেক্ষা ধর্মের আবেদনই অধিকতর লক্ষণীয়।

কোনারকের সূর্যমন্দির : কোনারকের সূর্যমন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তরগুলি দূর হইতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও বর্তমানে মন্দিরটি একটি প্রাচীন মন্দিরের কঙ্কাল মাত্র, তবু ইহার শিল্প আবেদন অতি গম্ভীর ও প্রশান্ত। রাজা নরসিংহবর্মণ (১২৩৮–১২৬৪ খ্রী:) এই মন্দিরের পরিকল্পনা করেন, তাঁহার রাজস্থপতি মন্দিরটি সুসম্পন্ন করেন। মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মনে হয়, যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলেই এই অপরূপ মন্দির নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারক কোনারকের সূর্য-মন্দির। ইহা

দেবদাসীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপ যেমন বিশাল, তেমন কারুকার্যখচিত। উপরিতলের সোপানশ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুই সিংহ মূর্তি। এই সিংহমূর্তিদ্বয়ের উপরে সম্পূর্ণ তোরণ-প্রাচীর স্থাপিত। সিংহ দুইটির বিশাল আয়তন এবং সুন্দর নিপুণ গঠনে পশুরাজের শৌর্য যেন প্রতি অঙ্গরেখায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভোগমণ্ডপের পরিধি দর্শন করিলে মনে হয় মন্দির, মণ্ডপ, প্রাসাদ, উদ্যান—সবই অত্যন্ত সুসমঞ্জস ও সুসংগত এবং একই অনুপাতে পরিকল্পিত। সর্বশেষে পার্শ্বদেশে রহিয়াছে সূর্যদেবের অরুণ রথচক্র—সমগ্র মন্দিরটি যেন সূর্যরথের পরিকল্পনা। অসীম ঊর্ধ্বলোকের দিকে এই সূর্যমন্দির প্রসারিত। মন্দিরের গর্ভদেবতা সূর্য সমগ্র বিশ্বশক্তির প্রতীকরূপে মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে।
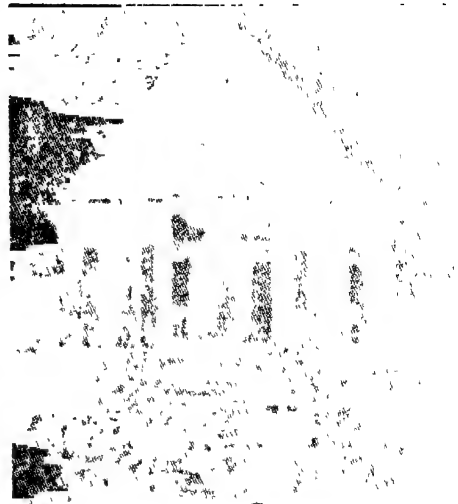
কোনারকের সূর্যমন্দির

অনুশীলনী

১। মৌর্যোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন, পহ্লব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট—যে কোন দুইটি শক্তির রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত কর।
(Give an account of any two of the Southern Kingdoms—the Satabahana, Pahlaba, Chalukya and Rastrakuta.)

২। সুদূর দক্ষিণের চোল শক্তির উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও।
(Describe the rise and fall of the Cholas of the Far South.)

৩। মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকগণের বিবরণ লিখ।
(Write an account of the religion and religious teachers of the South.)

৪। মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
(Give an account of Indian Architecture, Sculpture, Painting and Literature of the South.)

দশম অধ্যায়

পাল ও সেনযুগে বঙ্গদেশ

অধ্যায় পরিচয়ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর বাংলার ইতিহাস ছিল তমসাবৃত। তমসার অবসানে বাংলার গৌরবরবি সমগ্র উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে, এমন কি বহির্ভারতেও প্রতিভাত হইল। কলচুরী-রাজ লক্ষ্মীকর্ণ এবং যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব পালবংশের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কনৌজের মহোদয়শ্রী বাংলার রাজমুকুট অলংকৃত করিয়াছিলেন। এই যুগে পাল নরপতিগণ বিক্রমশীলা ও উদণ্ডপুর বা ওদন্তপুর বৌদ্ধমঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরধর্ম অসহিষ্ণু ছিলেন না। এই যুগে বৌদ্ধ প্রচারক দীপঙ্কর, চরকের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, শিল্পী ধীমান এবং বীতপাল বাংলা দেশকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিলেন।

সেন বংশের সময়ে বাংলার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইল—বিক্রমপুর বাংলার ইতিহাসে অভিনব স্থান অধিকার করিয়াছিল। বল্লালসেনের চেষ্টায় বাংলায় কৌলিন্য প্রথা সুদৃঢভাবে প্রবর্তিত হইল। গীত-গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ী সেনযুগের গৌরব। সেনবংশের সময়ে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলার গৌরবরবি অস্তমিত হইল।

মাৎস্য-ন্যায় (অরাজকতা): শশাঙ্কের (৬০৩-৬৩৮ খ্রীঃ) মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর বাংলা দেশ অনৈক্য, আত্মকলহ এবং বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বহু দুর্ভোগ সহ্য করিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মগধের গুপ্তগণ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে এবং খড়্গবংশ (৬৫০-৭০০ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিত। তিব্বতীয় লামা তারানাথ লিখিয়াছেন, বাংলা দেশের বহু অঞ্চলেই এই সময়ে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তি স্ব স্ব অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। দুর্বল সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হইত। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ পরিস্থিতি **মাৎস্য-ন্যায়** নামে অভিহিত।

পাল বংশের অভ্যুত্থান—গোপালের নির্বাচনঃ শত বৎসরব্যাপী মাৎস্য-ন্যায়ের পরে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বপ্যটের পুত্র গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিলেন। দেশের জনসাধারণও তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। গোপালের শাসনে (আঃ ৭৬৫-৭৬৯ খ্রীঃ) দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। পালরাজ গোপাল ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ছিলেন। ওদন্তপুর বিহার পালরাজ গোপালের কীর্তি। পাল বংশের সতর জন সন্তান প্রায় চারি শত বৎসর (আঃ ৭৬৫-১১৫০ খ্রীঃ)

বাংলা দেশ শাসন করেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকাল বাংলা দেশের ইতিহাসে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্পদের এক গৌরবময় যুগ।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৬৯-৮০১ খ্রীঃ) : ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ; ধর্মপালের সমকালীন ভারতবর্ষে তিনটি শক্তিশালী রাজবংশ ছিল :—

(১) গুর্জর প্রতীহার বংশ—কেন্দ্রভূমি গুর্জর (মধ্যভারত)—অন্যতম শ্রেষ্ঠ —রাজা বৎসরাজ।

(২) রাষ্ট্রকূট বংশ—কেন্দ্রভূমি দক্ষিণ ভারত, অন্যতম প্রধান রাজা ধ্রুব।

(৩) পালবংশ—কেন্দ্রভূমি পূর্বভারত, সর্বোত্তম রাজা ধর্মপাল।

তিন জন রাজাই ছিলেন শক্তিমান, তিনটি রাজবংশই ছিল সাম্রাজ্য-লিপ্সু ; তিন জন রাজারই আপাতঃ উদ্দেশ্য কনৌজের রাজলক্ষ্মীলাভ।

ধর্মপালের গতি ছিল পশ্চিমমুখী, বৎসরাজের গতি পূর্বমুখী ; ধ্রুবভট্ট উদ্দাম প্রকৃতি, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ; সুতরাং অচিরে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল ; কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ ; স্থান গাঙ্গেয় উপত্যকা।

প্রতীহার নৃপতি বৎসরাজের হস্তে বাংলার ধর্মপাল পরাজিত হইলেন ; কিন্তু প্রতীহাররাজের খ্যাতিতে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ঈর্ষান্বিত হইয়া বিপুল বাহিনী সহ গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। বৎসরাজ ও ধর্মপাল উভয়েই ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইলেন। বৎসরাজ পরাজিত হইয়া রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। উৎফুল্ল ধ্রুবভট্ট স্বীয় রাজ্য দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৎসরাজের পলায়ন ও রাজা ধ্রুবের প্রত্যাবর্তনের ফলে ধর্মপাল লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে ধর্মপাল ভোজ (বেরার), বৎস (জয়পুর-ভরতপুর), মদ্র (মধ্যপঞ্জাব), অবন্তী (মালব), কুরু (পূর্ব পঞ্জাব), যদু (যাদব রাজ্য), যবন (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ), গান্ধার (পঞ্জাবের:পশ্চিম), কীর (কাঙড়া) প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। এই রাজ্যজয়ের অবকাশে ধর্মপাল কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেন এবং কনৌজের সিংহাসনে বশংবদ চক্রায়ুধকে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেকের সময় বিজিত অধিপতিগণ ধর্মপালের নিকট 'প্রণতি পরিণত' হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে গৌড়রাজ ধর্মপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন। গুর্জর কবি সোঢ্ঢল তাঁহার 'উদয়সুন্দরীকথা' গ্রন্থে ধর্মপালকে 'উত্তরপথস্বামী' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

সমুদ্রগুপ্তের মতন ধর্মপাল পরাজিত রাজ্যগুলি বশ্যতা স্বীকার করা মাত্রই তাহাদিগকে রাজক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিতেন, স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই।

ইতিমধ্যে বৎসরাজ মৃত, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিংহাসনারূঢ়। তিনি কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত করিলেন, চক্রায়ুধ ধর্মপালের আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে অনুসরণ করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। কিন্তু নাগভট্ট বাংলার দিকে অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধর্মপাল প্রতীহার-রাহু মুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করিলেন। বাংলার ধর্মপাল ও তাঁহার বশংবদ কনৌজের চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আপদমুক্ত হইলেন।

রাজ্যচ্যুতচক্রায়ুধ

এই নতিস্বীকার স্বত্বেও ধর্মপালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাঁহার আধিপত্য অক্ষুন্ন ছিল।

ধর্মপাল 'পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন পাটলীপুত্রে একটি রাজধানী (জয়স্কন্ধাবার) স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে ও বিহারের সীমান্তে চম্পা নগরীর অদূরে পর্বত ও নদীর মিলনস্থলে তিনি (ধর্মপাল) একটি সংঘারাম স্থাপন করেন। কালক্রমে এই সংঘারাম একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার ধর্মপালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সে যুগের শিল্প-সৃষ্টির বিশিষ্ট নিদর্শন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহারও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকের ধারণা।

দেবপাল : ধর্মপালের পর তাহার পুত্র দেবপাল (আঃ ৮০১-৮৪০ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় একজন দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তাঁহার বিজয়বাহিনী উত্তরে কম্বোজ (পঞ্চনদের উত্তর-পশ্চিমে ও গান্ধারের উত্তরে?) হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সেনাপতি জয়পাল কামরূপ জয় করেন এবং অন্য সেনাপতি লবসেন বা লাউসেন গুর্জর প্রতীহাররাজকে পরাস্ত করেন। গুর্জর প্রতীহাররাজ, মিহিরভোজ, রাষ্ট্রকূট নরপতি এবং তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। দেবপালের রাজত্বকালে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজা শ্রীবালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

দেবপালের সমকালীন কয়েকটি তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুঙ্গের ও নালন্দার দানপত্র বিখ্যাত। মুঙ্গের দানপত্র তাম্রপাতের উপর লিখিত। দানপত্রের মধ্যস্থলে সারনাথের অনুকরণে ধর্মচক্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। আরম্ভেই বুদ্ধদেবের প্রশস্তি ও দেবপালের বংশপরিচয় রহিয়াছে। এই দানপত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, তিনি (দেবপাল) শ্রীনগর ভুক্তির (বর্তমান পাটনার অন্তর্গত) ক্রিমিলা বিষয়ে (জিলায়) মেষিকা নামক গ্রাম ভট্টপ্রবর মিশ্রকে তাঁহার তেত্রিশ বৎসর রাজত্বকালে দান করিয়াছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে

মুঙ্গের ও নালন্দার দানপত্র

প্রথম এই তাম্রশাসনখানি এশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; তারপর ইহা (তাম্রশাসনখানি) অদৃশ্য হয়। একজন ইংরেজ এই তাম্রশাসনখানি ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে লইয়া যান এবং কেনউড হাউসের গৃহপ্রাচীরে সংলগ্ন করেন। অতঃপর গৃহটি সংস্কারের সময় উহা আবিষ্কৃত হয় এবং লণ্ডনের পুরাতন জিনিস বিক্রয়ের দোকানে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়। তখন একজন প্রত্নতাত্ত্বিক উহা ক্রয় করেন এবং প্রকাশ করেন। নালন্দার দানপত্র একখানি তাম্রপাতের দুই পৃষ্ঠে ক্ষোদিত। মুঙ্গের দানপত্রের অনুরূপ তাম্রপাত, রাজকীয় মুদ্রা (বা সীল), বুদ্ধ-প্রশস্তি এবং দাতার বংশ-পরিচয় নালন্দার দানপত্রে উল্লিখিত আছে। দানপত্রের কাল—দেবপালের রাজত্বের উনচত্বারিংশত্তম বৎসর। এই দানপত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, সুবর্ণদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীবালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল নালন্দা বিহারের শ্রীবালপুত্রদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রীনগর ভুক্তির অন্তর্গত রাজগৃহ বিষয়ে চারিটি গ্রাম এবং গয়া বিষয়ে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র মিহিরভোজ গোয়ালিয়রের শিলা-লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি শক্তিশালী বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিজয় স্বল্পস্থায়ী ছিল। দেবপাল বঙ্গের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শিলালিপি বাংলার পালবংশের কাল এবং বৈদেশিক সম্বন্ধ ও ধর্মপ্রাণতা সূচিত করে।

পালশক্তির অবনতি ঃ দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের পূর্ব গৌরবরশ্মি ম্লান হইয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম **বিগ্রহপাল** বা প্রথম শূরপাল বাংলার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তিনি তাঁহার পুত্র **নারায়ণ পালের** হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

পরবর্তী পালরাজগণ : দেবপালের মৃত্যুর পর প্রতীহার ও কম্বোজরাজগণের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। দিনাজপুর রাজবাটীতে রক্ষিত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, জনৈক কম্বোজ-রাজ রাজ্যপালের পৌত্র **দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে** পরাভূত করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল বংশের নবম রাজা **প্রথম মহীপাল** (আঃ ৯৭৮–১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ) পাল বংশের নষ্ট গৌরব আংশিক উদ্ধার করেন। তখনও বাংলার পশ্চিমাঞ্চল বা দক্ষিণরাঢ়ে শূরবংশীয় রাজা রণশূর, পূর্ববঙ্গে বা বঙ্গালে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধর্মপাল সগৌরবে রাজত্ব করিতেন।
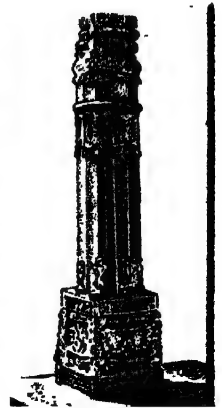
দিনাজপুর স্তম্ভ

মাদ্রাজের অন্তর্গত তিরুমলৈ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের (আঃ ১০২১-১০২৫ খ্রীঃ) একজন সেনাপতি বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং সাময়িকভাবে বাংলার রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল বঙ্গদেশ হইতে আনীত পুণ্য গঙ্গোদক দ্বারা তাঁহার রাজধানী অভিসিঞ্চিত করেন এবং উহাকে গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্ নামে অভিহিত করেন।

রণশূরের বংশধর রাজা আদিশূর কর্তৃক বাংলাদেশে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু উহার অনুকূলে কোন নির্ভুল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের অভিযান : মহীপালের মৃত্যুর পর নয়পাল ও তাঁহার পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণ পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের সময় বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধির চেষ্টা করেন—এইরূপ কিংবদন্তী তিব্বতে প্রচলিত আছে। দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল কলচুরী রাজকুমারী যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল রাষ্ট্রকূট বংশীয় একজন রাজকন্যাও বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের বর্মণবংশীয় রাজা জাতবর্মার সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের অন্য একটি কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ হয়। এই সমস্ত বিবাহ ভারতের অভ্যন্তরে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ প্রমাণ করে।

কৈবর্ত বিদ্রোহ : নয়পালের পৌত্র **দ্বিতীয় মহীপালের** সময় পাল সাম্রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাঁহার কুশাসনের ফলে দেশে বিদ্রোহ হয়। দ্বিতীয় মহীপালের সমকালে কৈবর্তজাতীয় **দিব্য** বা **দিব্যোকের** নেতৃত্বে বঙ্গের উত্তর অঞ্চলের প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হইলে দিব্যোক উত্তর বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। দিব্যোকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজ্য লাভ করেন। অচিরকাল মধ্যেই দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল তাঁহার রাষ্ট্রকূটবংশীয় আত্মীয়দের সহায়তায় ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করেন এবং তাঁহার বিজয়-চিহ্নস্বরূপ এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হইল রামাবতী।
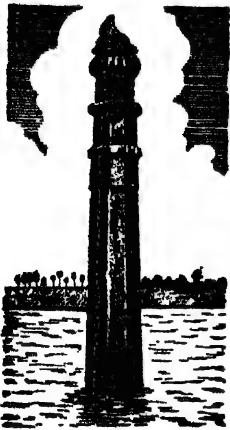
কৈবর্ত স্তম্ভ

রামপালের মন্ত্রী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত **রামচরিত** নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এই বিপ্লবের কাহিনী বর্ণিত আছে। রামচরিতে রামাবতী নগরের সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে—নগরের মধ্যে ছিল প্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ; রাজপথের

সীলমোহর—মহেঞ্জোদড়ো

হরপ্পার নৃত্যাবিদ

হরপ্পার সীলমোহর
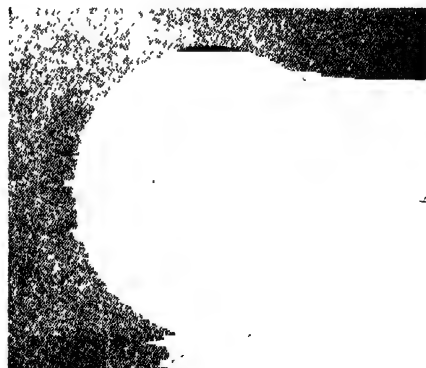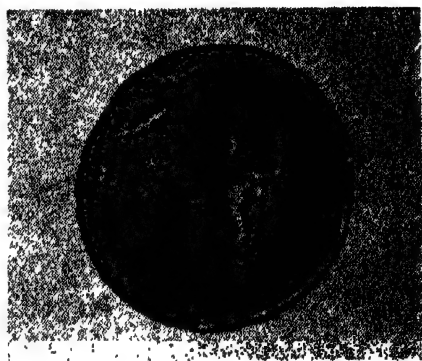
যুবরাজ সিদ্ধার্থের কপিলবস্তু ত্যাগ—অমরাবতী স্তূপের দৃশ্য
(খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী)

পার্শ্বে ছিল গগনচুম্বী শ্রেণীবদ্ধ শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ; প্রত্যেক প্রাসাদের শীর্ষ স্বর্ণ কলস দ্বারা শোভিত ছিল। প্রাসাদগুলি একই শিল্পরীতি অনুসারে পরিকল্পিত। এই প্রাসাদগুলির বর্ণনা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে বর্ণিত অলকাপুরীর অনুরূপ।

পাল বংশের অবসান ঃ রামপালের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার পুত্র কুমারপাল, পৌত্র তৃতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় পুত্র মদনপাল রাজত্ব করেন। মদনপালের দুর্বলতার সুযোগে কর্ণাটক হইতে আগত সেন পরিবারের সন্তান বিজয়সেন বঙ্গদেশ জয় করেন অবশ্য বিহারে পালবংশের অধিকার মুসলমান আগমন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের দান ঃ পাল বংশের সতর জন রাজার প্রায় চারিশত বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ জত্ব বাংলার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। পালরাজগণ 'মাৎস্য-ন্যায়' বা অরাজকতার প্লাবন হইতে বাংলা দেশকে উদ্ধার করিয়া দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন করেন। পালরাজগণের পরাক্রমে বাংলার ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব সর্বভারতে অনুভূত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়, কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভ, 'পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ধর্মপালকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পুত্র দেবপালের বিজয়বাহিনী উত্তরে কাম্বোজ, তিব্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি বহির্ভারতেও বিস্তৃত ছিল। সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রার অধিপতি শ্রীবালপুত্রদেবের সঙ্গে আদান-প্রদান তাঁহার সুদূরবিস্তৃত যশের পরিচায়ক। কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাস্ত করিয়া পাল বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই রামপালের একমাত্র কীর্তি নহে; রামপাল তুর্কীদিগকে পরাভূত করেন। বোধ হয় সুলতান মামুদ গজনীর পূর্ববর্তিকালে তুর্কী অনুচরদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বাঞ্চলে উপদ্রব করিত; তুর্কীদিগকে শান্ত করিবার জন্য উৎকোচ দান করিতে হইত এবং সেই অর্থ প্রজাবর্গ রাজকোষে কর রূপে গচ্ছিত রাখিত। এই অর্থদান বা অর্থদণ্ড সাধারণ ভাবে 'তুরস্ক দণ্ড' নামে অভিহিত হইত। সম্ভবতঃ রামপাল এই তুরস্ক সন্তানদিগকে পরাভূত করিয়া বাংলার তুর্ক-উপদ্রব নিরসন করেন।

পালযুগে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুত্থান

অনুমান করা যায় যে, রাজা শশাঙ্কের সময় হইতে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের মর্যাদা ও বিস্তার বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত না হইলেও রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় উহার প্রতিপত্তি ও অগ্রসর স্তব্ধ হইয়া যায়। বাংলার পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করিতেন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠ পোষকতা করিলেও পালরাজগণ অশোকের অনুকরণে অহিংসা নীতি গ্রহণ করেন নাই। ধর্মপাল-দেবপালের বিজয়বাহিনীর পদভারে সমগ্র উত্তর ও

দক্ষিণ ভারত প্রকম্পিত হইত। এই বংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্মপাল বিহার-বঙ্গ সীমান্তের বিক্রমশীলা এবং উত্তরবঙ্গের সোমপুরে বিহার স্থাপন করেন। রামাবতী নগরের পার্শ্বেই জগদ্দল বিহার পালযুগের কীর্তি। পাল বংশের সময় বঙ্গদেশ হইতে ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, অধ্যাপক শ্রীঅভয় করগুপ্ত প্রভৃতি অধ্যাপকগণের আকর্ষণে বহু বিদেশী ছাত্র বৌদ্ধধর্মে ও শাস্ত্রে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিতে আগমন করিত।

বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্যগণ বিভিন্ন দেশে পালরাজ পৃষ্ঠপোষিত হইয়া ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিতেন। পালরাজগণ ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মানুসরণ করিলেও তাঁহারা ধর্মে উদার ছিলেন। বিষ্ণু ও শিবের উপাসকগণ পালযুগে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। পালরাজগণের অমাত্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীও ছিলেন।

ওদন্তপুর বিহার ঃ ওদন্তপুর ছিল বিখ্যাত নালন্দার নিকটবর্তী একটি সংঘারাম। হর্ষবর্ধনের পরে নালন্দার খ্যাতি ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু পাল বংশের সময় ওদন্তপুরের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওদন্তপুর মঠে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পাঠের অত্যন্ত সুব্যবস্থা ছিল। ওদন্তপুরের গ্রন্থাগার অতি বিখ্যাত ছিল। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে যে-কোন ছাত্র বিনা বেতনে পাঠের সুযোগ লাভ করিত। প্রধানতঃ মহাযান শাস্ত্রই এখানে আলোচিত হইত। ওদন্তপুরের প্রধান অধ্যাপক মহাসাঙ্গিকাচার্য নামে সম্মানিত হইতেন। পালযুগে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর-নিবাসী চন্দ্রগর্ভ নামক একজন বাঙ্গালী যুবক ওদন্তপুরের পণ্ডিত শীলরক্ষিতের নিকট আগমন করেন। চন্দ্রগর্ভ শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধধর্মে শিক্ষালাভ করিয়া 'শ্রীজ্ঞান' নামে অভিহিত হন। এই শ্রীজ্ঞান তিব্বত ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ' নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

বিক্রমশীলা ঃ বর্তমান ভাগলপুরের নিকট পর্বত ও গঙ্গার মিলনস্থলে, প্রকৃতির প্রিয় পরিবেশের মধ্যে পালরাজ ধর্মপাল একটি মহাবিহার এবং একশতটি মঠ স্থাপন করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে এই বিহারের খ্যাতি ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারিত হইল। বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য তিন সহস্র ছাত্রের ব্যবস্থা ছিল। এখানে ১১৪ জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে ১০৭টি মঠে শিক্ষাদান করিতেন। বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য ছিলেন শ্রীঅভয় করগুপ্ত নামক একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। এই বিক্রমশীলা বিদ্যালয় তিব্বত ও নেপালবাসীর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিক্রমশীলা হইতে দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ শ্রমণ আচার্য তিব্বতে গমন করেন। এখানে এত অধিক তিব্বতী ছাত্র অধ্যয়ন করিত যে, তাহাদের জন্য বিক্রমশীলাতে একটি পৃথক ছাত্রাবাস বা মঠ নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদের শিক্ষা সমাপনান্তে

পালরাজগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্নাতকদিগকে উপাধি প্রদান করিতেন। বিদ্যালয়ের কীর্তিমান আচার্য ও ছাত্রদের প্রতিকৃতি প্রাচীরগাত্রে শোভিত থাকিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ে আচার্য পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জ্ঞানাভিযান : বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই তিনি মেধা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ওদন্তপুরে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্র প্রচারের জন্য দীপঙ্কর প্রথমে

দীপঙ্কর

ব্রহ্মদেশে গমন করেন, তারপর তিনি সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়া বহু বৎসর ধর্ম ও শাস্ত্র প্রচার করেন। তাঁহার প্রেরণায় সুবর্ণদ্বীপাধিপতি মালয় অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও শাস্ত্র প্রচার করেন।

পালরাজ নয়পালের সময় তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য কয়েকজন আচার্য প্রেরণের অনুরোধ করেন। নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে সশিষ্য তিব্বতে গমনের জন্য অনুরোধ করেন। তখন দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য। কিংবদন্তী আছে যে, তাঁহার শিষ্যগণ গুরুর বিদ্যালয় ত্যাগের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিল। দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের বৃহত্তর স্বার্থের উদ্দেশ্যে শিষ্যদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন। বৃদ্ধ, ক্লান্ত, কর্মভার পীড়িত দীপঙ্কর দুর্গম পথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া কতিপয় শিষ্যসহ তিব্বতের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সেই শুভদিনের আনন্দ-উৎসবের স্মৃতি তিব্বতীয় গ্রন্থে ভারত-তিব্বত মৈত্রীর চিরস্মরণীয় আলেখ্য।

দীপঙ্করের তিব্বতাভিযান
[পাঠাগার প্রাচীর চিত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

দীপঙ্কর তিব্বতে বহু সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন ও করান। কিছুকাল পূর্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থ ইতালীয় অধ্যাপক টুকী ও ভারতীয় অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রূপে সম্মানিত হইয়াছেন। অদ্যাপি তিব্বতীয় লামাগণ এই ভারতীয় শ্রমণের সমাধি মন্দিরে বৎসরের

একটি বিশেষ দিনে ধূপ-দীপ-বাদ্য এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে ধর্মপ্রাণ তিব্বতীয়গণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের বন্দনা ও অর্চনা করিয়া তৃপ্ত হয়। বাস্তবিক দীপঙ্কর তিব্বতে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন।

পালযুগে বাংলার সমৃদ্ধ: পাল রাজত্বকালে বঙ্গদেশে শৃঙ্খলা ছিল, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল, মানুষের মনে শান্তি ছিল। রাজা গুণের সমাদর করিতেন, গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। দেশের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। দেশের সমৃদ্ধি সমসাময়িক বাঙ্গালীর ধর্মে, কাব্যে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে, শিল্পে, স্থাপত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। পাল সাম্রাজ্য বহুকাল অন্তর্হিত, কিন্তু পালযুগের বহু কীর্তি অদ্যাপি অম্লান।

টীকাকার চক্রপাণি: পাল যুগে চক্রপাণি দত্ত নামে একজন চিকিৎসক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত চরকসংহিতার টীকা অপূর্ব গ্রন্থ। অনেকস্থলে মূলগ্রন্থ হইতেও টীকার মাধ্যমে তিনি অধিকতর মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। দূরদর্শন, অনুসন্ধিৎসা, বিচারবুদ্ধি ও সমালোচনার সমাবেশে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। তাঁহার ভাষাজ্ঞান অনবদ্য।

শিল্পী ধীমান এবং বীতপাল: নবম শতাব্দীতে দেবপালের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুইজন অপূর্ব শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল—ধীমান এবং বীতপাল। ধীমান ছিলেন পিতা, বীতপাল ছিলেন পুত্র। পিতা-পুত্র বাংলার শিল্প-ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। বাংলা দেশ প্রস্তরের দেশ নয়। তবু এই পিতা-পুত্র কি করিয়া যে প্রস্তর তক্ষণে এইরূপ অতুলনীয় নৈপুণ্য লাভ করিলেন, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। এই দুইজন বাঙ্গালী ভাস্কর প্রস্তরকে মোমের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষোদিত মূর্তিগুলি যেন ভাস্করের সঙ্গে কথা বলিত, ভাস্করের ইচ্ছামত রূপ পরিবর্তন করিত। বিখ্যাত তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথ বলেন, ধীমান এবং বীতপাল প্রস্তর ক্ষোদিত করিয়া বিক্রমশীলা বিহার নির্মাণ করেন। বীতপালের পূর্ববর্তী বাংলার শিল্পরীতি ছিল মধ্যদেশীয়; বীতপাল বাংলার প্রস্তর শিল্পে একটি নিজস্ব রীতির প্রবর্তন করেন। এই রীতিকে পূর্বদেশীয় শিল্পরীতি নামে আখ্যায়িত করা হইত। মধ্যভারত ও মগধের বহু শিল্পী বীতপালের শিষ্য ছিলেন। এই পিতা-পুত্রের শিল্পধারা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বতের প্রস্তর শিল্পকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

বাংলার সেন রাজবংশ

সেনরাজগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী। একাদশ শতাব্দীতে **সামন্তসেন** ও তাঁহার পুত্র **হেমন্তসেন** বাংলার পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। হেমন্তসেনের পুত্র **বিজয়সেন** শূরবংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া সেন বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় মদনপালকে পরাজিত করিয়া

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। উত্তর বিহারের ত্রিহুত, কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজগণ পর্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। কাহারও মতে তিনি বর্তমান হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর নিকটে নিজের নাম অনুসারে **বিজয়পুর** নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন; বিজয়পুর নবদ্বীপের নামান্তর। মতান্তরে রাজা বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার
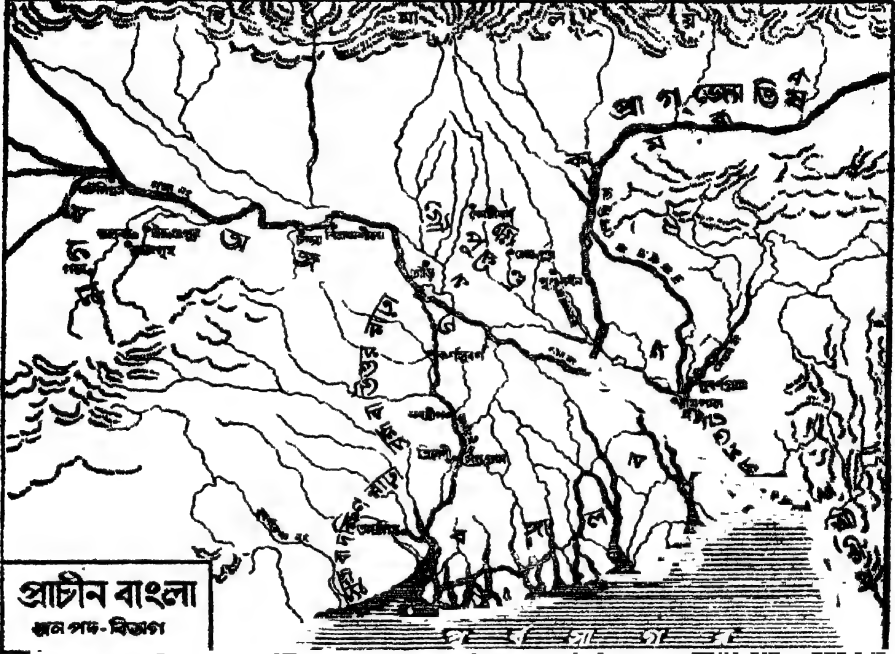
পুত্র **বল্লালসেন** (আঃ ১১৫৯-১১৮৫ খ্রীঃ) রাজ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন শূরবংশের দৌহিত্র। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রমাদেবীকে বিবাহ করেন। বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তকরূপে তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সুপরিচিত। বল্লালসেন বীর, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার সময়ে নেপাল, ভূটান, আরাকান ও ব্রহ্ম অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সেন বংশের শেষদিক হইতেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে। বৃদ্ধবয়সে রাজপুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বল্লালসেন শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন।

•বল্লালসেন

লক্ষ্মণসেন ঃ বল্লালসেনের পরে তাঁহার পুত্র **লক্ষ্মণসেন** (আঃ ১১৮৫—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই বাংলার শেষ স্বাধীন

হিন্দু নরপতি। তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গদেশ জয় করেন এবং পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগক্ষেত্রে নিজের জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'ভীরু' আখ্যা দিয়া তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন। পিতার ন্যায় লক্ষ্মণসেনও বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা বীরভূমের ভক্তকবি জয়দেব, পবনদূত কাব্য-প্রণেতা ধোয়ী, আর্যসপ্তশতী-প্রণেতা কবি গোবর্ধন, উমাপতি ধর এবং শরণ—এই পাঁচজন কবি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে নদীয়া নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয়

লক্ষ্মণসেনের শেষ জীবন বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী বিহার জয় করিবার পর অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ ও হস্তগত করেন। সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্য যে বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। নদীয়া বিজয়ের আশি বৎসর পরে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া মিনহাজউদ্দীন সিরাজ নামক একজন মোল্লা ইতিহাসকার এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। কামরূপ, কলিঙ্গ ও বারাণসী বিজেতা লক্ষ্মণসেন সতর জন অশ্বারোহীর ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন, এই উক্তি অবিশ্বাস্য মনে হয়। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজী কখনও সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করেন নাই। নদীয়া জয়ের পরও লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে (১২০০-১২০৬ খ্রীঃ), লক্ষ্মণসেনের পুত্র **বিশ্বরূপসেন** (১২০৬-১২২৫ খ্রীঃ), এবং **কেশবসেন** (১২২৫-১২৩০ খ্রীঃ) ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইবন বখ্‌তিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়

সেন বংশের পরাজয়ের কারণঃ সতর জন অশ্বারোহী লইয়া ইবন বখ্‌তিয়ার খলজীর বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনী হয়ত ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে কল্পনাবিলাস। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ সত্য যে, লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নদনদী সংকুল পূর্ববঙ্গে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পূর্ববঙ্গেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহার রাজধানী অধিকারের কোন চেষ্টা করেন নাই।

লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ তাঁহার দূরদৃষ্টির অভাব, গুপ্তচর বিভাগের অযোগ্যতা, প্রান্তদেশ রক্ষার অব্যবস্থা বা অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, বার্ধক্যে ক্ষাত্রশক্তির অভাব এবং বংশধরদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। রাজা লক্ষ্মণসেন নিশ্চয় জানিতেন যে, মুসলিমগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়া উল্কার বেগে পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অথচ তিনি মুসলিম অগ্রগতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের গুপ্তচর-বিভাগ তাঁহাকে মুসলিম অগ্রগতির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকিলে তাঁহার প্রান্তদেশ সুরক্ষিত করা উচিত ছিল। যদি সংবাদ না দিয়া থাকে, তবে তাঁহার গুপ্তচর বিভাগ অযোগ্য ছিল।

অযোগ্য গুপ্তচর বিভাগ

লক্ষ্মণসেন মুসলিম আগমনের কালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ্য রক্ষা অপেক্ষা গঙ্গাতীরে বাস ও পুণ্যস্নান করিয়া এবং সভাপণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়া কালক্ষেপ এই শ্রেয় বিবেচনা করিতেন। রাজ-জ্যোতিষিগণ তুর্কী আক্রমণকারীদের সম্ভাব্য আক্রমণ ও জয়ের বিষয় তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলেন—তবু তিনি রাজ্যরক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই। যৌবনে তিনি শৌর্যবান ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্য-হেতু তাঁহার দেহশক্তি শিথিল হইয়াছিল; সুতরাং পিতা বল্লালসেনের মতন বৃদ্ধবয়সে রাজ্যভার পুত্রদের উপর ন্যস্ত করা উচিত ছিল; অথচ তাহা তিনি করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার পুত্রদের মধ্যেও সিংহাসনের জন্য বিরোধ ছিল, সেইজন্যই হয়ত তিনি পুত্রদিগকে সুদূর পূর্ববঙ্গে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা যায়। মুসলিম আক্রমণের সময় তাঁহার কোন প্রতিনিধি বা পুত্র রাজার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণের পরেও লক্ষ্মণসেন পুত্র ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন, অথচ তাঁহারাও মুসলিম বিতাড়নের চেষ্টা করেন নাই। অনুমান করা যায় যে, তাঁহারা মুসলিম বিজয় ও স্থায়িত্বের গুরুত্ব কল্পনা করেন নাই।

লক্ষ্মণসেনের অযোগ্যতা

অন্যদিকে মুসলিম আক্রমণকারিগণ ছিল দুর্ধর্ষ, শক্তিমান, ধর্মোল্লাসে উল্লসিত। ক্রমাগত বিজয়ের ফলে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্জাত হইয়াছিল। ইবন বখ্‌তিয়ার রাজ্যজয়ের জন্য বাঙ্গলায় আসেন নাই, আসিয়াছিলেন লুণ্ঠনের আশায় এবং পূর্বাহ্ণেই রাজসভায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। মিনহাজ বলেন, রাজ-জ্যোতিষী লক্ষ্মণসেনের নিকট ভবিষ্যৎ বিধর্মী আক্রমণকারীর রূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র-বচন উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা লক্ষ্মণসেনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। নদীয়া লুণ্ঠনের পরবর্তী অধ্যায় বাংলায় মুসলিম রাজ্য স্থাপন।

ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসঘাতকতা

সেন বংশ ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক বংশের সন্তান। তাঁহাদের বিবাহ-সম্বন্ধও দাক্ষিণাত্যে ছিল। বল্লালসেন বাংলার শূর বংশের দৌহিত্র হইলেও তাঁহার রাজমহিষী রমা দেবী ছিলেন চালুক্য রাজকন্যা। বৌদ্ধ রাজবংশের সময় বাংলা দেশের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে একটি সমন্বয়ী ধারা ছিল। দাক্ষিণাত্যের সেন বংশ ছিল প্রাচীন হিন্দু সংস্কারপন্থী। তাঁহারা বাংলা দেশে হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন করিয়া কৌলিন্য-প্রথা প্রচলন করেন এবং পাল বংশের সমন্বয়ী ধারাকে প্রতিহত করেন। বাংলার জনসাধারণ সেন-সংস্কৃতি তখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুতরাং সেন বংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে বোধ হয় বাঙ্গালী মন বিশেষভাবে জড়িত হয় নাই। এইজন্যই সেন বংশের পতনের পরে বাঙ্গালী জনসাধারণ সমবেতভাবে মুসলিম ধর্ম ও ধর্মরাজ্যের বিরোধিতা করে নাই; বরং একটা সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

প্রাচীন বাংলার সামাজিক ব্যবস্থা: বাঙ্গালী জাতি বিবিধ জাতির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার আদিম অধিবাসিগণ আর্যেতর জাতি ছিল। ক্রমশঃ আর্যজাতি বিভিন্ন যুগে বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করে। বৌদ্ধযুগের অন্তে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ নূতন ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাংলা দেশে নানাপ্রকার সংকর বর্ণের উদ্ভব হয়। সেন যুগে ব্রাহ্মণগণ সমাজে উচ্চাসন লাভ করিতেন। ব্রাহ্মণের পরে কায়স্থ, বৈদ্য ও তারপর তন্তুবায়, গন্ধবণিক, ক্ষৌরকার, গোপ, মালাকার প্রভৃতি নয়টি শাখা সমাজে নবশাখ নামে পরিচিত হইল। ব্রাহ্মণেতর সমাজ সৎ শূদ্র ও নিম্ন শূদ্র পর্যায়ে ভাগ হইয়া গেল। বল্লালসেনের সময় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য-প্রথা স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কুলজী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতার আদর্শে সমাজ গঠনের চেষ্টা এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিভাগ ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ সেন যুগে প্রচলিত হয়। বাঙ্গালী সমাজে অসি জীবি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিশেষ নাই। এই সময় হইতে কায়স্থগণ মসী-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইল। কালক্রমে বল্লালসেনের প্রথা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ কনৌজী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের নাম এবং কুলপঞ্জী সমাজে প্রামাণ্য বলিয়া বাংলা সমাজে গৃহীত হয়। আদিশূর কায়স্থ ছিলেন।

জাতিভেদ ও কৌলিন্য প্রথা

বাংলার পূজাপার্বণ: বাংলাদেশ পূজা-পার্বণের দেশ; 'বার মাসে তের পার্বণ' বাঙ্গালীর জীবনের আবশ্যিক অংশ। ঋতুতে ঋতুতে উৎসব বাঙ্গালীর মনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ প্রমাণ করে। অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশী তিথি পালন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালান বাঙ্গালী গৃহিণীর অবশ্যকর্তব্য। মাঘে শ্রীপঞ্চমী, ফাল্গুনে দোল-পূর্ণিমা ও বাসন্তী পূজা, চৈত্রশেষে চড়ক পূজা ও নীল উৎসব, বৈশাখে বাস্তু পূজা ও ধর্ম ঠাকুরের পূজা, জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠীব্রত ও জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ়ে অম্বুবাচী, শ্রাবণে মনসা পূজা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গা পূজা ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙ্গালীর জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

প্রত্যেক পূজার সঙ্গে বাঙ্গালী জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; ব্রত-নিয়ম-পূজাগুলি যেমন এক দিকে ধর্মজীবনের প্রকাশ, অন্যদিকে আনন্দ-উৎসবের উৎস। এই সমস্ত পূজা উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠান আবশ্যিক ছিল। এই মেলাগুলি ছিল যাতায়াত, পরিচয় ও পণ্য বিনিময়ের যোগসূত্র। বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণগুলি বাঙ্গালী চরিত্রের সৌন্দর্যবোধ, উৎসবপ্রিয়তা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচায়ক। বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা।

নৃত্যগীতের সময় বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি সংগীতযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। নৃত্যগীতের সহিত সেকালে অভিনয়েরও যথেষ্ট প্রচলন

ছিল। শিকার, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, বাইচ (নৌকা খেলা) প্রভৃতি পুরুষের ক্রীড়া-কৌতুকের অঙ্গ ছিল। অক্ষক্রীড়া, শতরঞ্চ বা দাবা পুরুষের অবসর সময়ের সঙ্গী ছিল। গোলকধাম ও কড়ি খেলা নারীর প্রিয় ছিল।

জনসাধারণের অধিকাংশ তখন গ্রামে বাস করিত। অবশ্য ধনসম্পদপূর্ণ সুরম্য গৃহশোভিত বাংলার বহু নগরীর বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এই নগরগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষা

বাংলায় বেদ, মীমাংসা, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, কাব্য, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন ও পাঠন যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বাঙ্গালীর লিখন-শৈলী 'গৌড়ী রীতি' নামে আর্যাবর্তে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে বাঙ্গালীর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙ্গালী ছিলেন। ফাহিয়ান এবং ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারে কিছুকাল বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা করেন। জ্ঞানলাভের জন্য বাঙ্গালী দূরদেশে, এমন কি পশ্চিমে কাশ্মীর, পূর্বাঞ্চলে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীনেও গমনাগমন করিত।

বাঙ্গালীর চরিত্র

হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সমতটের লোকেরা স্বভাবতঃই শ্রমসহিষ্ণু, কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদানের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা বিশেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন-ভূষণ

প্রাচীন মূর্তিগুলি লক্ষ্য করিলে মনে হয়—প্রাচীনকালের বাঙ্গালী সাধারণতঃ একখানি ধুতি বা শাড়ী পরিধান করিত। সেকালের সাহিত্যে চর্মপাদুকা, কাষ্ঠ-পাদুকা এবং ছাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বাংলার প্রাচীন মূর্তিতে একমাত্র যোদ্ধা ও রাজপুরুষের পদেই চর্ম-পাদুকা দেখা যায়। বাঙ্গালী পুরুষ বা নারীর কোন বিশিষ্ট শিরোভূষণ ছিল কিনা সন্দেহ। পুরুষের স্কন্ধে দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ শোভা পাইত। পুরুষ ও নারী উভয়েই অঙ্গুরীয়, কুণ্ডল, কণ্ঠহার ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করিত।

ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ইত্যাদি ছিল সাধারণ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সাধরণতঃ...আমিষ আহার করিতেন, মঙ্গলকাব্যে বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য পিঠে-পায়েসের প্রচুর উল্লেখ আছে।

প্রাচীন বাংলার আর্থিক অবস্থা : বাংলা দেশ নদীমাতৃক ; সুতরাং কৃষিই ছিল বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা। বাংলার গ্রাম-পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষকের স্থান প্রশস্ত ছিল। নানাপ্রকার ধান্য, পাট, নীল, ফলমূল, ইক্ষু,

তুলা, সরিষা, নারিকেল, সুপারি বাংলা দেশের মাটিতে অতি সহজেই উৎপন্ন হয়। প্রজাকে ভূমিকর দিতে হইত। ভূমির সহিত সমপর্যায়ে বাংলার পশুও গৃহস্থের ধনরূপে পরিগণিত হইত। গাভী, ছাগ, মেষ, ঘোটক, হস্তী ইত্যাদি বাংলা দেশে সমাদৃত হইত। বাংলার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি

বাংলার শিল্প

বহু দূরদেশে প্রেরিত হইত। বাংলার লাক্ষাশিল্প সর্বত্র সমাদৃত হইত। কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের উপর সূক্ষ্ম কাজের জন্য বাংলার শিল্পিগণ বিখ্যাত ছিল। বাংলার নৌকায় বাঙ্গালী নাবিকগণ বাংলার পণ্যসম্ভার ভারত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলে বহন করিয়া লইয়া যাইত। বাংলার কর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, কংসবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদির অস্তিত্ব বাংলার শিল্প, সমৃদ্ধি ও সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। তাম্রলিপ্তি, শ্রীপুর, সপ্তগ্রাম, ভুলুয়া, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি ছিল বাংলার প্রধান বন্দর। স্থলপথে আসাম, তিব্বত, নেপাল, ভুটান চীন এবং ব্রহ্মের পণ্যের সহিত বাংলার পণ্য বিনিময় হইত। জলপথে বাংলা দেশ হইতে বিভিন্ন দল দক্ষিণে সিংহল, পূর্বে আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ বোর্ণিও ও সুদূর উত্তর-পূর্বে ফিলিপাইন ও শাখালীন (সাগালিয়ন) দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত বলিয়া অনেকের ধারণা। তাম্রলিপ্তি ছিল পূর্ব দ্বীপাঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যাপারে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

প্রাচীন বাংলায় ধর্ম: অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলা দেশ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার মিলন স্থান। স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন, আর্য আগমনের পূর্বে এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী ও প্রেতপূজক। বাংলা দেশে আর্যগণের বসতি স্থাপনের পর এদেশের লোক বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গুপ্তযুগে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং তান্ত্রিক মতবাদের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। পাল রাজগণের সময়

বাংলায় বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম

বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, শূর ও সেন বংশের সময় বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে আনীত হয়। এই সময় বাংলায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয় এবং দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মিত হয়।

সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশে বিশেষ প্রসার লাভ করে। এই সময় অথবা ইহার কিছু পরে জৈনধর্মও বাংলা দেশে প্রসার লাভ করে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বাংলা দেশ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হইলেও উহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। এই বৌদ্ধধর্মই পরবর্তিকালে সহযান বা সহজিয়া ধর্মরূপে প্রচার লাভ করে। সেনবংশের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশ হইতে লুপ্ত হইলেও ধর্মকর্মে উহার প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে বাংলার সমাজেও চিন্তাধারায় বিদ্যমান ছিল।

বাঙ্গালীরা মূর্তি গঠন করিয়া দেবতার পূজা করিত। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবতার বহু মূর্তি বাংলাদেশে বিভিন্নরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। জৈন তীর্থংকরদের এবং বুদ্ধের মূর্তিও নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে দেবদেবীগণ চট্টলেশ্বরী, ত্রিপুরেশ্বরী, ভবানী ইত্যাদি স্থানীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোথাও মনসা, বনদুর্গা ইত্যাদি অবৈদিক দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন। বাংলায় নানা ধর্ম ও পূজাপদ্ধতি উল্লেখ আছে, কিন্তু শশাঙ্কের সময় বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কিংবদন্তী ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ধর্মদ্বন্দ্বের উল্লেখ দেখা যায় না। বাঙ্গালীর ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে বহু অনার্য আচার ও ধর্মবিশ্বাস জড়াইয়া আছে।

স্থানীয় দেবদেবী

প্রাচীন বাংলার সহিত বৈদেশিক যোগাযোগ : হর্ষোত্তর যুগে বাংলা দেশের সহিত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন এবং পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের মধ্য দিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প বাঙ্গালীর দান। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের একটি অঞ্চল গৌড় নামে অভিহিত হইত। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী। যবদ্বীপের কতকগুলি মূর্তিতে তৎকালে প্রচলিত বাংলা অক্ষরের লিপি ক্ষোদিত আছে। বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী নামে একজন বাঙ্গালী (১২২৫-১২৬০ খ্রীঃ) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দা মহাবিহারে অধ্যক্ষ আচার্য শান্তি রক্ষিত তিব্বতে গমন করেন ও তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। শান্তি রক্ষিতের প্রীত্যর্থে তিব্বতের রাজা লাসায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। শান্তি রক্ষিত লাসার বিহারে ত্রয়োদশ বৎসর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভব এবং শিষ্য কমলশীল তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী বৌদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের নাম বিশেষভাবে জড়িত। দেবপালের অনুমতিক্রমে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল।

লঙ্কাবিজয়

তিব্বতে ধর্মপ্রচার

বল্লালসেনের সময় নেপাল, ভূটান, আরাকান ও ব্রহ্ম অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বুধগুপ্তের একটি শিলালিপি মালয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, মহানাবিক বুধগুপ্ত বাণিজ্য ব্যপদেশে স্বয়ং মালয়ে গমন করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ মালয়ের সহিত তাম্রলিপ্তির যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্য : আর্যপূর্ব বঙ্গবাসিগণের ব্যবহৃত ভাষার কোন লিখিত নিদর্শন নাই। আর্যদের আগমনের পরে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা

সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিত। প্রাকৃত এবং পরবর্তী যুগে ব্যবহৃত অপভ্রংশ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর অধিক পূর্বে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধযুগে লৌকিক ভাষায় ধর্মকথা লিখিত হইয়াছিল। এগুলি **চর্যাপদ** নামে পরিচিত। এই চর্যাপদের ভাষাই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে বহু বৌদ্ধ ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ **সিদ্ধাচার্য** নামে বিখ্যাত। তাঁহারা এই চর্যাপদগুলি রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত চর্চা : কথিত আছে, সাংখ্য দর্শন রচয়িতা কপিল মুনির আশ্রম বাংলা দেশের অন্তর্গত সগর দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। নিষাদ কবি বাল্মীকিও বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। পাল যুগে সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত, চরক-সুশ্রুতের টীকাকার, চক্রপাণি দত্ত-প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ, ভবদেব-প্রণীত দশমিক পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা বাঙ্গালীর কীর্তি। এখনও বাংলার উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিধি বাঙ্গালী পণ্ডিত জীমূতবাহনের দায়ভাগ দ্বারা অনেকাংশে অনুশাসিত। শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বঙ্গসন্তান ছিলেন।

পালযুগ

সেনযুগে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম বাংলা দেশে প্রসার লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই সমস্ত বিষয়ে নানাপ্রকার গ্রন্থ রচিত হয়। বল্লালসেন 'ব্রতসাগর', 'দানসাগর', ইত্যাদি পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' অপূর্ব গ্রন্থ। পূর্বেই উক্ত হইযাছে, লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতিধর, জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চকবির সমাবেশ হইয়াছিল। ধোয়ীর কল্পনাময় 'পবন-দূত' এবং জয়দেবের কোমল এবং 'কান্ত পদাবলী' সাহিত্য-রসপিপাসুদের চিরন্তন আনন্দের উৎস। জয়দেবের পদাবলীর মতন এমন শ্রুতিমধুর ও রসপুষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সেনযুগের কীর্তি।

সেনযুগ

বাংলার প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ : বাঙ্গালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার কবি-মানস ও সৌন্দর্যবিলাস। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বাঙ্গালী ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও নানাবিধ শিল্পের মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের সাধনা করিয়াছে। কিন্তু কালের প্রভাবে, ভৌগোলিক বিপর্যয়ে, যত্নের অভাবে, কোথাও বা রাজনৈতিক কারণে বাঙ্গালীর চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যচিহ্ন লুপ্ত। শিল্পের অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে, ঢাকা ও কলিকাতার যাদুঘরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় এবং গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

অনেক চৈনিক পরিব্রাজক বলেন সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা দেশে বহু বৌদ্ধ ও জৈন বিহার ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ফলে বাংলায় কয়েকটি বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সোমপুরবিহার ভারতে এবং বহির্ভারতে বিখ্যাত ছিল। সোমপুর বিহারই ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত বৃহত্তম বিহার। সোমপুরের ভাস্কর্য অতি সূক্ষ্ম।

শিববাটীর বুদ্ধমূর্তি

কুমিল্লার নিকট ময়নামতী পর্বতে কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে এই বিহার সোমপুব বিহার অপেক্ষাও বৃহদায়তন ছিল। ময়নামতী বিহার তিব্বতীয়দের অতি প্রিয় ছিল।

প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলিও প্রায় সবই ধ্বংস হইয়াছে। বাঁকুড়ায় একেশ্বব মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর ক্ষুদ্র মন্দির, বর্ধমানের অন্তর্গত বরাকরের মন্দির, দিনাজপুরের অন্তর্গত রামগড়ের মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যগৌরবের নিদর্শনরূপে এখনও বিরাজমান রহিয়াছে।

কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী বধ—সোমপুর

প্রাচীন বাংলার মন্দির অধিকাংশ ধ্বংস হইলেও বহু প্রাচীন মূর্তি এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির মধ্যে তাম্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত দগ্ধমৃত্তিকার ভাস্কর্য নিদর্শনটিকে পণ্ডিতগণ বাংলার প্রাচীনতম শিল্পনিদর্শন বলিয়া মনে করেন। মহাস্থানগড়ের নিকট প্রাপ্ত স্বর্ণপত্রাবৃত অষ্টধাতু নির্মিত মঞ্জুশ্রী মূর্তিটিকে শিল্প রসিকগণ প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূর্তি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মহাস্থানগড়ের বুদ্ধমূতিও বিশেষ বিখ্যাত। সোমপুর বিহারগাত্রে দগ্ধমৃত্তিকা উৎকীর্ণ ও প্রস্তরক্ষোদিত মূর্তিগুলি বাঙলার ভাস্কর্যশিল্প-গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ

কর্তৃক কেশী বধ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, পুরাণ ও প্রাচীন আখ্যান-উপাখ্যান অবলম্বনে অঙ্কিত দৃশ্য ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জ এই শিল্প নিদর্শনগুলির বিষয়বস্তু।

বিখ্যাত লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের বিবরণে বাংলার শিল্পী ধীমান ও বীতপালের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই দুইজন তক্ষণশিল্পী, ধাতব মূর্তি-শিল্প ও চিত্রশিল্পে বাংলা দেশে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলার পটুয়া ও পটচিত্রে বাঙ্গালী শিল্পীর বর্ণসমাবেশ ও রেখাঙ্কন-নৈপুণ্যের অপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের চিত্রগুলি কীটের অত্যাচারে, জলবায়ুর প্রভাবে এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে মহেঞ্জোদড়োর অনুরূপ শিল্পচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতার ২৫ মাইল দূরে দুর্গাপুরে ভূ-নিম্নে ইদানীং একটি বিরাট নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির বিশ্লেষণ সমাপ্ত হইলে প্রাচীন বাংলার শিল্প-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে।

বর্তমানে বাংলা দেশে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে মহেঞ্জোদড়োর অনুরূপ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। ঐগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, সিন্ধু হইতে বাংলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একই সভ্যতার ধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। পালবংশের উত্থান-পতন ও কীর্তিকাহিনী বর্ণনা কর।
(Write an account of the rise and fall of the Palas of Bengal. Give a general resume of the Pala achievements in Bengal and outside.)

২। বাংলার সেনরাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর।
(Give an account of the Senas of Bengal.)

৩। প্রাক্ মুসলিম যুগে বাংলার ধর্ম, সমাজ ও আর্থিক অবস্থার বিবরণ দাও।
(Describe the Religion, Society and Economic condition of Pre-Muslim Bengal.)

৪। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তিকাহিনী আলোচনা কর।
(Briefly describe the cultural achievements of Bengal outside the State.)

৫। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দাও।
(Sketch the architecture of ancient Bengal.)

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) শশাঙ্ক (খ) লক্ষ্মণসেন (গ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।
(Write short notes on : (a) Sasanka (b) Lakshansena (c) Dipankar.)

একাদশ অধ্যায়

বহির্ভারতে ভারতীয় উপনিবেশ

বহির্ভারতে ভারতীয় উপনিবেশের ধারা : সকল দেশেই উপনিবেশ স্থাপনের সাধারণতঃ পাঁচটি কারণ লক্ষ্য করা যায়—দেশে স্থানাভাব, বণিকের অর্থলোভ, দুর্ধর্ষ মানুষের দুঃসাহসিক কর্মপ্রবণতা, রাজার রাজ্যলোভ অথবা ধার্মিকের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা। ভারতবাসী স্বদেশে স্থানাভাব হেতু বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই ; কারণ, প্রাচীন ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় স্থানাভাব ছিল না। মধ্য এশিয়াতে রাজ্যলোভে কোন ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও কলার নিদর্শন—মঠ, মন্দির, মূর্তি, গ্রন্থ, চিত্র ইত্যাদি। বিদেশে

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ
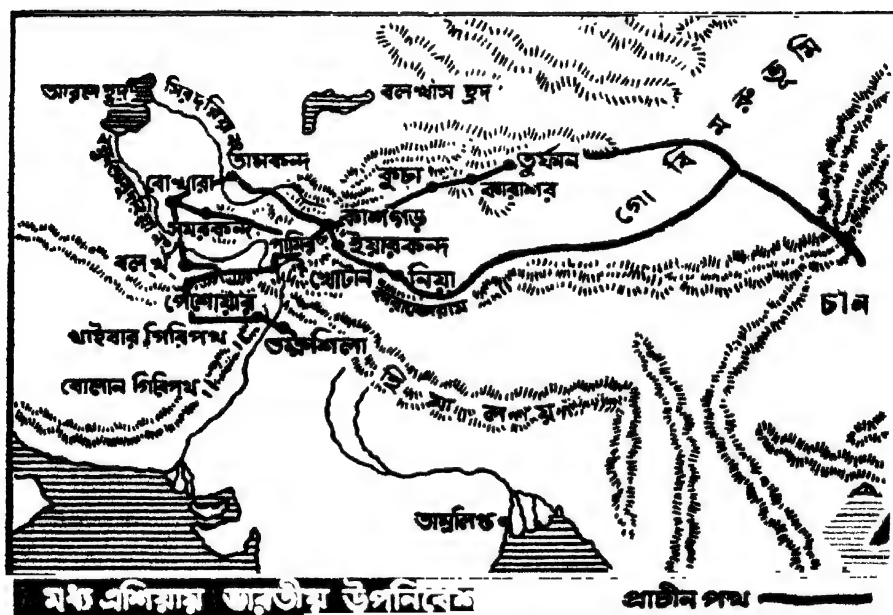
দুর্ধর্ষ ভারতবাসীর কর্মপ্রচেষ্টার ঐতিহাসিক সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের উপনিবেশগুলির সহিত ভারতের প্রায় পনর শত বৎসরের সংযোগ রহিয়াছে। এই উপনিবেশ স্থাপনের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ বণিকের বাণিজ্য-প্রচেষ্টা। এই অঞ্চলের অরণ্য, খনি, ধনরত্ন ইত্যাদি সর্বদাই ভারতীয় বণিককে আকৃষ্ট করিত। সেইজন্যই ভারতবাসী এই অঞ্চলের নামকরণ করিয়াছিল সুবর্ণভূমি। কোন কোন অঞ্চলে স্বদেশত্যাগী ভারতীয় রাজপুত্র বা রাজা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবাসী এই সমস্ত দেশে নিজ সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রচার করিয়াছে

সত্য ; কিন্তু উহাকে নূতন অধ্যুষিত অঞ্চলের উপযোগী করিয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নূতন দেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়া লইয়াছিল। একমাত্র সিংহলে বিজয় সিংহ নামক একজন বাঙ্গালী রাজপুত্র উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাপানের উত্তরে সুদূর শাখালিন দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল—ইহা আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদের মত। ব্রহ্ম, চম্পা, মালয়, কম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি নামগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

গুপ্তযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ঃ গুপ্তযুগে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্য ছিল ; দেশের সমৃদ্ধি সকল দিক দিয়া উচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ণমনে, নিঃশঙ্কচিত্তে, স্বচ্ছন্দ গতিতে ভারতবাসী বিদেশে অর্থের সন্ধানে অথবা ধর্মপ্রচারে, কেহ বা দুঃসাহসিক কর্মের উন্মাদনায় বহির্ভারতে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ
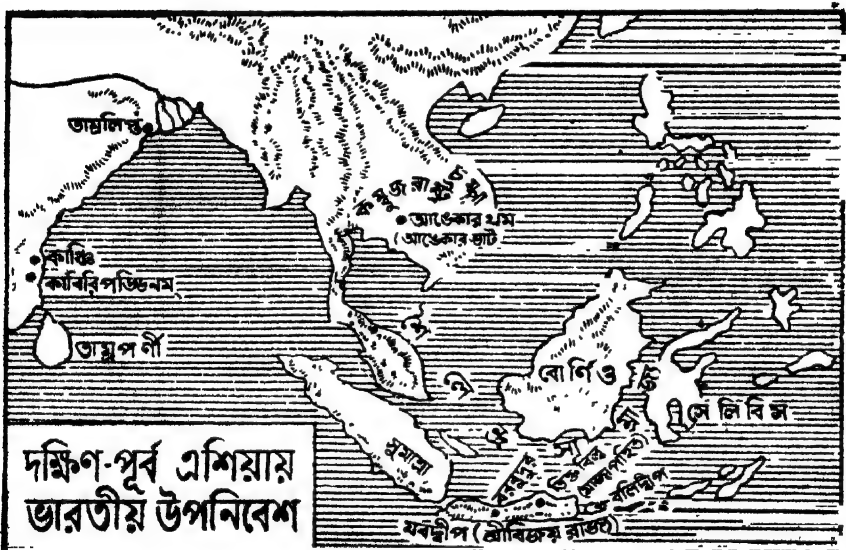
যাত্রা করিয়াছিল। ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু উপনিবেশ এবং রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের মধ্য দিয়া স্থলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল। বাংলার তাম্রলিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজের নাগপট্টম পর্যন্ত উপকূলবাসী বণিক ও নাবিকগণ এই অঞ্চলের সহিত পণ্য আদান-প্রদান করিত। বিচিত্র রত্নের ভাণ্ডার ছিল এই সমস্ত অঞ্চল। ভারতবাসী এই ভূখণ্ডের নামকরণ করিয়াছিল সুবর্ণভূমি। পণ্যবিনিময় ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি এই অঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

চম্পা (ভিয়েতনাম) ঃ ব্রহ্মদেশের পূর্বে, চীনের দক্ষিণে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল স্থলভাগ বর্তমানে ইন্দোচীন উপদ্বীপ নামে পরিচিত।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম চম্পা। বিভিন্ন সময়ে এই উপদ্বীপে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপিত হয়। চম্পা নামটি সংস্কৃত। কিংবদন্তী আছে যে, বাংলার চম্পা (বর্তমান বিহারের ভাগলপুর) হইতে একদল বণিক অথবা কোন রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র বর্তমান আনাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া মাতৃভূমির নাম অনুসারে উহার নামকরণ করিয়াছিল **চম্পা**। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় বারশত বৎসর পর্যন্ত নানা বিপর্যয় ও গৌরবের মধ্য দিয়া বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে চম্পা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। **জয়পরমেশ্বরবর্মণ, রুদ্রবর্মণ** ও **জয়সিংহবর্মণ** প্রভৃতি শক্তিশালী নরপতি চম্পা অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিবেশী মালয় ও কম্বোজ রাজগণের আক্রমণ এবং মোঙ্গল বীর কুবলাই খানের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ক্রমাগত মোঙ্গল অভিযানে চম্পা রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। চম্পার প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগণ নিঃশেষ হইয়াছে; কিন্তু বহু মন্দির, মঠ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চম্পা রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম ও সংস্কৃতির মৌন সাক্ষ্য বিরাজমান। চম্পা রাজগণ সাধারণতঃ শিব, শক্তি, গণেশ ও কার্তিকের (স্কন্দ) পূজা করিতেন। পরবর্তিকালে এই অঞ্চলে বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের পূজাও প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম চম্পাতে অজ্ঞাত না থাকিলেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কম্বুজ (কাম্বোডিয়া): চৈনিক কিংবদন্তীতে বর্ণিত আছে যে, **কৌণ্ডিণ্য** নামে একজন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কম্বুজ দেশ আক্রমণ করেন এবং স্থানীয় নাগরাজকুমারী উল্লিফকে (সোমা) পরাজিত করিয়া বিবাহ করেন। কম্বু নাম হইতে **কম্বুজ** বা **কম্বোজ** নামের উৎপত্তি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজের যথার্থ গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। **জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ** প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা কম্বোজে রাজত্ব করিয়াছেন। চম্পা অপেক্ষা কম্বোজের অধিক ও ব্যাপক খ্যাতি ছিল। এক কালে লাওস, কোচীন, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মের এক অংশ ও মালয় উপদ্বীপ অঞ্চল কম্বোজ রাজ্যের অধীন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কম্বোজ রাজগণের কীর্তি-বর্ণিত দ্বাদশটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কম্বোজ রাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কম্বোজ রাজগণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজধানী **আঙ্কোরথম নগর** ও **আঙ্কোরভাট** মন্দির।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য (ইন্দোনেশিয়া): মালয় এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষোদিত একখানি প্রস্তরলিপি হইতে শৈলেন্দ্র বংশের **শ্রীমহারাজের** উল্লেখ পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্র নামটি ভারতীয়। চম্পা এবং কম্বোজ রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্রগণের ক্রমাগত যুদ্ধ এই সাম্রাজ্যের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। শৈলেন্দ্র বংশের সম্বন্ধে আরব পর্যটক খোরদাদ্‌জ্‌ বে

(৮৪৪-৮৪৮ খ্রীঃ) বলিয়াছিলেন, এই সমৃদ্ধ রাজ্যের দৈনিক আয় ছিল দুই শত মণ স্বর্ণ ; রাজা প্রতিদিন একটি স্বর্ণ-নির্মিত ইষ্টক জলদেবতাকে উৎসর্গ করিতেন। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র রাজ্যের এক বিরাট অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলেন্দ্রগণ এক শত বৎসরের মধ্যেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। চীন ও ভারতের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজগণের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ **বালপুত্রদেব** বাংলার বৌদ্ধ রাজা দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বালবপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে গিয়া **চন্দ্রভান** শৈলেন্দ্রের পতন হয় এবং শৈলেন্দ্র বংশ হীনবল হইয়া পড়ে। শৈলেন্দ্র বংশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। বাঙ্গালী শ্রমণ **কুমারঘোষ** ছিলেন শৈলেন্দ্র রাজার ধর্মগুরু। তাঁহারই আদেশে মালয়ে তারাদেবীর বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির শৈলেন্দ্র রাজবংশের বুদ্ধপ্রীতির নিদর্শন।

শৈলেন্দ্র বংশের ধর্ম ও সংস্কৃতি

যবদ্বীপের শ্রীবিজয় রাজ্য : খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবদ্বীপের রাজা **দেববর্মণ** চীনে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার পূর্বেই যবদ্বীপের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীর যবদ্বীপে একটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মণ যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্রগণের শাসনাধীন হয় ; নবম শতাব্দীতে যবদ্বীপ পুনরায় স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে **শ্রীবিজয়** নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁহার নামানুসারে সেই রাজ্যের নাম হইল শ্রীবিজয় রাজ্য। শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজধানী ছিল **তিক্তবিল্ব** নগর (মাজাপহিত)। শিবের প্রিয় বিল্ব নাম হইতে অনুমান করা যায় যে, এখানে শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীবিজয় রাজ্যের সীমা চতুর্দশ শতাব্দীতে মালয় ও সমীপবর্তী দ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীবিজয় বংশের একজন পলাতক রাজপুত্র মালাক্কা দ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। মালাক্কার দ্বিতীয় রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ষড়যন্ত্রে যবদ্বীপের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলে রাজ পরিবার বলিদ্বীপে প্রস্থান করিয়া সেখানে একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। বর্তমানে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে একমাত্র বলিদ্বীপেই হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব বিরাজমান।

বলিদ্বীপে হিন্দুরাজ্য : বলিদ্বীপ অন্যতম প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ। কথিত আছে, ভারতীয় বলিরাজা এখানে উপনিবেশটি স্থাপন করেন। ভারতের দক্ষিণ

পূর্বদিকস্থ দেশগুলির অধিবাসিগণ বৌদ্ধ, ইসলাম অথবা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। কিন্তু বলিদ্বীপবাসিগণ এখনও হিন্দু। প্রাচীন হিন্দুনীতি অনুসারে এখনও বলিদ্বীপবাসী কৃষির একষষ্ঠাংশ রাজকর দান করে। বলি-সমাজে জাতিভেদ, পুরোহিত, মন্দির ও পূজাবিধি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মনীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। বলিদ্বীপের ধর্মের ভাষা সংস্কৃত, তাহারা বেদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কৌলিক আচারে হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বলিদ্বীপের প্রাচীন রাজগণের মধ্যে উগ্রসেন (৯১৫—৯৪২ খ্রীঃ) এবং উদয়ন (৯৮৯-১০০১ খ্রীঃ) বিখ্যাত একাদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের বৌদ্ধ রাজপুত্র বলিদ্বীপ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বলিরাজ্য লাভ করেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপালিত পুনরায় বলিদ্বীপে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিয়া বলিদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান বলিদ্বীপ অধিকার করে। বর্তমানে বলিদ্বীপ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার অংশ।

স্থাপত্য : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যখন ভারতীয় উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয় তখন ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া এই অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। এখানে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর স্থানীয় অধিবাসিগণ ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণ ও ইসলামিক প্রভাব বিস্তারের ফলে এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবশ্য সমস্ত দ্বীপাঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা স্থানীয় সভ্যতাকে প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছিল। আধুনিক কালে গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে এই বিপুল সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি প্রাচীন ভারতীয় প্রায়বিস্মৃত যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পাদ্রী কম্বোজের রাজধানী **আঙ্কোরথম** আবিষ্কার করেন। এই নগরের প্রাচীন নাম **যশোধরপুর**। জনৈক চৈনিক দূতের বিবরণে দেখা যায়, এই চতুষ্কোণ নগরটি প্রায় দশ মাইল পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। নগরের মধ্যে জলাশয়, শিলাতল, বিচিত্র কারুকার্য-শোভিত প্রাসাদ ও মন্দির দর্শককে বিস্মিত করিত। আঙ্কোরথম নগরের দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে **আঙ্কোরভাট** মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম এবং সৌন্দর্যে অনুপম। আঙ্কোরভাট মন্দিরের মুখ্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু। এই মন্দিরে নটরাজ শিব, কিরাতবেশী মহাদেব এবং অর্জুনের যুদ্ধের দৃশ্য ক্ষোদিত আছে। ইহা ভিন্ন যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, বেদ-তন্ত্রোক্ত দেবদেবী এবং বৌদ্ধ দেবতা প্রজ্ঞাপারমিতার (জ্ঞানদেবীর) মূর্তি রহিয়াছে। আঙ্কোরভাটের মন্দিরটি জলবেষ্টিত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। এই মন্দিরের সংলগ্ন সেতু-সংযোজিত অন্য একটি

মন্দির আছে। উহাই বিখ্যাত ত্রিতল **বেয়ন** মন্দির। এই মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত ছিল ভারতীয় পুরাণবর্ণিত চুয়াল্লিশটি ভীষণ দৈত্য মূর্তি, তোরণের পার্শ্বে একটি চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ নাগমূর্তি, সম্মুখে দুইটি বিরাট গজমুণ্ড। মন্দিরে চল্লিশটি গম্বুজ ছিল, প্রত্যেকটি গম্বুজশীর্ষে ধ্যানমগ্ন শিবমূর্তি ক্ষোদিত ছিল। মন্দিরে কোন্ দেবতার মূর্তি ছিল তাহার চিহ্ন নাই। মন্দিরের গাত্রে বহু সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল। এই মন্দিরে একটি বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

বরবুদুর : ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দুর বৃহত্তম মন্দির কাম্বোডিয়া এবং বৌদ্ধদের বৃহত্তম মঠ জাভা বা যবদ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষে নহে। যবদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত বরবুদুরের মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের সমকালে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি পরস্পর নয়টি স্তরে নির্মিত। ইহার ভিত্তির পরিধি তিন শত তিরানব্বই হস্ত : উচ্চতা নব্বই হস্ত পরিমিত। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ ছিল বুদ্ধ মূর্তি। বৌদ্ধ তারা ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তিও ইহার পার্শ্বে আসন লাভ করিয়াছে। জাতকের কাহিনীগুলি মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনেরও অনেক চিত্রও এখানে উৎকীর্ণ আছে। একটি জাহাজে সমাগত ভারতীয়গণকে সম্বর্ধনার দৃশ্য এই চিত্রগুলির অন্যতম। বরবুদুর মন্দির পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। শৈলেন্দ্র-বংশের পতনের পর হিন্দুগণ বরবুদুরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি ক্ষোদিত

বরবুদুরের মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ ভারতীয়গণের সম্বর্ধনার দৃশ্য

করিয়াছিল, বরবুদুরের মন্দির-গাত্রে সম্পূর্ণ রামায়ণের আকর্ষণীয় কাহিনীর দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে।

বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবাসী কূপমণ্ডূক ছিল ; স্মৃতিশাস্ত্রেও সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে। মুসলিম যুগে পশ্চিমের সীমান্তের পথে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ সহজেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম সমুদ্রে প্রথম আরব, পরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় জাতির প্রাধান্যের ফলে ভারতের যোগাযোগ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পূর্বাঞ্চলে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতেও মুসলিম আগমন ও রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবাসী নূতন করিয়া রাজ্য

স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং ভারতবাসী সাগর ও পর্বতবেষ্টিত সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল।

অনুশীলনী

১। মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।
(Write a short account of the Indian colonial activity in central Asia.)

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস লিখ।
(What was the main incentive to Indian colonisation in the islands of the South East Asia. Give a brief description of the expansion of Indian religion and culture in those regions.)

৩। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখঃ (ক) বরবুদুর, (খ) আঙ্কোরভাট, (গ) শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য, (ঘ) শ্রীবিজয় রাজ্য।
(Write short notes on : (a) Barabadur, (b) Ankorbhat, (c) Sailendra Empire, Sri Vijaya Kingdom.)

দ্বাদশ অধ্যায়

আরব জাতির সিন্ধু বিজয়, রাজপুত জাতির অভ্যুদয়, ভারতে মুসলিম অধিকার

অধ্যায় পরিচয় : এই অধ্যায়ের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে আরবে ইসলাম ধর্মের উত্থান ও সিন্ধুবিজয়, দ্বিতীয় অংশে রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান, শেষ অংশে ভারতে মুসলিম গোষ্ঠীর অধিকার স্থাপন। এই যুগেই কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে গুর্জর-প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পালবংশের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এই দ্বন্দ্বের অবসানে দেখা গেল উত্তর ও মধ্যভারতে রাজপুতনার বিভিন্ন অংশে রাজপুত জাতি কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। এই যুগের বৈশিষ্ট্য—একদিকে বহির্ভারত হইতে মুসলিমদের আক্রমণ, অন্যদিকে ভারতের অভ্যন্তরে সবল পুষ্ট রাজপুত-জাতির অভ্যুত্থান। মনে হয় যেন হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের প্রচ্ছদপট ইতিহাসে পূর্বাহ্ণেই রচিত হইয়াছে—এক পক্ষে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতি, প্রতিপক্ষে নবজাগ্রত তুর্ক-আফঘান-মুঘলজাতি। বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতবর্ষে জাত রাজপুতজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব এই যুগের স্মরণীয় ঘটনা। স্পেন হইতে পারস্য পর্যন্ত ভূখণ্ড জয়ে মুসলিম শক্তি বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয় নাই ; কিন্তু মুসলিমগণ ৫০০ বৎসর চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয় করিতে পারে নাই। আরব (৭১০-৭৩৫ খ্রী:), গজনী শক্তি (৯৯১ ১০২৯ খ্রী:) এবং ঘুর শক্তি (১০৭৫-১১৯৩ খ্রী:) হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রবাহে মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তিনটি মুসলিম গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সুবিশাল ভারতের সংকীর্ণ অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বভারতব্যাপী মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সর্বভারতে মুসলিম ধর্ম প্রচারচেষ্টা সফল হয় নাই ; আরব শক্তি অধিকৃত সকল দেশেই মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের ভাষা আরবী প্রচলন করিয়াছিল। মরক্কো হইতে আফঘানিস্থান পর্যন্ত সর্বত্রই বিজিত জাতিগুলিকে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করিতে এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ইসলাম গ্রহণ ও ঐস্লামিক জীবনধারা অনুসরণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষই একমাত্র মুসলিম বিজিত দেশ যেখানে নিরঙ্কুশভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয় নাই ও ঐস্লামিক জীবনধারা প্রবর্তনও সম্ভব হয় নাই। মুসলমানগণ ভারতের বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়াই রাজত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় ইসলাম আরবীয় ইসলাম হইতে বহুলাংশে পৃথক।

আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান : এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা —এই তিন মহাদেশের সংযোগস্থলে আরবদেশের অবস্থান। ভূমধ্যসাগর,

লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তিনটি জলধারা আরবের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে। আরবদেশেই পৃথিবীর তিনজন প্রধান ধর্মগুরু মূসা (মুজেস), যীশু (ইসা) ও মুহম্মদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই আরবদেশেই ইহুদীদের ধর্মতীর্থ অশ্রুপ্রাচীর, যীশুর জন্মস্থান বেথেলহেম ও সমাধি স্থান জেরুসালেম এবং মুসলমানের ধর্মস্থান মক্কা ও মদিনা। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসে আরবদেশ অতি প্রসিদ্ধ।

আরবদেশ ও ধর্মাবতার

হজরত মুহম্মদ ও আরবে ইসলাম ধর্মের উত্থান

মহারাজ হর্ষের সমকালে আরবে ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে কোরায়েশ বংশে দরিদ্র পরিবারে মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ্, মাতা ছিলেন মদিনার অধিবাসিনী আমিনা। মুহম্মদের জন্মের কয়েকমাস পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মুহম্মদের ষষ্ঠ বৎসরে মাতা আমিনাও পরলোক গমন করেন। তখন পিতৃব্য আবুতালিবের আশ্রয়ে মরুভূমিতে উষ্ট্র ও মেষ পালকরূপে মুহম্মদ জীবন আরম্ভ করেন। পরগৃহে অবাঞ্ছিত শৈশবজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা মুহম্মদকে বাস্তববাদী করিয়াছিল। অন্যদিকে বিশাল মরুভূমির উদার ক্রোড় তাঁহাকে অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ দান করিয়াছিল। পদনিম্নে দিগন্তবিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকারাশি, শীর্ষোপরি অগ্নিবর্ষী সূর্যকিরণ তাঁহাকে দৃঢ়চিত্ত ও সংগ্রামশীল হইবার সুযোগ দিয়াছিল। শৈশবে মুহম্মদ কোন নিয়মিত শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত জ্ঞানই স্বভাবসঞ্জাত ও অভিজ্ঞতালব্ধ। পিতৃব্য বণিক আবুতালিবের পণ্যসম্ভারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়া মুহম্মদ কিশোর বয়সে পণ্যবাহী উষ্ট্রের সঙ্গে আরবের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং আরব সমাজ ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। খাদিজা নাম্নী এক ধনী আত্মীয়া বিধবা মহিলার কর্মচারিরূপে পণ্যের সঙ্গে মুহম্মদ সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই ধনী মহিলাই মুহম্মদের প্রথম বিবাহিত পত্নী। তখন মুহম্মদ পঁচিশ বৎসরের যুবক, চারিটি সন্তানের জননী খাদিজা চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া। বাণিজ্য ব্যপদেশে ভ্রমণকালে তিনি ইহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি নানা ধর্মের লোকের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন আরবদেশ ছিল বহু ঈশ্বর ও পৌত্তলিকের দেশ। প্রাক্ ইসলাম আরবদেশে আল্লাহ্, হুবাল; লাত্, মন্‌আত, উজ্জা প্রভৃতি দেবতা জনপ্রিয় ছিল। প্রায় প্রত্যেক গোষ্ঠী, পরিবার, এমন কি ব্যক্তিরও উপাস্য দেবতা বিভিন্ন ছিল। দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী, পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে বংশানুক্রমিক বিবাদ ও যুদ্ধের অন্ত ছিল না।

মুহম্মদের জন্ম ও বাল্যজীবন

মুহম্মদ চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। মুহম্মদ-প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম, তাঁহার শিষ্যদের নাম মুসলিম, তাঁহার ধর্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। আল্লাহ্ এক, মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ (রসুল)—ইহাই ইসলামের মূলমন্ত্র (কলমা)। মুসলিমগণ একেশ্বরবাদী। ইমান (ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস), নামাজ (উপাসনা), রোজা (উপবাস), জাকাত (দরিদ্র কর) এবং 'হজ' (মক্কায় তীর্থ ভ্রমণ)—এই পাঁচটি হইল ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ। মুসলিমগণ আল্লাহ্, দেবদূত বা ফেরিস্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে; তাহারা বিশ্বাস করে যে, কোরাণ অভ্রান্ত, ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, মুহম্মদ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী বা বাণীবাহক—মুহম্মদের পরে আর কোন নবী বা ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে আসিবেন না। তাহারা পুনর্জন্ম এবং জন্মান্তর বিশ্বাস করে না। ইসলামে কোন পুরোহিত নাই, প্রত্যেক মুসলমানই ইসলাম ধর্মপ্রচারক।

ইসলামধর্ম

ইসলাম প্রচার: পৌত্তলিক ও বহু ঈশ্বরের দেশে এক-ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ঘোষণা করায় মুহম্মদ আত্মীয়-স্বজন হইতে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেন। তিনি মক্কা হইতে মদিনায় হিজরৎ বা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয় করিয়া মুহম্মদ এক-আল্লাহ্‌র মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। মুসা, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, কনফিউসিয়াস, যীশু প্রভৃতি অন্য কোন মহাপুরুষকে যুদ্ধ করিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই। মক্কা বিজয়ের তিন বৎসরের মধ্যে (৬৩২ খ্রীঃ) মুহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আরবে মুসলমানের সংখ্যা তিন চারি সহস্রের বেশী ছিল না। পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে আরবগণ পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে কাবুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয় করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল।

আরবজাতির অগ্রগতি: মুহম্মদের মৃত্যুর পরেই আরবগণ আরবের বাহিরে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিল। যুগপৎ ধর্ম প্রচারের আবরণে রাজ্যজয় ও রাজ্যজয়ের আবরণে ধর্ম প্রচার আরব জাতির বৈশিষ্ট্য। মুহম্মদের মৃত্যুর পর আট বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আরবগণ পালেস্টাইন, মিসর এবং উত্তরে সিরিয়া জয় করিল।

পূর্ব দিকে আরব বিজয়বাহিনী মুহম্মদের মৃত্যুর পনর বৎসরের মধ্যে পারস্য দেশ জয় করিল। অচিরকাল মধ্যে অক্ষুনদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহারা হিন্দুকুশ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিজিত দেশে আরবগণ ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা এবং কোরাণ-সম্মত আচার-ব্যবহার প্রবর্তন করিল। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ সহস্র আফঘান অধিবাসী কাবুল অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। বিজিত দেশে আরবী ভাষা ও লিপি প্রচলন ও কোরাণ প্রচার ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আরবজাতি ও ভারতবর্ষ : ভারতবর্ষ বা হিন্দু দেশ প্রাচীন আরব জাতির নিকট অজ্ঞাত ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দুই দেশের মধ্যে আরবসাগর ও ভারত মহসাগরের জলপথে, খাইবার, বোলান ও মাকরানের স্থলপথে বাণিজ্য চলাচল ছিল। সিন্ধুদেশীয় বণিক আরবের প্রায় সকল বন্দরে ও বাজারে সুপরিচিত ছিল। ভারতের অর্থসম্পদের কাহিনী আরব বণিকের মাধ্যমে আরবে সুপ্রচলিত ছিল।

মুহম্মদের মৃত্যুর পর বার বৎসরের মধ্যেই খলিফা ওমরের সময় তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়। প্রথম অভিযানের লক্ষ্য ছিল বোম্বাই-এর নিকটবর্তী **তানাহ্** বন্দর (৬৩০ খ্রীঃ); দ্বিতীয় অভিযানের লক্ষ্য ছিল **বার্ওয়াস** (ব্রোচ বা ভৃগুকচ্ছ —৬৩৮ খ্রীঃ); তৃতীয় অভিযানের লক্ষ্য ছিল সিন্ধুনদের তীরবর্তী **দেবল** বন্দর (৬৪৩ খ্রীঃ)। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী আরবদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন।

আরব জাতির ভারত অভিযান

খাইবারের পথে কাবুল এবং জাবুলের হিন্দুগণ মুসলিমের অগ্রগতি দীর্ঘকাল প্রতিহত করিয়াছিল। মুহম্মদের জামাতা খলিফা আলীর সময়ে (৬৬০ খ্রীঃ) আরবগণ স্থলপথে বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ভারতের দিকে অভিযান করে। ঐ অঞ্চল তখন জাঠ-অধ্যুষিত কিন্তু সিন্ধুরাজের শাসনাধীন ছিল এবং কিকান নামে অভিহিত হইত। কিকানের শাসনকর্তা আরব সৈন্যাধ্যক্ষকে পরাভূত ও নিহত করেন এবং ভারত সীমান্ত হইতে আরবগণকে বিতাড়িত (৬৬৩ খ্রীঃ) করেন। আরবে মুসলিম রাজত্বের প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আরব বিজয়-বাহিনীর এই প্রথম পরাজয়। সুতরাং আরবগণ এই অপমান দীর্ঘকাল বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ইহার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল কিকান বিজয় আরব জাতির প্রধান লক্ষ্য হইয়া রহিল।

পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্যে (৬৬০ হইতে ৬৮০ খ্রীঃ) আরবগণ ছয় বার কিকান আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত বেলুচিস্থানের

আরব জাতির কিকান বিজয়ের প্রচেষ্টা

অন্তর্বর্তী একমাত্র মাকরানের একটি দুর্গ অধিকার করিয়া আরবগণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ইহার পরবর্তী ত্রিশ বৎসর (৬৮০ হইতে ৭১০ খ্রীঃ) আরবের ইতিহাস অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। ৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিচক্ষণ খলিফা আল ওয়ালিদের শাসন আরম্ভ হইল। দুর্ধর্ষ খলিফার দুর্ধর্ষতর প্রতিনিধি হেজ্জাজ বিন ইয়ুসুফ ৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক বা পূর্বাঞ্চলের আরব শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইলেন। হেজ্জাজের শাসনকালে আরবগণ সিন্ধুরাজ্যের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন।

আরব অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুর অবস্থা : বালাজুরী-রচিত 'চাচনামা' নামক আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে সমকালীন

সিন্ধুদেশের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। অবশ্য হর্ষযুগে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সিন্ধুর বর্ণনা করিয়াছেন। হিউয়েন সাঙের উল্লেখ অনুসারে দেখা যায়, হর্ষযুগে সিন্ধুদেশ শূদ্ররাজ-শাসিত স্বাধীন রাজ্য ছিল। সিন্ধুর রাজধানী ছিল আলোর, অধিপতি ছিলেন অহিরল। অহিরসের পুত্র রায় সহসীকে পদচ্যুত করিয়া অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর চাচ্ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ কর্মচারী সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রাক্তন শূদ্র রাজ মহিষীকে বিবাহ করেন। শূদ্রানারী বিবাহের জন্য তিনি বহু প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রাজা চাচের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দাহির সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭০০ খ্রীঃ)।

রাজা চাচ্

দাহিরের রাজ্যসীমা সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে বহু আরব সিন্ধুদেশে বসবাস করিত। কোন কোন আরব দস্যুবৃত্তি করিত এবং প্রয়োজন হইলে আরবগণ-বেতনভোগী সৈন্যরূপে সিন্ধুর সেনা-বাহিনীতে যোগদান করিত। চাচ্‌নামার গ্রন্থকার বালাজুরী বলেন, দাহিরের সৈন্যবিভাগে কতিপয় বেতনভোগী আরব সৈন্যও ছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে কেহ কেহ প্রদেশপালও ছিলেন। রাজা চাচের অধীনে আমীর আলীউদ্দৌল্লা নামক একজন আরব শিক্ষা দুর্গের শাসনকর্তা ছিলেন। দাহিরের অধীনে ওয়াজিল নামক একজন উচ্চপদস্থ আরব কর্মচারী ছিলেন। দাহিরের রাজ্যে বহু বৌদ্ধ বাস করিত। তাঁহার শাসনকর্তাদের মধ্যে মোকা নামক একজন রাজার নাম উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, দাহিরের নৌবল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

সিন্ধুরাজ দাহির

হেজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে ছিলেন খলিফা আল ওয়ালিদের শৈশবের গৃহশিক্ষক। হেজ্জাজ ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষস্বভাব, নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তিনি তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রের বহু দুঃসাহসিক কর্মের সহায়ক ছিলেন। হেজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী এবং 'ইসলামের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি' ছিল তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁহার শাসনকাল আরম্ভের এক বৎসরের মধ্যেই অবিজিত ভারতবর্ষ বিজয়ের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

সিন্ধু আক্রমণের অব্যবহিত কারণঃ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে ছিল মুসলমানদের পুণ্যতীর্থ বাবা আদমের পর্বত শিখর (Adam's Peak)। সিংহলী মুসলমানগণ বিশ্বাস করে যে, 'শয়তানের পরামর্শে স্বর্গের নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন করিয়া পৃথিবীর প্রথম মানব আদম সিংহলের একটি পর্বত শৃঙ্গে পতিত হন।' বাবা আদম ছিলেন মুসলমানদের প্রথম পয়গম্বর বা আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। 'সিংহল ছিল আদমের পদস্পর্শে মুসলমানের পুণ্যতীর্থ। প্রতি বৎসর বহু আরব নরনারী সিংহলে তীর্থ দর্শনে আগমন করিত, সিংহলে বহু মুসলমান

বণিকও বসবাস করিত। ৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাহাজে কয়েকজন মুসলিম তীর্থযাত্রিণী এবং বণিকের বিধবা পরিবার সিংহল হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথে সিন্ধুরাজ্যের অদূরে দেবল বন্দরের নিকট জলদস্যু কর্তৃক সেই জাহাজ লুণ্ঠিত হয়; সেই জাহাজে হেজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কিছু উপহারসামগ্রীও ছিল। হেজ্জাজ

আরব জাহাজ লুণ্ঠন
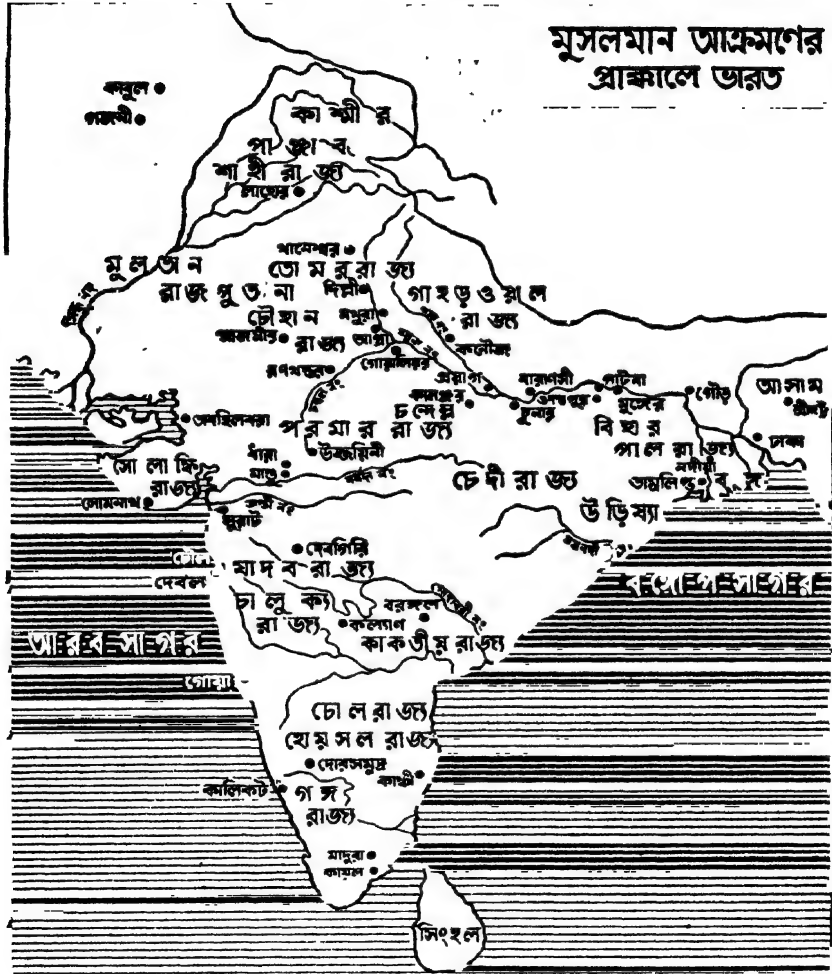
সিন্ধুরাজের নিকট আরব নারীদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। সিন্ধুরাজ দাহির ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ জলদস্যুগণ সিন্ধুরাজের অধীনে ছিল না; লুণ্ঠনকারী জলদস্যু যে আরব জলদস্যু ছিল না, তাহারই বা প্রমাণ কি?

হেজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। দাহিরের পুত্র জয়সিংহ প্রথম দুইবার জলযুদ্ধে আরবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বহু আরব জাহাজ সাগরজলে নিমজ্জিত হইল।

পর পর দুইবার পরাজয়ের গ্লানি খলিফা ও হেজ্জাজ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। খলিফা ছয় সহস্র সুদক্ষ সিরিয়ান সৈন্য, সমসংখ্যক উষ্ট্র-সৈন্য, তিন সহস্র রসদবাহী ব্যাক্‌ট্রিয়ান উষ্ট্র এবং দুই সহস্র তীরন্দাজ সৈন্যসহ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিমকে দেবল অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। মাত্র সৈন্যবলের উপর নির্ভর না করিয়া হেজ্জাজ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরব সেনাপতি স্থানীয় আরব বণিক ও বেতনভোগী আরব সৈনিক এবং দাহিরের অধীন বৌদ্ধ শাসনকর্তা ও অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ শাসনকর্তার নিকট হইতে পথ প্রদর্শন, খাদ্য-সম্ভার ও সৈন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করিলেন।

মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান

অন্যদিকে পর পর পরাজিত আরবদের প্রতি সিন্ধুরাজ দাহিরের মনে বোধ হয়, আরব শৌর্যের প্রতি স্বল্পবিস্তর তাচ্ছিল্য ভাব ও সিন্ধু সৈন্যের উপর অতি বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ধারণা করেন নাই যে, অচিরকাল মধ্যে আরবগণ জলপথে ও স্থলপথে বর্তমান থাটার চব্বিশ মাইল দূরে (রাজধানী হইতে থাটার দূরত্ব ১৫০ মাইল) দেবলে উপস্থিত হইবে। দেবলে দাহিরের মাত্র চারি সহস্র সৈন্য ছিল; দাহির দেবল রক্ষার জন্য কোন বিশেষ সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। দেবল-মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আরবগণ দেবলদুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত দুর্গবাসী বন্দী হইল। মুহম্মদ বিন কাসিম বন্দীদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আদেশ দিলেন। অধিকাংশ বন্দী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া মৃত্যুবরণ করিল। মুহম্মদ বিন কাসিম নূতন একটি মসজিদ নির্মাণ করিলেন। চারি সহস্র আরব সন্তান-অধ্যুষিত একটি উপনিবেশ দেবলে স্থাপিত হইল। দেবল হইতে অপর্যাপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্য ধনরত্ন খলিফার দরবারে প্রেরিত হইল। দেবলে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল।

দেবলের যুদ্ধ

মুহম্মদ বিন কাসিম দেবল হইতে নীরুন বা হায়দরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নীরুনের বৌদ্ধগণ মুসলিম সেনাপতির সম্মুখে নগরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, কোথায়ও বা খাদ্য সামগ্রী দ্বারা অভ্যর্থনা করিল। পথে কয়েকটি নগর বিনা বাধায় আরব সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিল। নীরুন জয় করিয়া তিনি শিবিস্থান বা সেহানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে বৌদ্ধ অধিবাসিগণ মুসলিমদের সঙ্গে নগরাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল। ফলে নগরাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন।

নীরুন-বিজয়

মুহম্মদ বিন কাসিম তাঁহার সাফল্যে উল্লসিত এবং রাজদ্রোহীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে উৎসাহিত হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর অনুসরণ করিয়া দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। পথে শক্তিশালী সামন্তরাজ মোকা আরব সেনাপতির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। অবশ্য প্রতিদানে মোকা সিন্ধুর তীরবর্তী আরব-বিজিত ভূখণ্ড লাভ করিলেন। মোকা আরবদের সঙ্গে যোগদানের পরে শিবিস্থানে ৪,০০০ দুর্ধর্ষ জাঠ মুহম্মদ বিন কাসিমের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। সামন্তরাজ মোকার ভ্রাতাও অতি সংকটময় মুহূর্তে সসৈন্যে আরবদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

সামন্তরাজ মোকার বিশ্বাসঘাতকতা

রায়োড়ের যুদ্ধ (৭১২ খ্রীঃ) : সিন্ধুরাজ দাহির সিন্ধুনদের পূর্বতীরে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বোধ হয়, ধারণা করিয়াছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে একটিমাত্র যুদ্ধে আরবদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন। সামন্তরাজ মোকার ব্যবস্থিত নৌযানের সাহায্যে মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অতিক্রম করিয়া সিন্ধুরাজ দাহিরের বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। চাচ্‌নামার বিবরণে উল্লেখ আছে, প্রথম দিনের যুদ্ধে দাহিরের পরাক্রমে আরবসৈন্য পরাজিত হইয়া গেল, দ্বিতীয় দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আরব সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা দাহির পলায়নপর আরব সৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করেন নাই। মুহম্মদ বিন কাসিম পলায়মান সৈন্যকে সুসংবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাজা দাহির তখন সৈন্যদলের পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তিপৃষ্ঠে দুর্গাভিমুখে চলিয়াছেন। অকস্মাৎ একটি তীর দাহিরের পৃষ্ঠস্থল বিদ্ধ করিল। সিন্ধু রাজার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সিন্ধুসৈন্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। যুবরাজ জয়সিংহ রাজধানী আলোর রক্ষার্থে ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। মুহম্মদ বিন কাসিম রায়োড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সদ্যবিধবা রাজমহিষী রাণীবাঈ বিন্দুমাত্র বিহ্বল না হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য সৈন্য পরিচালনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিজয়মত্ত আরব সৈন্যের গতি একাকিনী প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি দুর্গমধ্যে অন্তঃপুরিকাগণসহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন করিয়া নারীর সম্মান রক্ষা করিলেন। রায়োড় দুর্গে আরব সৈন্য প্রবেশ করিল ; দুর্গবাসী নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধের রক্তে দুর্গ রঞ্জিত হইল।

দাহিরের মৃত্যু

রায়োড় দুর্গ অধিকার করিয়া মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর রাজধানী আলোরের দিকে অগ্রসর হইলেন ; পথে ব্রাহ্মণাবাদে দাহিরের পুত্র জয়সিংহ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু দাহিরের মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা জয়সিংহ পরাজিত হইলেন।

দাহিরের দ্বিতীয়া মহিষী রাণী লাড়ী এবং দুই রাজকুমারী—পরিমল দেবী

এবং সূর্যদেবী—আরব হস্তে বন্দিনী হইলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই দাহিরের তৃতীয় পুত্রকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী আরব সৈন্য উত্তরে মুলতান (মূলস্থান) পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আরবদিগকে নগরের জলধারার উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছিল। আরবগণ উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া দিল এবং নগর অবরোধ করিল। দুর্গাধ্যক্ষ বাধ্য হইয়া শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। পুনরায় হত্যার উৎসব আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ মূলতানে এত স্বর্ণ লাভ করিল যে, তাহারা মূলতানের নূতন নাম দিয়াছিল 'স্বর্ণপুরী।'

মূলতান অধিকার

মূলতান বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন কাসিম স্বয়ং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উজ্জয়িনীর দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন। বোধ হয়, মুহম্মদ বিন কাসিম বর্তমান কাঙড়া অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং কনৌজরাজ যশোবর্মণ আরব অগ্রগতি প্রতিরোধ করেন এবং তাঁহাদের রাজ্যসীমা হইতে আরবদিগকে বিতাড়িত করেন; কিন্তু তাঁহারা আরবদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন নাই।

মুহম্মদ বিন কাসিমের পদচ্যুতি: সিন্ধুবিজয়ের ইতিহাসে মুহম্মদ বিন কাসিমের গৌরব অপেক্ষা সিন্ধুবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কই উজ্জ্বলতর। আরব কর্তৃপক্ষ জানিত যে, দাহিরের দুর্বলতা অপেক্ষা হেজ্জাজ বিন ইউসুফের কূটনীতি এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সেনাদলের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল দাহিরের পরাজয়ের মুখ্য কারণ। এই সংবাদ মুসলিম রাজধানীতে অজ্ঞাত ছিল না। মুহম্মদ বিন কাসিমেরও ভারতে আর প্রয়োজন ছিল না। বিজিত সিন্ধুবাসীর উপর অত্যাচারের কাহিনী খলিফার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই সময় মুহম্মদ বিন কাসিমের শ্বশুর কাফের রাজ্য বিজয়ী হেজ্জাজ বিহিস্ত্ বা স্বর্গলাভ করেন; পর বৎসর খলিফা ওয়ালিদ পরলোক গমন করেন। নূতন খলিফা সুলেমান ছিলেন হেজ্জাজ বিদ্বেষী। তিনি হেজ্জাজের জামাতা মুহম্মদ বিন কাসেমকে পদচ্যুত করিলেন এবং রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে প্রকাশ্য রাজপথে জঘন্য অপরাধের অভিযোগে সদ্য উৎপাটিত রক্তাক্ত গোচর্মে আবৃত করিয়া হত্যা করা হইল। চাচ্নামার লেখক বলিয়াছেন, নিহত রাজা দাহিরের দুই কন্যা পরিমল দেবী এবং সূর্যদেবীকে মুহম্মদ বিন কাসিম খলিফার নিকট স্বর্ণময় দেবমূর্তি এবং বহু মণিমুক্তা সমেত লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশরূপে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুব্ধা অপমানিতা রাজকন্যাদ্বয় খলিফার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মুহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক কলুষিতা, সুতরাং খলিফার অস্পৃশ্যা। এই অভিযোগে খলিফা মুহম্মদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মুহম্মদ বিন কাসিমকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন এবং সদ্য উৎপাটিত গোচর্মে আবৃত করিয়া নির্মমভাবে তাঁহাকে

মুহম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু

হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। মামুদের নৃশংস হত্যার পর দাহির-দুহিতার প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইলে তাহারা খলিফার নিকট স্বীকার করিল যে, পিতৃহত্যার জন্য তাহারা মুহম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে। বিক্ষুব্ধ খলিফা দাহির-কন্যাদ্বয়কে ধাবমান অশ্বপুচ্ছে রজ্জুবদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। আধুনিক আরব ঐতিহাসিক এই কাহিনী বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক।

সিন্ধুরাজ দাহিরের পরাজয়ের কারণঃ সিন্ধু ছিল মরুভূমি—জনবিরল; সিন্ধুর কৃষিজ সম্পদ ছিল স্বল্প, সিন্ধুবাসী ছিল দরিদ্র। বাণিজ্যের উপরই সিন্ধুর সমৃদ্ধি নির্ভর করিত। কিন্তু আরব জলদস্যুর আক্রমণে সর্বদা সিন্ধুবাসী বিব্রত থাকিত। ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য সিন্ধুদেশ ছিল জল ও স্থল উভয় পথেই উন্মুক্ত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। দাহিরের নৌবল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল কিনা সন্দেহ। সিন্ধুর অধিবাসী ছিল ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, জাঠ, বৌদ্ধ এবং স্বল্পসংখ্যক জৈন। শূদ্র সমাজ ছিল অবজ্ঞাত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। জাতিভেদহীন বৌদ্ধগণ জাতিভেদ-বিহীন আরব মুসলিমদের প্রতি সহজ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। অন্যদিকে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ অহিংসবাদী ছিল; সুতরাং প্রত্যক্ষ-ভাবে বৌদ্ধগণ হিংসাত্মক যুদ্ধে আরবদের বিপক্ষে যোগ দেয় নাই। বৌদ্ধ শাসনকর্তাগণ বা সামন্তরাজগণ সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ চাচ্‌বংশের প্রতি শূদ্রগণ অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ, রাজা চাচ্ শূদ্ররাজকে পদচ্যুত করিয়া সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার করেন। সুতরাং শূদ্রগণ দাহিরের প্রতি বিরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণও দাহিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া-ছিল। হিন্দু সামন্ত রাজা মোকা নৌযান দ্বারা সাহায্য করিয়া মুসলিমদিগকে সিন্ধু অতিক্রম করিবার সুযোগ দিয়াছিল এবং সৈন্য ও খাদ্য দ্বারা সহায়তা করিয়াছিল। নীরুনের যুদ্ধের পর প্রায় চারি সহস্র জাঠ বিদেশী, বিধর্মী আরবদিগের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। দাহিরের বেতনভোগী আরব, মুসলিম সৈন্যগণ স্বধর্মী আরব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দাহিরের পক্ষে যোগদান করে নাই।

সিন্ধুর ভৌগোলিক অসুবিধা

বৌদ্ধ ও শূদ্রের অসন্তোষ

রাজা দাহির স্বয়ং সু-যোদ্ধা হইলেও অত্যন্ত অদূরদর্শী ছিলেন। তিনি দেবল রক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই এবং সমুদ্রপথে আরব-দিগকে বাধা দেন নাই। তিনি বৌদ্ধ শাসনকর্তা ও হিন্দু সামন্তদের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ সম্বন্ধে সংবাদ রাখেন নাই; বোধ হয়, তাঁহার গুপ্তচর বিভাগ অকর্মণ্য ছিল। রাওড়ের যুদ্ধে প্রথম দিনের জয়ের পরে পলায়মান আরবদের পশ্চাদনুসরণ না করিয়া তিনি

দাহিরের অপরিণামদর্শিতা

অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের পরে সৈন্যের পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত না করার ফলে তিনি অকস্মাৎ তীরবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করেন।

আরবদের যোগ্যতা

অন্যদিকে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অধিক, অশ্ববাহিনী ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্র, সৈন্য পরিচালনা ছিল সুনিপুণ, রসদ, যোগাযোগ ও সরবরাহ-ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল। আরব সৈন্যের শৌর্যের সঙ্গে কৌশলের সমাবেশ হইয়াছিল। দাহির রণাঙ্গনে একমাত্র স্বীয় শৌর্যের উপর নির্ভর করিতেন।

রাজা দাহির ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তিনি আরব সৈন্যদের রণকৌশল এবং তীরন্দাজদিগের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। দাহির রণক্ষেত্রে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আরবদিগকে পথে এবং রণাঙ্গনের বাহিরে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ধর্মের নামে বিধর্মীর বিরুদ্ধে, স্বদেশের নামে বিদেশীর বিরুদ্ধে দেশবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাবর্গকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

সিন্ধুবিজয়ের ইতিহাসে আরব জাতির শৌর্য গরিমা উজ্জ্বল। সিন্ধুবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা অত্যন্ত অপমানজনক।

ভারতে আরব অগ্রগতিঃ মুহম্মদ বিন কাসিমের পর সুদক্ষ আরব সেনাপতি জুনিয়াদ সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন। জুনিয়াদ জয়সিংহকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর প্রভৃতি স্থান পুনরায় অধিকার করেন এং হিন্দু রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। তারপর তিনি মুহম্মদ বিন কাসিমের আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম ভারতে অভিযান করেন। বাস্তবিক পক্ষে আরবসৈন্য পূর্বে মালব, দক্ষিণে ভীরুকচ্ছ পর্যন্ত রাজপুতনার বিশাল ভূখণ্ড জয় করিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনা ৭২৪ হইতে ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসরের মধ্যেই আরবে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইল। ওম্মিয়া খলিফা বংশ রাজ্যচ্যুত হইয়া গেল এবং আব্বাসিয়া খলিফা বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল (৭৪৮ খ্রীঃ)।

অন্যদিকে পশ্চিম ভারতে ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অবন্তীর শক্তিশালী প্রতীহাররাজ প্রথম নাগভট্ট এবং দক্ষিণে গুজরাটের চালুক্যরাজ পুলকেশী, উত্তরে কাশ্মীরের

সিন্ধুদেশে আরব শাসনের অবসান

কর্কট রাজগণ নাভাসরীর যুদ্ধে আরবদের অগ্রগতি প্রতিহত করিলেন এবং আরব বাহিনীকে রাজ্য সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জুনিয়াদের পরবর্তী আরব শাসনকর্তা তামিনের সময় মুলতান ব্যতীত ভারতে আরব বিজিত সমগ্র ভূখণ্ড আরবদের হস্তচ্যুত হইল। আরব ঐতিহাসিক বালাজুরী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, মুসলিমদের কবর দেওয়ার মতন স্থানও ভারতে ছিল না।

সিন্ধুবিজয়ের ফলঃ এক শত বৎসরের চেষ্টার পর আরবগণ ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত সিন্ধু অঞ্চল জয় করিয়াছিল, কিন্তু সেই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী

হয় নাই। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ লেইনপুল বলিয়াছেন, "আরব কর্তৃক সিন্ধু-বিজয় আরবজাতির ইতিহাসে নিষ্ফল বিজয়; ভারতের ইতিহাসে একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র।" লেইনপুলের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ সিন্ধুবিজয় বাস্তবিক পক্ষে আরবজাতির ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। ধর্মের দিক দিয়া পৌত্তলিক ভারতবর্ষ বিজয়, পৌত্তলিকের মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস, মসজিদ নির্মাণ, বিধর্মীর উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া আরবগণ ঐস্লামিক স্বর্গলাভের পথ সুগম করিয়াছিল। অর্থের দিক দিয়া আরবগণ সিন্ধু বিজয় করিয়া মরুবাসীদের সহজাত লুণ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল, তাহারা ভারতে অপরিমিত অর্থ সম্পদ লাভ করিয়াছিল। ভবিষ্যৎ মুসলিম জাতির মনে ভারতের ধনরত্নের প্রতি সহজ আকর্ষণ জাগ্রত করিয়াছিল। সামরিক সাফল্যের দিক দিয়া ভারত বিজয় আরবজাতির পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। মুহম্মদের মৃত্যুর পর আরবগণ দুই বৎসরের মধ্যে সিরিয়া (৬৩৩ খ্রীঃ), পাঁচ বৎসরের মধ্যে মিশর (৬৩৭ খ্রীঃ), পনর বৎসরের মধ্যে পারস্য (৬৪৬ খ্রীঃ) জয় করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করিতে ইসলাম প্রবর্তনের পর একশত বৎসরের অধিককাল চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল (৬১০-৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। সুতরাং সিন্ধুবিজয় আরবজাতির পক্ষে সামরিক গৌরবের বস্তু ছিল। অবশ্য ভারতের ইতিহাসের দিক দিয়া ভারতীয় কোন সমসাময়িক কাব্যে, সাহিত্যে বা ইতিহাসে আরবজাতির এই বিজয়, তথা মুহম্মদ বিন কাসিমের শৌর্যবীর্যের কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের মতন ভারতবাসী আরববিজয়কে একটি দুঃস্বপ্নরূপেই বিবেচনা করিয়াছিল। সিন্ধু বিজয়ের পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই আরবজাতির অগ্রগতি প্রতিহত হইল এবং মূলতান ব্যতীত ভারতের সমস্ত ক্ষেত্র হইতে তাহারা বিতাড়িত হইল। আরবগণ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করে নাই; সুতরাং লেইনপুলের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে।

লেইনপুলের মত আলোচনা

সিন্ধুবিজয়ের ফল সাধারণতঃ দুই ভাগে উল্লেখ করা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ফলের মধ্যে ছিল—সিন্ধুদেশে চাচ্ বংশ ও হিন্দু রাজত্বের অবসান। সিন্ধুবিজয় দ্বারা আরবদের বহু বাঞ্ছিত সামরিক যশোলাভ, মরুবাসীদের লুণ্ঠনস্পৃহাচরিতার্থতা, দুর্ধর্ষ হেজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল। অন্যদিকে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার, জিজিয়া কর স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ, ভারতে আরব উপনিবেশ স্থাপন এবং আরব-ভারতীয় মিশ্র বংশ বৃদ্ধি, সিন্ধুদেশে আরবী ভাষা ও লিপি প্রচলন প্রভৃতি সিন্ধুবিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল। সিন্ধুদেশের সঙ্গে আরবদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের ও অর্থ নৈতিক আদান-প্রদানের ফলে বহু ভারতীয় শব্দ আরবে প্রচলিত হইল।* সমসাময়িক

প্রত্যক্ষ ফল

* যথা, নীল—নীলজ, নারিকেল—নারগেল, আমলকী—অম্লাবজ, মধুমতী—দহনা, শর্করা—শকর, উজ্জয়িনী—উজ্জয়িনী, মুক্ত—মাস্ত।

আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসে, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের বহু উপাদান রহিয়াছে। আরববিজয়ের পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। বাগদাদ, কান্দাহার, মুলতান, অনহিলহরা, আলোয়ার, ভৃগুকচ্ছ এবং দেবলের পথে আরব ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। সিন্ধী-বণিকগণ আরবের প্রায় প্রত্যেক শহরেরই বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল; ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমেই ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে, আরব-জাতি পরিচয় লাভ করিল; সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী আরবে জনপ্রিয়; অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বহু ভারতীয় গ্রন্থ বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ, অঙ্ক, চিকিৎসা ইত্যাদি আরবী ভাষায় অনূদিত হইল। ভারতীয় গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে স্পেন হইতে কাবুল পর্যন্ত সমগ্র আরব সাম্রাজ্যে মুসলিম সমাজে পরিচিত হইল। ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত-প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত দামাস্কাসে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রে শূন্য আবিষ্কার ও দশমিক সংখ্যা ব্যবহার আরবজাতির মাধ্যমে ইওরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। আব্বাসীয় খলিফাদের উৎসাহে বাগদাদে একটি ভারতীয় চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। সেখানে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রণীত চরক ও সুশ্রুত সংহিতা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কাহিনীগুলি আরবী অনুবাদের মধ্য দিয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডে জনপ্রিয় হইয়াছিল। ভারতীয়, আরবীয় ও ইরাণীয় চিন্তাধারার সংযোগেই নবম শতাব্দী হইতে সুফী ধর্ম ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

পরোক্ষ ফল

গজনী রাজ্য: আরব রাজত্ব ভারতে বাস্তবিক পক্ষে ৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গেল, অবশিষ্ট রহিল কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের আশ্রয় স্থল ছিল একমাত্র মনসুরা ও মুলতান। ৭৪৩ হইতে ৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আরব শাসক জুনিয়াদের পর হইতে গজনী সুলতান মামুদ পর্যন্ত ১৫৪ বৎসর ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল বহিঃশত্রুর উল্লেখযোগ্য আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় নাই। দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুর্জর প্রতীহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটশক্তি এই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল (কপিশা) অঞ্চলে একটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ এবং জাবুলে (কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বাংশে) হিন্দুশাহীয়া নামে অভিহিত ভারতীয় কুষাণ রাজবংশের একটি শাখা রাজত্ব করিত। এই রাজন্যবর্গের বিক্রমের সম্মুখে আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। এই সকল রাজগোষ্ঠী ছিল প্রাচীন যুগের অন্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের সদাজাগ্রত দ্বারপাল।

৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আলপ্তগিন নামে জনৈক সৈনিক গজনীতে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন খোরাসান ও বোখারার সামানী রাজবংশের সুলতান আহম্মদের ক্রীতদাস। রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যে আলপ্তগিন কাবুলের এক অংশ জয় করেন।

আলপ্তগিন

৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলপ্তঘিন সবুক্তঘিন নামে একজন ক্রীতদাস ক্রয় করেন। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আলপ্তঘিনের মৃত্যু হইল।

সামান্য গৃহযুদ্ধের পর ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তঘিন গজনী রাজ্যের আমীর পদ লাভ করেন। এই সময়ে লামঘান হইতে কাঙড়া পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন উদ্‌ভাণ্ডপুরের হিন্দুশাহীয়া বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি জয়পাল। হিন্দুশাহীয়া বংশ ছিল রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা কল্‌হণ-বর্ণিত ওয়াহিন্দ বা উদ্‌ভাণ্ডপুরের বংশানুক্রমিক অধিপতি।

সবুক্তঘিন

জয়পালের রাজ্য গজনীর অদূরবর্তী লামঘান হইতে পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদী এবং কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মুলতান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জয়পাল সীমান্ত ভ্রমণধারী বণিকদের নিকট হইতে সংবাদ শুনিলেন যে, সবুক্তঘিন 'বিধর্মীর দেশকে ইসলামদেশে পরিবর্তিত করিবার জন্য' সসৈন্যে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে বহির্গত হইয়াছেন। এই সংবাদ অবিশ্বাস্য ছিল না। কারণ, এই পথে মুসলিমগণ বহুবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। সুতরাং রাজা জয়পাল সবুক্তঘিনকে ভারতে প্রবেশের অবসর প্রদান না করিয়া স্বয়ং গজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। পথে লামঘান ও গজনীর মধ্যবর্তী সুজাক নামক স্থানে (৯৮৮ খ্রীঃ) দুই পক্ষের সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জয়পালের সৈন্য দুর্ভাগ্যক্রমে জয়ের মুহূর্তে পার্বত্য ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সুযোগে সবুক্তঘিন জয়পালকে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। সন্ধির শর্ত হইল—জয়পাল গজনীর আমীরের হস্তে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল, পঞ্চাশটি হস্তী এবং আড়াই লক্ষ স্বর্ণখণ্ড প্রদান করিবেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়পাল এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। কারণ, জয়পাল যুদ্ধে পরাজিত হন নাই এবং দৈবদুর্বিপাকের জন্য তিনি দায়ী নন। ফলে সবুক্তঘিন জয়পালের রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিলেন এবং লামঘান লুণ্ঠন করিলেন। লুণ্ঠনের প্রতিশোধকল্পে জয়পাল ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত গজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; কিন্তু তিনি পরাভূত হইলেন। ফলে লামঘান হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত জয়পালের হস্তচ্যুত হইল।

জয়পাল

গজনীর সুলতান মামুদ : ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তঘিনের মৃত্যুর সময় মামুদ কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান। ইসলামে এমন কোন বাধ্যতামূলক নীতি নাই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সিংহাসন লাভ করিবে। পিতা ইচ্ছা করিলে ক্ষেত্রবিশেষে যোগ্যতর পুত্র, অথবা প্রিয় পুত্রকে সিংহাসন দান করিতেন অথবা পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিতেন। ফলে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব মুসলিম রাজ্যকে অনেক ক্ষেত্রে রক্তরঞ্জিত

করিয়াছে। সবুক্তগিনের দ্বিতীয় পুত্র সাতাশ বৎসর বয়স্ক মামুদ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইলকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গজনীর সিংহাসন আরোহণ করেন। এই মামুদই ইতিহাস বিশ্রুত মামুদ গজনী।

মামুদ গজনীর ভারত অভিযান : মামুদ প্রায় প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই অভিযানের মধ্যে সতরটি অভিযান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মামুদের ভারত অভিযানের চারিটি প্রধান কারণ ছিল :—(১) মামুদ জয়পালের সঙ্গে শত্রুতা পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন, (২) ভারতের অপরিমিত ধনরত্ন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, (৩) বিধর্মীর মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস তাঁহার জীবনের বিলাস ছিল, (৪) ব্যক্তিগত ভাবে সামরিক যশ-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। ইসলামের বিজয় ঘোষণা ছিল মামুদের নিকট পরোক্ষ আবেদন। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মামুদের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণের তিন বৎসর পর ভারত সীমান্তে পিতার অনুকরণে কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন।

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গজনী পেশোয়ারের যুদ্ধে জয়পালকে পরাজিত করেন। জয়পাল তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং কয়েকজন নিকট আত্মীয়সহ বন্দী হইলেন। জয়পালের কণ্ঠ বিলম্বিত মণিমুক্তাখচিত মালা তাঁহার কণ্ঠ হইতে অপসারিত হইল। এই মূল্য আরব ইতিহাসকারদের মতে ছিল দুই লক্ষ দিনার (১ দিনার = ১ টাকা ৪ আনা)। জয়পাল বহু অর্থের বিনিময়ে স্বীয় মুক্তি ক্রয় করিলেন। মুসলিম সৈন্য জয়পালের রাজধানী উদ্‌ভাণ্ডপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিল। জয়পাল তাঁহার পৌত্র সুখপালকে শর্ত পালনের প্রতিভূ-স্বরূপ গজনী সুলতানের শিবিরে গচ্ছিত রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মামুদ গজনী ও জয়পাল

'ম্লেচ্ছের হস্তে অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়'—বিবেচনা করিয়া জয়পাল কতিপয় ক্ষুব্ধ আত্মীয় সহ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আনন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভারতে আশাতীত অর্থলাভে উৎসাহিত হইয়া গজনীরাজ ও তাঁহার লুণ্ঠন লোভী সৈন্যগণ 'স্বর্ণপুরী মুলতানের' দিকে অভিযান করিলেন। এই সময়ে মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন কার্মেথিয়ান শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত দায়ুদ। রাজনৈতিক কারণে মামুদ গজনী দায়ুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুখপালকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

অবশ্য এই সময়ে সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মুসলিম নাম হইয়াছিল নওয়াশাহ বা নৌশাহ। মামুদের প্রত্যাবর্তনের পরে নওয়াশাহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া সুখপাল হইলেন এবং পরাজিত দায়ুদের সহযোগে মামুদের

বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মামুদ ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুখপালকে পরাজিত করিয়া মুলতান প্রদেশকে গজনী সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ফলে মামুদ গজনীর অধিকার আনন্দপালের রাজ্যসীমা স্পর্শ করিল—সুতরাং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ভারত হইতে আনীত হিন্দু বন্দীদের জন্য গজনীর উপকণ্ঠে একটী উপনিবেশ স্থাপিত হইল। তাহারা এখন নামের শেষে মুলতান শব্দটি ব্যবহার করে এবং মূলতানী বলিয়া গর্ব করে। তাহারা বর্তমানে কাবুল ও কান্দাহারে বাস করে।

১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গজনী ও আনন্দপালের সঙ্গে যুদ্ধে দ্বাদশ জন পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজা যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দপাল যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। মামুদ সৈন্যেদলের পশ্চাদনুসরণ করিয়া কাঙড়ার অদূরে নগরকোটের দুর্গ জয় করিলেন। মামুদের পারিষদ ও জীবনী লেখক শ্লেষ-রচয়িতা উট্‌বী লিখিয়াছিলেন, "নগরকোটের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও অন্যান্য সামগ্রী গজনীতে বহন কবিয়া লইয়া যাওয়ার মত যথেষ্ট-সংখ্যক উষ্ট্র ভারতে সংগ্রহ করা মামুদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

আনন্দ পাল

আনন্দপাল শত বিপদেও নিরুৎসাহ ও ধৈর্যচ্যুত হন নাই। আনন্দপাল লবণ পর্বতের উত্তরে নন্দনাহ নামক দুর্গম গিরিশিখরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া আমরণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। আনন্দপালের মৃত্যুর পর ত্রিলোচনপাল রাজ্যলাভ করেন।

১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ নন্দনাহ আক্রমণ করেন। ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে ত্রিলোচন পিতৃপিতামহের রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পঞ্জাবের পূর্বপ্রান্তে শিবালকে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন এবং বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লরাজ শক্তিশালী বিদ্যাধরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোচনপাল রামগঙ্গার যুদ্ধে পুনরায় মামুদের হস্তে পরাজিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজ্যের অভ্যন্তরে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ত্রিলোচনপাল ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জনৈক অনুচর কর্তৃক নিহত হইলেন। চারিবৎসর পরে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ভীমপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুশাহীয়া তথা কুষাণ বংশের অবসান হয়।

ত্রিলোচন পাল

হিন্দুশাহীয়া বংশের কৃতিত্ব : হিন্দুশাহীয়া বংশ ছিল প্রাচীন কুষাণ বংশের সন্তান। তাহারা প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত কাবুলের নিকটবর্তী লাঘমান হইতে কাশ্মীর সামান্ত, লাহোর হইতে কনৌজ পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়াছিল। স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এই বংশের প্রত্যেকটি সন্তান আমরণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জয়পাল আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। সুখপাল বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগলাভ মাত্রই তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ

করেন এবং হিন্দুশাহীয়া বংশের চিরশত্রু গজনীরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। আনন্দপাল পরাজয়ের পরে নূতন করিয়া দুর্গম গিরিশৃঙ্গে নন্দনাহ্ পর্বতে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিলোচনপাল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি পূর্ব পঞ্জাবের শিবালক পর্বতে তৃতীয়-হিন্দুশাহী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুশাহীয়া বংশ ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের দ্বারপাল।

কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত **কলহ্লণ** বলিয়াছিলেন – হিন্দুশাহী বংশ দান, ধর্ম, ত্যাগ, শাস্ত্রালোচনা, জ্ঞানানুশীলন এবং স্বাধীনতাস্পৃহারজন্য চিরস্মরণীয়।

মামুদ গজনীর অন্যান্য অভিযান: ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর সীমান্ত হইতে ভারতের পথে মামুদ গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভাতিন্দা আক্রমণ করেন। ভাতিন্দার রাজা বিজয় রায় পরাজিত হইলেন, বহু সম্পদ লুণ্ঠিত হইল, রাজ্যের সমস্ত বিধর্মী নিহত হইল।

নারায়ণপুর (বর্তমান আলোয়ার) ছিল তখন মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। মামুদ নারায়ণপুর অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়া ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্থানেশ্বর ছিল হিন্দু তীর্থ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। স্থানেশ্বরের বাস্তুদেবতা ছিলেন চক্রস্বামী; মামুদ স্থানেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাকে প্রতিরোধ করার মত লোক স্থানেশ্বরে নাই; সুতরাং স্থানেশ্বর লুণ্ঠিত হইল; চন্দ্রস্বামীর মন্দির ধ্বংস হইল; চন্দ্রস্বামীর বিগ্রহ গজনীতে প্রেরিত হইল। গজনীর প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে ধর্মবিজয়ের 'চিহ্নস্বরূপ' চন্দ্রস্বামীর বিগ্রহ রাজ উদ্যানে রক্ষিত হইল।

আলোয়ার ও থানেশ্বর

১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ দুইবার কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দুইবারই ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মামুদের অভিযান গঙ্গা-যমুনার উর্বর ও সম্পদ সম্পন্ন উপত্যকার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরার দিকে অবসর হইলেন। গজনীর আখ্যান-কার উট্‌বীর ভাষায় – "মথুরা ছিল সহস্র মন্দির-শোভিত তীর্থনগর। এইনগরের শ্রেষ্ঠমন্দিরটি নির্মাণ করিতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিপুণ শিল্পীর দুই শত বৎসর এবং এক লক্ষ দিনারের প্রয়োজন।" এই মন্দিরের বিগ্রহ ছিল পঞ্চহস্ত পরিমিত স্বর্ণনির্মিত অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। মথুরার প্রত্যেক মন্দিরেই এক বা একাধিক বিগ্রহ ছিল। মথুরার স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, হীরক, বৈদুর্যমণি, নীলকান্তমণি খচিত বিগ্রহগুলি মুসলিমদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে যুগ যুগ সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার ছিল। মামুদ মথুরা নগরের প্রত্যেকটি মন্দির ধ্বংস করেন, কারণ প্রত্যেক মন্দিরেই লুণ্ঠনের উপযোগী বহু সামগ্রী সঞ্চিত ছিল। মথুরার পার্শ্ববর্তী

মথুরা বৃন্দাবন

সভার প্রথম দিবসে সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তে এক বিরাট শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল। বিচ্ছুরিতরত্নপ্রভ আস্তরণ সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ঐরাবত, সম্মুখে তথাগত ভগবান বুদ্ধের সুবর্ণমূর্তি, পশ্চাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে রাজপরিচ্ছদ পরিহিত চামরহস্তে উপবিষ্ট হর্ষবর্ধন; বামদিকে ব্রহ্মার বেশে ভূষিত মুকুট-শোভিত কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মণ। সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিতেছিল পঞ্চশত সুসজ্জিত রণহস্তীর শোভাযাত্রা, তাহার পশ্চাতে সুদর্শন সুসজ্জিত বাদ্যকর-বাহিনী। শোভাযাত্রা নগরের প্রান্তে নব নির্মিত শতহস্ত পরিমিত উচ্চ মন্দির ও বেদীর সম্মুখে সমাপ্ত হইল। বৌদ্ধগণ সমবেতভাবে ভগবান তথাগত বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিল।

অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ধর্মসভার অধিবেশন সমাপ্ত হইলে মহারাজ হর্ষ ঘোষণা করিলেন, "চৈনিক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম এবং মহাযান মতের মহত্ব নিরঙ্কুশ-ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।" সভায় হর্ষবর্ধন তাঁহাকে 'ধর্মগুরু' উপাধি প্রদান করিলেন; মহাযানীগণ আখ্যা দিল 'মহাযানদেব'; হীনযানীগণ আখ্যা দিল 'মোক্ষদেব'।

বৌদ্ধধর্ম ও মহাযান মতের প্রশংসায় বিক্ষুব্ধ হইয়া বেদাচারী ও হীনযানীগণ এবং জৈনগণ মহারাজ হর্ষের প্রাণ বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হীন প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।

এই সভা সমাপনের একবিংশতি দিবস পরে ছিল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক মহামোক্ষমেলার অধিবেশনের নির্ধারিত দিবস। সম্রাটের অনুরোধে চৈনিক ভিক্ষু মহামোক্ষমেলার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের পশ্চিম দিকে এক বিরাট সমতল ক্ষেত্র দানক্ষেত্রের জন্য নির্বাচন করা হইল। পুরাকালে বহু পুণ্যার্থী প্রয়াগের তীর্থক্ষেত্রে দান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই দানক্ষেত্রে দান গ্রহণের জন্য বহু বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, আজীবিক, আর্ত উপস্থিত হইয়াছিল। এই দানক্ষেত্রের নাম ছিল 'মহামোক্ষক্ষেত্র'।

হর্ষবর্ধন দানক্ষেত্রে দানের প্রথম দিবসে বুদ্ধমূর্তি, দ্বিতীয় দিবসে সূর্যমূর্তি, তৃতীয় দিবসে মহেশ্বর মূর্তি স্থাপন করিলেন। চতুর্থ দিবসে দান আরম্ভ হইল।

মহামোক্ষ মেলা

দানের প্রথম দিবসে দশ সহস্র ভিক্ষুককে একশত দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেককে একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি মুক্তা, একখানি কার্পাস বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য দান করা হইল। তারপর পঞ্চম হইতে পঞ্চবিংশতি দিবস পর্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে, ষড়বিংশ হইতে পঞ্চত্রিংশ দিবস পর্যন্ত বিদেশাগত ভিক্ষুদিগকে, সর্বশেষ একমাস অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইল। সর্বস্ব দানের পর মহারাজ স্বীয় পরিধেয় পর্যন্ত প্রার্থীকে দান করিলেন। তখন ভগ্নী রাজ্যশ্রী কর্তৃক প্রদত্ত একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজ শ্রীহর্ষ মহামোক্ষক্ষেত্র হইতে নির্গত

হইলেন। অশোক জীবনে তিনবার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন; হর্ষবর্ধন জীবনে চারি বার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধন উৎসব শেষ হইলে আরও দশ দিন প্রয়াগে অবস্থান করিয়া হিউয়েন সাঙকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করিলেন এবং অতিথিকে বহু ধন-রত্ন অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। কিন্তু চৈনিক ভিক্ষু সসম্মানে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ভিক্ষু, রাজ-ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য। তিনি পঞ্চনদের পথে চীনের দিকে অগ্রসর হইলেন। উদ্দেশ্য প্রারম্ভ জীবনের প্রথম ও পরম বন্ধু তুরফানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। সম্রাট স্বয়ং সানুচর কয়েক ক্রোশ পথ অতিথির সঙ্গে অতিক্রম করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত বিদেশী অতিথিকে বিদায় দিতেই হইল। সেই চিরবিদায়ের করুণ দৃশ্যের অপরূপ বর্ননা হিউয়েন সাঙ অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

হিউয়েন সাঙ-এর সঙ্গে বহু গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং বহু দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ছিল। সেই সমস্ত জিনিস বহনের জন্য সম্রাট একটি প্রকাণ্ড হস্তী, পাথেয় স্বরূপ তিন সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, চারিজন 'মহাতার' বা পথপ্রদর্শক দিলেন। এই মহাতারদের সঙ্গে রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ডের উপরে লিখিত মোহরাঙ্কিত পত্র ছিল। সেই পত্রে উল্লিখিত ছিল, "বিভিন্ন নরপতিদের নিকট অনুরোধ—তাঁহারা যেন এই বিদেশী অতিথির নিরাপত্তা ও যানবাহনের ব্যবস্থা করেন।" সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই।

হিউয়েন সাঙ-এর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

পথে কাশ্মীররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হিউয়েন সাঙ কপিশা বা গান্ধারের পথে হিন্দুকুশের পথে অগ্রসর হইলেন। কপিশার রাজা চৈনিক অতিথির সম্মানে সার্ধদ্বিমাসব্যাপী মহামোক্ষদানের উৎসব অনুষ্ঠান করেন।

চৈনিক পরিব্রাজকের এই ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় মনের সন্ধান পাওয়া যায়—বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে ভারত ও চীনের মধ্যে একটি চরম ঐক্যবোধ ছিল; তীর্থক্ষেত্রের মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় ঐক্যসূত্র ছিল; ভারতবাসী দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিত; ভারতবাসীর আতিথেয়েতা ছিল নিঃস্বার্থ। সুবিশাল ভারতব্যাপী যাতায়াত-ব্যবস্থা ছিল নির্বিঘ্ন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিচয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ-এর সপ্তম শতাব্দীর এই বিবরণ **ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়** রচনার অমূল্য উপাদান।

ভারতবাসীর অতিথি-প্রীতি

দীর্ঘ ষোল বৎসর বিদেশে অবস্থানের পর হিউয়েন সাঙ ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার পুস্তক 'ৎ-তাঙ-সি-সি-কি' তে তিনি ১৩৮টি

দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১১০টি দেশ হিউয়েন সাঙ স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদেশিক অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে চৈনিক সম্রাট তাই-সুঙ্ যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু করুণাঘন বুদ্ধের মৈত্রীবাণী উদ্বোধিত চৈনিক পরিব্রাজক আমৃত্যু মঠের কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন।

সাধারাণতঃ মানুষের মনে প্রশ্নজিজ্ঞাসা উদয় হয়—কবে—কেন চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী ও যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল? ইহার কারণ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর হইতে মধ্য এশিয়ার তুর্ক-মোঙ্গল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতিগুলি উল্কার বেগে সমগ্র মধ্য এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। চীনের রাজধানী পিকিঙ হইতে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো, উত্তরে গোবিমরু অঞ্চল হইতে তিব্বতের মালভূমি পর্যন্ত সমগ্র দেশে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধ্বংস ও মৃত্যু তুর্ক-মোঙ্গল জাতির প্রতি পদক্ষেপের সহিত অগ্রসর হইয়াছিল। বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবজীবনের যাহা কিছু সুন্দর—সবই যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চারি শত বৎসর কাল ছিল এশিয়ার ইতিহাসে একটা দুঃস্বপ্নের কৃষ্ণ যবনিকা। মানুষের যাতায়াতের পথ ছিল রুদ্ধ। তার উপর এই সমস্ত জাতিগুলি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাহারা অ-মুসলিমদের ধর্ম, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব লইয়া এশিয়ার বক্ষে দুর্বহ গুরুভার স্বরূপ হইয়া রহিল। ভারত হইতে চীনে গমনাগমনের প্রাচীন স্থল-পথগুলি রুদ্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি এবং চীনে 'তাও'বাদী ও বৌদ্ধমতবাদীদের সংঘর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলগুলি আরবজাতি কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ভারত এবং চীনের সমুদ্রপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারত ও চীনের সংযোগ সহজেই নষ্ট হইয়া গেল।

চীন-ভারত বন্ধন ছিন্ন

হর্ষবর্ধনের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ মহারাজ হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। ভ্রাতার হত্যা, ভগ্নীর দুর্বিপাক, হূন জাতির আক্রমণ, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। মাত্র পনর বৎসর বয়সে ভ্রাতার সঙ্গে তিনি দুর্ধর্ষ হূনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের মধ্যে হর্ষবর্ধন জীবনে একমাত্র চালুক্যরাজ পুলকেশী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন, সেইজন্যই দাক্ষিণাত্যেও তিনি শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য স্বীয় কন্যাকে বলভীরাজ ধ্রুবসেনের সঙ্গে বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাব, পূর্বে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুবিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেও,

প্রজার কল্যাণে রাজ্য ও রাজার কল্যাণ—এই নীতি হর্ষ আজীবন অনুসরণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন অপহৃতা ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য বিন্ধ্যারণ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমস্ত উন্মাদনা ও শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃশ্রদ্ধা, ভগ্নীপ্রীতি, বন্ধুবৎসলতা, ধর্মপ্রবণতা, উদারতা, দানশীলতা, গুণগ্রাহীতা, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন; ভারত ও চীনের ধর্মীয় ও আত্মিক মিলনের সূত্র তিনিই সুদৃঢ় করেন! পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম-বিচার সভা আনুষ্ঠানিকভাবে হর্ষবর্ধনই প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে ধর্ম প্রচার, ধর্মালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হর্ষবর্ধনের—তথা ভারতের অন্যতম কীর্তি। বাস্তবিক কোন একজন নরপতির চরিত্রে এতগুলি গুণেরে একত্র সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অস্ত্রচালনা ও শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার তুল্য নিপুণতা ছিল। কবি হরিষেণের প্রশস্তি এবং পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণের মাধ্যমে মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য ভারতের ইতিহাসে তথা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছেন।

রাজকবি বাণভট্ট রচিত হর্ষরচিত এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর 'সি-ইউ-কি' নামক বিবরণ (পশ্চিম দেশের বিবরণ) হর্ষবর্ধনের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। হর্ষচরিতে কবি বাণভট্ট সুললিত ভাষায়, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নৃপতির জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষচরিতের ভাষা সংস্কৃত, বিশুদ্ধ এবং অলংকার মণ্ডিত। বাণভট্টের রচনার মধ্যে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় রাজসভার গাম্ভীর্য, শালীনতা এবং স্নিগ্ধতা পরিস্ফুট। রাজসভার রীতিনীতি, মর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রম কাব্যের প্রতিচ্ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অধিকাংশই ইতিহাস-আশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাণভট্টের রচনা শ্রীহর্ষের জীবনের প্রথম ভাগের ঘটনার মধ্যেই নিবদ্ধ; রচনা অসম্পূর্ণ। কবির অকালমৃত্যুর জন্যই তিনি তাঁহার প্রভুর জীবনচরিত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

অনুশীলনী

১। গুপ্ত রাজবংশের পরিচয় ও সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থানের কাহিনী লিখ।
(Give an account of the origin and growth of the Gupta dynasty upto the end of Samudra Gupta.)

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
(Give an estimate of Samudra Gupta and his achievements in ancient Indian History)

৩। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কাহিনী লিখ।
(Give an account of Chandra Gupta Vikramaditya)

৪। ফা-হিয়ানের ভারত-বিবরণের আলেখ্য রচনা কর।
(Describe India in the light of Fa-hien.)

৫। গুপ্তযুগে ভারত ও বিদেশের সম্পর্কের বর্ণনা কর।
(Trace the relation of India with her neighbours in Gupta Age.)

৬। গুপ্তযুগের রাষ্ট্রশাসন, সমাজ-ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মজীবন—ইহাদের যে কোন দুইটির বিবরণ দাও।
(Write an account of India during the Gupta Age with reference to any two of the following : Gupta administration, society, economic condition and religion.)

৭। গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ আখ্যা দেওয়ার কারণ নির্দেশ কর।
(Why do you call Gupta period the golden Age of India ?)

৮। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(Who was the greatest of the Indian Kings of the 7th century A. D. ? What do you know of him ? Give an estimate of his character and achievements.)

৯। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন? তাঁহার বিবরণে তৎকালীন ভারতের কি চিত্র পাওয়া যায়?
(Who was the foreign traveller that visited India during the reign of Harshavardhana ? What account has he left about India ?)

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) নবরত্ন, (খ) স্কন্দগুপ্ত (গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) ভারতে হূন আক্রমণ (ঙ) শশাঙ্ক (চ) খারবেল (ছ) রাজ্যশ্রী (জ) মহাযান, হীনযান।

(Write short notes on : (a) Nabaratna (b) Skandha Gupta (c) Nalanda University (d) Huna invasions (e) Sasanka (f) Kharbela (g) Rajyashri (h) Mahayana and Hinayana forms of Buddhism.)

নবম অধ্যায়

দক্ষিণ ভারত ঃ উড়িষ্যা

অধ্যায় পরিচয় ঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানতঃ উত্তর ভারতের ইতিহাস। আর্য, গ্রীক, শক, হূন প্রভৃতি বিদেশী জাতি উত্তর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। মৌর্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয় নাই। মৌর্য এবং গুপ্তরাজগণ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আবার হর্ষোত্তর কালে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন নরপতি উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক অবদানই অধিক। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ব্যাপারেও ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতের সহিত দাক্ষিণাত্যের সুদূর বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। দাক্ষিণাত্যের নৌবহর শুধু পণ্য বহন করে নাই; এশিয়ার সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে এবং রাজ্যস্থাপনেও এই নৌবহরের যথেষ্ট দান ছিল।

মৌর্যযুগ হইতে মুসলমান আগমন পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

মৌর্যোত্তর যুগ (আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)।

গুপ্তোত্তর যুগ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ)।

হর্ষোত্তর যুগ (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ঃ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সংবাদই কাব্যাশ্রিত অথবা কিংবদন্তী এবং অনুমান সাপেক্ষ। রামায়ণের কাহিনী পাঠে অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চল অনার্য বা আর্যেতর জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। উত্তর-ভারত বিজেতা আর্যগণ বিজিত অনার্যগণকেই (ন-আর্য) যক্ষ, রক্ষ, নাগ, বানর, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছিল। অর্থাৎ ভারতের আদিম অধিবাসিগণই অই অঞ্চলে বাস করিত। অনেকের ধারণা দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি।

বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা দুর্লঙ্ঘ্য বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আর্যগণের দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ঋষি অগস্ত্যের বিন্ধ্য অতিক্রম

দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতা বিস্তার

এই প্রচেষ্টারই একটি ইঙ্গিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রামায়ণের কাহিনী শ্রীরামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্যে অয়ন বা গমনের অন্তরালে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে আর্য সভ্যতা বিস্তারের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস রহিয়াছে।

মৌর্যযুগে দাক্ষিণাত্য

ঐতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত মৌর্য সম্রাটগণ মহীশূর পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত অংশ জয় করিয়াছিলেন। সুবর্ণগিরি ছিল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। মহারাজ অশোক কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণে এই সময়ে, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি স্বাধীন দ্রাবিড় বা তামিল রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্য: মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে দাক্ষিণাত্যে দুইটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। একটি কলিঙ্গের (বর্তমান উড়িষ্যার) চেতরাজ্য, অপরটি গোদাবরী উপত্যকার (মহারাষ্ট্র অঞ্চল) সাতবাহন রাজ্য। এই দুইটি রাজ্য ব্যতীত বর্তমান ত্রিচিনোপল্লী অঞ্চলে চোল, মাদুরা; তিন্নেভেলি অঞ্চলে পাণ্ড্যরাজ্য; উত্তর মালাবারে সত্যপুত্র ও দক্ষিণ মালাবারে ছিল কেরলপুত্র রাজ্যের অবস্থান। এই চারিটি দ্রাবিড রাজ্যের মধ্যে প্রথমে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যই ছিল অধিকতর শক্তিশালী।

চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জনৈক চোল নরপতি সিংহল অধিকার করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যরাজ্য বহির্বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে জনৈক পাণ্ড্য নরপতি রোমান সম্রাট অগস্টাসের নিকট বাণিজ্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য চোলরাজ্য ব্যতীত সুদূর দক্ষিণের এই রাজ্যগুলি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সাতবাহন শক্তির পতনের যুগে দাক্ষিণাত্য

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শেষ পরাক্রান্ত নরপতি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির রাজত্বের অবসানেই সাতবাহন (সপ্তবাহন = সূর্য) রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে আভীর বংশীয় ঈশ্বরসেন মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চল অধিকার করিলেন। মধ্যপ্রদেশের বেরার অঞ্চলে বাকাটকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। পশ্চিম কানাড়ী অঞ্চলে ছোটু-সাত নামে সাতবাহন বংশেরই একটি শাখা শক্তিশালী হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বৈজয়ন্তীপুরে। সাতবাহনগণ ইহার পরেও কিছুকাল কৃষ্ণা নদীর সঙ্গম অঞ্চলে অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে ইক্ষ্বাকুগণ তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করে। কিন্তু উত্তরে পাটলীপুত্রে গুপ্তবংশ এবং দক্ষিণে কাঞ্জিভেরাম বা কাঞ্চীতে (বর্তমান মাদ্রাজের নিকটে) পহ্লবগণের অভ্যুত্থানের ফলে ইক্ষ্বাকুগণ কখনই অধিকতর

শক্তিশালী হইতে পারেন নাই। অন্ধ্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং কানাড়ী প্রদেশের কিয়দংশ পহ্লবগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্যে অভিযানকালে (৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধ) দাক্ষিণাত্যে বাকাটক এবং পহ্লবগণই ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাকাটকগণের সহিত সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয় নাই, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত ব্যাঘ্ররাজ নামে একজন নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই ব্যাঘ্ররাজ এবং বাকাটক সামন্ত ব্যাঘ্রদেব একই ব্যক্তি। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশী শক শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাকাটক নরপতি রুদ্রসেনের সহিত স্বীয় কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ প্রদান করেন। রুদ্রসেন ও প্রভাবতীর বংশধরগণ বাতাপীর চালুক্য এবং কলচুরি বংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বেরার অঞ্চলেই সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের বাকাটক বংশ

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত

গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধানতঃ উত্তরাপথকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল। এইসময়ে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রদেশে চালুক্য, পূর্বাঞ্চলে পহ্লব রাজবংশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। গুপ্তোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস এই দুই রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতারই কাহিনী।

কাঞ্চীর পহ্লব বংশ : সাতবাহন শক্তির পতনের যুগে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে পহ্লবগণ কাঞ্চীকে কেন্দ্র করিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে পহ্লব নরপতি বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেন। বিষ্ণুগোপ নামটি পহ্লব বংশের অনেক নরপতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন—সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক এই বিষ্ণুগোপের সহিত প্রাকৃত লিপিতে উল্লিখিত 'ধর্মপরায়ণ, শক্তিশালী এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা' পহ্লবরাজ শিবস্কন্দবর্মণের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। ইহা নিঃসন্দেহ যে পরবর্তী পহ্লবরাজগণ তেলেগু এবং কানাড়ীয় দেশের বহুলাংশ জয় করিয়াছিলেন। এমন কি মহীশূরের গঙ্গ এবং বৈজয়ন্তীপুরের কদম্বগণ ছোটু সাতকর্ণিদের পরে পহ্লবগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। "লোকভোগ" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহবর্মণ নামক একজন পহ্লব নরপতি কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পহ্লব বংশের অভ্যুদয়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বৃন্দাবনও মামুদের নির্মম হস্তের স্পর্শলাভে বঞ্চিত হয় নাই। ধ্বংস, লুণ্ঠন, নরহত্যা, ব্যাভিচার হিন্দুতীর্থ মথুরা ও বৃন্দাবনকে কলুষিত করিয়াছিল। মামুদ মথুরা হইতে নগর নির্মাণ উপযোগী পনর সহস্র বাস্তুশিল্পীকে বন্দী করিয়া গজনী নগরকে প্রাসাদশোভিত করিবার উদ্দেশ্যে গজনীতে প্রেরণ করেন। বাস্তবিক এই সমস্ত ভারতীয় শিল্পী গজনীকে "সালংকারা স্বগবধূ"তে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ফলে গজনী শহর সমসাময়িক মধ্য এশিয়ার সুন্দরতম নগরে পরিণত হইল। মথুরা অভিযানের পর ভারতবর্ষ হইতে বহু সুদক্ষ তীরন্দাজ গজনীর সৈন্যদলে গৃহীত হইল। তাহারা মামুদের পশ্চিম দেশের বিরুদ্ধে অভিযানে সহযোগিতা করিয়াছিল।

কনৌজ ছিল হিন্দুযুগের অন্তভাগে মধ্যভারতের মধ্যমণি, সর্বভারতের মহোদয়শ্রী। একদা বিশ্রুত কনৌজের রাজা রাজ্যপাল মামুদের আগমন-বার্তা শ্রবণে বিহ্বল হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন, কনৌজে মথুরা-বৃন্দাবনের পুনরাবৃত্তি হইল। মামুদের গৌরবে গৌরবান্বিত উট্‌বী বলেন, "কনৌজে লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ কত ছিল গণনা করিয়া শেষ করা যায় নাই।"

কনৌজ

মথুরা, বৃন্দাবন ও কনৌজ লুণ্ঠনের পরে হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজ্যপাল কনৌজ হইতে পলায়ন করায় ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের আত্মসম্মান আহত হইল। চান্দেল্ল রাজ বিদ্যাধর একটি ভারতীয় রাজসংঘ গঠন করেন এবং পলাতক রাজ্যপালকে পলায়নের শাস্তি স্বরূপ নিহত করেন। মামুদ ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজসংঘকে শাস্তি প্রদানকল্পে অভিযান আরম্ভ করিলেন। পথে ত্রিলোচন পালকে পরাজিত করিয়া বুন্দেলখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। মামুদ হিন্দুরাজন্যবর্গের সম্মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু উট্‌বী বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কাফের রাজ যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে শিবির পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।" রাজা বিদ্যাধরের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ অজ্ঞাত। মামুদ চান্দেল্ল রাজ্য জয় করিয়া প্রভূত লুণ্ঠিত সম্পদ সহ ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে সগৌরবে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কালিঞ্জর আক্রমণ : এই বৎসরের শেষভাগে মামুদ চান্দেল্ল রাজ্যের বিখ্যাত দুর্গ কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; পথে চান্দেল্ল রাজ্যের অধীন গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করিয়াও মামুদ দুর্গজয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং বুদ্ধিমানের মতন গোয়ালিয়র ত্যাগ করিয়া তিনি অভীষ্ট কালিঞ্জরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিন শত মাত্র হস্তীর বিনিময়ে মামুদ চান্দেল্ল রাজার সঙ্গে সন্ধি করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চান্দেল্ল-রাজ বিদ্যাধর মামুদের বীরত্বের

প্রশংসা করিয়া একটি প্রশস্তি রচনা করিয়া উপহার দেন। মামুদ হিন্দু রাজার প্রশস্তি পাঠে এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার হস্তে গজনী সৈন্য কর্তৃক বিজিত পনরটি দুর্গের ভার অর্পণ করিলেন। গোয়ালিয়র পরিত্যাগ সুলতান মামুদ গজনীর বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক।

কালিঞ্জার-রাজ বিদ্যাধর

সোমনাথ অভিযান: সোমনাথ লুণ্ঠন ভারতে মামুদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। সোমনাথ ছিল গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে মহাভারতের যুগের বিখ্যাত প্রভাসতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য দ্বারকার বহু কাহিনী প্রভাসতীর্থের সঙ্গে বিজড়িত। আরব সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বহু পারসিক জলপথে গুজরাটের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সোমনাথে পারসিকগণ অগ্নি উপাসনার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। বহু আরব বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে সোমনাথে যাতায়াত করিত। মধ্য এশিয়া হইতে অনেক অগ্নি উপাসক সোমনাথ তীর্থদর্শনে গমন করিত। মধ্য এশিয়াতে 'সোমানিয়া' নামক একটি ধর্মগোষ্ঠী ছিল। ভারতের সোমনাথ বিদেশী সোমানিয়ানদেরও তীর্থস্থান ছিল।

স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে—এই প্রভাস তীর্থের মধ্যবর্তী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া চতুষ্পার্শ্বে প্রথমে এক মণ্ডল, তারপর অন্য একটি মণ্ডল মন্দির ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এই সোমনাথ ছিল 'মন্দিরের নগর।' এই মন্দিরের প্রধান দেবতা ছিলেন শিব। সোমনাথে অন্যান্য বহু হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও অগ্নি উপাসকেও মন্দিরও ছিল।

মামুদ মধ্য এশিয়া হইতে প্রত্যাগত বণিক ও তীর্থযাত্রীদিগের নিকট হইতে সোমনাথের সম্পদ সম্বন্ধে বহু কাহিনী শুনিয়া সোমনাথের প্রতি লুব্ধ
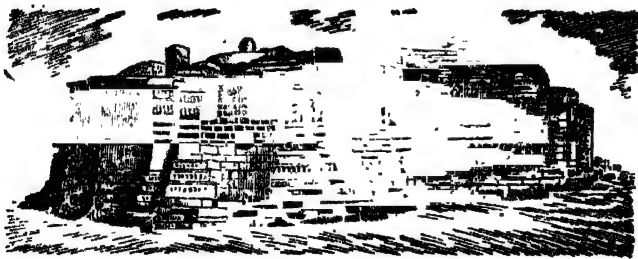
সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

হইলেন। অবশ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংসানুষ্ঠান মামুদের নেশায় পরিণত হইয়াছিল। মামুদ ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে সোমনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে তাঁহার বিশালতম সেনাবাহিনী; তিন সহস্র রসদবাহী উষ্ট্র। তিন মাস বিরামহীন ভ্রমণের পর তিনি রাজপুতনার দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম

করিয়া গুজরাটের পূর্বপ্রান্তে অনহিলহরা নগরে উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে রাজা ভীমদেব তাঁহার সৈন্যসহ নগর ত্যাগ করিয়া গেলেন। মন্দিরের পুরোহিতগণ যথাসম্ভব মামুদের গতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা বিফল হইল। কথিত আছে, বিগ্রহ চূর্ণ করিবার জন্য মামুদ উদ্যত হইলে পুরোহিতগণ মামুদকে বিগ্রহ রক্ষার বিনিময়ে বহু অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করেন। মামুদ উত্তর দিলেন, "মামুদ বিগ্রহ ধ্বংস করে, বিগ্রহ বিক্রয় করে না।"—এই বলিয়া মামুদ স্বহস্তে বিগ্রহ বিচূর্ণ করিলেন। বিচূর্ণিত শিবলিঙ্গের খণ্ডগুলি মুসলিম তীর্থ মক্কা, মদিনা এবং মামুদের রাজধানী গজনীতে প্রেরিত হইল। গজনীর রাজপথে হিন্দু বিগ্রহের অংশগুলি বিক্ষিপ্ত হইল—উদ্দেশ্য, নমাজের সময় বিশ্বাসী মুসলিমগণ বিধর্মীর পূজ্যমূর্তি ও বিগ্রহ পদদলিত করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে। কথিত আছে, সোমনাথে অর্ধ লক্ষ হিন্দু নরনারী নিহত হইয়াছিল। সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য ছিল দুই লক্ষ স্বর্ণ দিনার।

১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ প্রত্যাবর্তনের পথের বাধাদানের শাস্তিস্বরূপ সিন্ধুবাসী জাঠদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করেন। ইহাই মামুদের ভারতে সর্বশেষ অভিযান। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে লুণ্ঠনলোভী ও বিধর্মী-হত্যাবিলাসী মামুদ বিহিস্ত্ বা স্বর্গ লাভ করেন।

মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব : মামুদ ছিলেন জন্মে খোরসানী, বসতিতে গজনবী, ধর্মে মুসলিন, কর্মে নিরলস, শৌর্যে অতুলনীয়, সৈন্য পরিচালনায় সুনিপুণ, শাসনে স্বেচ্ছাচারী, বিচারে ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহী, দানে কৃপণ, প্রতিশ্রুতি পালনে বিবেকহীন। যুদ্ধ ছিল তাঁহার সকল কর্মের উৎস; লুণ্ঠন ছিল তাঁহার ব্যসন, হিন্দুর মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস ছিল তাঁহার বিলাস। অর্থলোভ, অর্থলাভ ও অর্থসঞ্চয় ছিল তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। অতি ক্ষুদ্র খোরাসান এবং গজনী রাজ্যের অধিপতি মামুদের একমাত্র স্বীয় বাহুবলে কাস্পিয়ান সাগর হইতে উত্তর ভারতে গঙ্গানদীর তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ জয় করিয়া বৃহৎ রাজ্য স্থাপন শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মামুদ গজনীর রাজ্য ইসলামের খলিফার রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইসলামের ধর্মগুরু বাগদাদের খলিফা গজনীর সুলতানকে 'ধর্মসম্মত আমীর' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইয়ামিন উদ্দৌলা (রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে

মামুদ ও ইসলাম

মামুদ আনুষ্ঠানিক ভাবে সুন্নী ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুসরণ করিতে। মামুদ ইসলামের নামে তাঁহার নবদীক্ষিত তুর্কসৈন্যকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। প্রয়োজন বোধে ধর্মান্তরিত সুখপালকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চান্দেল্লরাজ বিধর্মী বিদ্যাধরকে বিজিত পনরটি অর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ভারতীয় তীরন্দাজদিগকে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে বিক্রমজিৎ এবং ত্রিলোকী

নামক দুইজন হিন্দু ছিলেন। ভারতে প্রচলিত মামুদের মুদ্রার মধ্যে হিন্দী অক্ষরে তাঁহার নাম ক্ষোদিত ছিল। হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার পশ্চাতে লুণ্ঠনের আবেদন ছিল প্রধান। লুণ্ঠিত অংশ লাভের লোভে বহু তুর্কী ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধ ব্যবসায়ী মামুদের সঙ্গে ভারতে আগমন করিয়াছিল। তাঁহার

মামুদের ব্যক্তিত্ব

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তুর্ক, আফগান, আরব প্রভৃতি নানা জাতির লোক ছিল। মামুদের নিজের ব্যক্তিত্বই বিবিধ জাতির মিলনের সূত্র ছিল। বাস্তবিক পক্ষে লুণ্ঠন ছিল এই জাতিগুলির জীবিকা। মামুদ ধর্মের আবরণে নবদীক্ষিত মুসলিম, তুর্ক ও আফঘান জাতি-গুলির লুণ্ঠন-লালসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

মামুদ ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁহার ক্লান্তিহীন কর্মপ্রীতি, অমানুষিক দৈহিকশক্তি, নিপুণ সৈন্যপরিচালন ক্ষমতা, যুদ্ধে মামুদের নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের

সৈনিক মামুদ

উপর তাঁহার অনুচরবর্গের অসীম বিশ্বাস ছিল। মামুদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে স্থান লাভ করিবার জন্য দূর দেশ হইতে আগত বহু যুদ্ধব্যবসায়ী দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধে মামুদের জয় অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং মধ্য এশিয়া, পারস্য এবং হিন্দুস্থান প্রভৃতি সকল দেশের বিরুদ্ধেই মামুদ সমানভাবে যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের সাহায্য লাভ করিতেন। অবশ্য এই দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের লোভ ছিল সর্বাধিক। মামুদ কোন সৈন্যকে বেতন দিতেন না, কারণ, ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত লুণ্ঠনের অংশই ধর্ম যোদ্ধাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মামুদ জীবনে যুদ্ধে কদাচিৎ পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

মামুদের রাজ্যশাসন: মামুদ ছিলেন শাসনে স্বেচ্ছাচারী। কোরাণের নির্দেশ মৌখিক স্বীকার করিলেও মামুদ স্বীয় বিবেক বুদ্ধি অনুসারে শাসন করিতেন। তিনি নিজেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। মামুদ কোন শাসনপ্রণালী বা সংগঠনমূলক সংস্থা স্থাপন করেন নাই। শাসন ব্যাপারে তাঁহার নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসন করিতেন। তাঁহার বিজিত বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে শাসন প্রণালী, অথবা নিয়ম-ব্যবস্থার মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য দুই পুত্র মামুদ এবং মুহম্মদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধবিরতি হইল না।

মামুদের জ্ঞানানুশীলন: সমস্ত জীবনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও মামুদ বিদ্যাচর্চা করিবার সময় করিয়া লইতেন। তিনি স্বয়ং

রাজসভায় পঞ্চরত্ন

কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রাজদরবারে জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল। শাহ্‌নামা-রচয়িতা মহাকবি ফিরদৌসী, পণ্ডিত জ্যোতিষী আলবেরুণী, রসিক বৈহাকী, ইতিহাসকার উট্‌বী, দার্শনিক ফারাবী প্রভৃতি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছেন।

জ্যোতির্বিদ আলবেরুণী রচিত কিতাব উল্ হিন্দ গ্রন্থ সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান রচনার অতি উৎকৃষ্ট উপাদান। মামুদের নির্দেশে মণি, মুক্ত ও মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা ভারতীয় শিল্পিগণ গজনী নগরকে মধ্য এশিয়ার সুন্দরতম নগরে পরিণত করিয়াছিল। গজনীর নূতন নামকরণ হইয়াছিল স্বর্গবধূ—বিন্‌ত-ই-বিহিস্ত। মামুদ কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্পচিহ্ন, ভাস্কর্য, নগর, মন্দির, বিহার, চৈত্য, মূর্তি অত্যন্ত নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। নিজ দেশে শিল্পসৃষ্টি, অন্য দেশে শিল্পধ্বংস মামুদের শিল্পপ্রীতি অপেক্ষা শিল্পবিলাসই প্রমাণ করে। মামুদ জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন সত্য, কিন্তু জ্ঞানীর প্রতি তাঁহার রাজোচিত উদারতা ছিল না।

নূতন গজনী নির্মাণ

কথিত আছে, কবি ফিরদৌসীকে মামুদ শাহনামা কাব্য রচনার উপলক্ষে প্রতি শ্লোকের জন্য একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেলেন। ফিরদৌসী বহু আশা করিয়া ষাট সহস্র শ্লোক সমন্বিত 'শাহনামা' রচনা সমাপ্ত করিয়া অর্থের জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। কৃপণ মামুদ প্রমাদ গণিলেন, ষাট হাজার স্বর্ণদিনার দিতে মামুদ অস্বীকার করিলেন। নিরাশ ক্ষুণ্ণ কবি প্রশস্তির পরিবর্তে মামুদের বংশ, রূপ, চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ভীষণ শ্লেষাত্মক একটি কবিতা রচনা করিলেন। মামুদ নির্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সবল সৈনিকের তীক্ষ্ণ তরবারী অপেক্ষা দুর্বল কবির লেখনীর ধার তীক্ষ্ণতর। কবির শ্লেষ ভয়ে মামুদ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ষাট সহস্র স্বর্ণ দিনার কবির গৃহে প্রেরণ করিলেন। মামুদের প্রতিনিধি কবির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শববাহক কবির মৃতদেহ কবরের দিকে লইয়া চলিয়াছে। শুষ্ক মুখে মামুদের প্রতিনিধি রাজদরবারে প্রত্যাবর্তন করিল, সুলতান বিষণ্ণ হইলেন। মামুদের কার্পণ্যের কলঙ্ক ইতিহাসে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে।

এই কাহিনীর মধ্যে কবির কল্পনা হয়ত আছে, কিন্তু কাহিনী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যবিবর্জিত নহে। এই কাহিনী মানুষের মনে লুণ্ঠনকারী, ধ্বংসবিলাসী, নিষ্ঠুর মামুদের প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা ঘৃণার উদ্রেক করে।

রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান

রাজপুত জাতির গোষ্ঠী পরিচয় ও বিচার: ভারতীয় রাজপুতগণ বিশেষ একটি জাতি নহে, কোন একজন বিশেষ আদিপুরুষ হইতেও উদ্ভূত হয় নাই। বিভিন্ন রাজপুত বংশ ভারতের বিখ্যাত রাজা বা মহাপুরুষের বংশধর বলিয়া গর্ব করে। যেমন, **যাদব ও রাষ্ট্রকূটগণ** শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, মেবারের **শিশোদীয়গণ** শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর, **প্রতীহারগণ** শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা

লক্ষ্মণের বংশধর। প্রাচীন সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের সন্তান বলিয়া বহু রাজপুত পরিবার আত্মপরিচয় দান করে এবং তৃপ্তি লাভ করে। বাস্তবিক পক্ষে গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তোত্তর যুগে কুষাণ, শক, হুন, গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত যোদ্ধ-জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, কালক্রমে তাহারা ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন এবং ভারতীয় আচার, ধর্ম, জাতিভেদ-প্রথা গ্রহণ করিয়া রাজপুত নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জাতির নায়কগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত নবদীক্ষিত বহিরাগতদিগকে ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

গুর্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য ঃ গুর্জর জাতি সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়ার হুনদের সঙ্গেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। গুর্জরগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন গুর্জর রাজপুত নায়ক একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য গুর্জর জাতীয় অন্য কয়েকজন সেনানায়ক পূর্বে এবং দক্ষিণে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ ভিল্লমল নামক একটি গুর্জর রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলের গুর্জর রাজগণ বর্তমান যোধপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বংশ প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসরের উপর সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান নাগভট্ট বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮১৫-৮৩ খ্রীঃ), ভোজ (৮৩৬-৮৮২ খ্রী)), মহেন্দ্র (৮৮২-৯১৪ খ্রীঃ) এবং মহীপাল (৯১৪-৯৪৩ খ্রীঃ) নামক ছয়জন নরপতি ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত। মুসলিম আগমণের সমকালে গুর্জর রাজ্য মহারাজ হর্ষের রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। বাস্তবিক পক্ষে মহারাজ হর্ষকে ভারতের শেষ সম্রাট আখ্যা দেওয়া সমীচান নহে। আরব শাসনকর্তা জুনিয়াদ (৭২৫ খ্রীঃ) হইতে মামুদ গজনীর আক্রমণকাল পর্যন্ত গুর্জর-প্রতীহার রাজগণ সত্যই ভারতের প্রতিহারী বা সমুদ্র দ্বাররক্ষী ছিলেন।

কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য ত্রিশক্তি সংগ্রামের অন্তভাগে প্রতীহার-রাজ ভোজ, মহেন্দ্রপাল এবং মহীপাল কনৌজ সাম্রাজ্যেরঅপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক ছিলেন। বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট, ভোজ এবং মহেন্দ্রপাল তিন বৎসর ব্যতীত প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজ্য শাসন করেন। ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগভট্ট আরবদিগকে তাঁহার রাজ্যসীমা হইতে বিতাড়িত করেন। বৎসরাজ বাংলার রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র-কূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করেন। তিন বৎসরকাল বৎসরাজ রাজপুতনার অরণ্যাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অবশ্য তিন বৎসর পরে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ত্রিশক্তি সংগ্রামের সর্বশেষ

বিজেতা ছিল গুর্জর-প্রতীহার রাজবংশ। গুর্জর রাজমুকুট সর্বাপেক্ষা অধিককাল কনৌজের মহোদয়শ্রীকে সুষমামণ্ডিত করিয়াছিল।

গুর্জর বংশের রাজকবি রাজশেখর গুর্জররাজকে আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ নামে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। রাজশেখর প্রণীত বাল-রামায়ণ ও কাব্যমীমাংসা গুর্জর বংশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। গুর্জরগণ ভারতের অভ্যন্তরে আরব জাতির অগ্রসর প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষকে আরব দুর্দৈব হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য ত্রিশক্তি সংগ্রাম: কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পুষ্যভূতি বংশের গৌরব ম্লান হইয়া গেল। কনৌজ ছিল তখন ভারতের মধ্যমণি। এই মধ্যমণি লাভের জন্য খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য হইতে দশম শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত রাজপুতনা ও মালবের গুর্জর-প্রতীহার বংশ, মান্যখেড়ে (বর্তমান হায়দরাবাদ) রাষ্ট্রকূট বংশ এবং বাংলার পাল বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। কোন রাজবংশই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। যশোবর্মণের সময় সাময়িকভাবে কনৌজের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, যশোবর্মণের পর বাংলার রাজা ধর্মপাল (৭৫২-৭৯৪ খ্রীঃ) কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বংশবদ চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন দান করেন এবং স্বীয় প্রতিপত্তি স্থপেনের জন্য কনৌজে একটি রাজ-সম্মেলন আহ্বান করেন। গান্ধার হইতে আসাম পর্যন্ত বিশাল রাজ্যের অধিপতিবর্গ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া বাংলার রাজা ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে (আনুমানিক ৭৭২ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ বাংলার ধর্মপালকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থান হইতে বিতাড়িত করিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমে প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের বশংবদ চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হন। তারপর ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ কনৌজ অধিকার করেন। অবশ্য ধর্মপালের পুত্র দেবপাল গুর্জর হুনদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে বাংলার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর প্রতীহাররাজ ভোজ বংশের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং কনৌজে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজা ভোজ এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপালের সময় প্রতিহার বংশের পূর্ব সীমা মগধের সীমান্ত হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহাররাজ মহীপালকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। এই পরাজয়ের পর প্রতীহার রাজ্য কনৌজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। প্রতীহার রাজবংশের পতনের পর

বুন্দেলখণ্ডে চান্দেল্ল বংশ, গুজরাটের চৌলুক্য বংশ, মালবে পরমার বংশ এবং যমুনা ও নর্মদার দোআব অঞ্চলে চেদী বংশ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। মহীপাল কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ; কিন্তু কনৌজের পূর্বগৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনী কনৌজরাজ রাজ্যপালকে পরাভূত করেন এবং কনৌজ লুণ্ঠন করেন।

মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে রাজপুতনা, মধ্যভারত ও পশ্চিম-ভারতে গুজরাটের চালুক্য ও গুর্জর-প্রতীহার বংশ, জেজাকভুক্তির চান্দেল্ল বংশ, মালবের পরমার বংশ, আজমীরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহড়ওয়াল বংশ এবং চেদী রাজ্যের কলচুরী বংশ বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে আত্মকলহের সুযোগে বহির্ভারতীয় মুসলিমগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে উৎসাহিত হইয়াছিল। আত্মকলহের জন্যই ভারতীয় রাজকুল সকল সময়ে বৈদেশিক শত্রুকে সমবেত ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এই আত্মবিরোধই তুর্ক-আফঘান আক্রমণকারীদিগের ভারতবর্ষ জয় সহজ করিয়াছিল।

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ : আফঘানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে হিরাতের দক্ষিণ-পূর্বভাগে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ঘুর নামে পরিচিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ঘুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন আলাউদ্দীন হুসেন। তিনি ছিলেন পারস্য দেশীয়। প্রথমে ঘুর রাজবংশ গজনীর ইয়ামিনি বংশের অধীন ছিল ; মামুদ গজনীর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে ঘুর বংশ গজনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আমীর আলাউদ্দীন হুসেন গজনী নগর আক্রমণ করিয়া 'সাত দিন সাত রাত্রির মধ্যে নগরটি অগ্নিসাৎ করিয়া ধ্বংস করেন' এবং নগরের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তিনি গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানে মামুদ গজনীর কবর-খনন করিয়া মৃতদেহের অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অগ্নি দ্বারা গজনী ধ্বংসের পুরস্কার স্বরূপ তিনি 'জাহানসোজ' বা পৃথিবীদাহক আখ্যা লাভ করেন। আলাউদ্দীন জাহানসোজের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গজনী অধিকার করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন (নামান্তরে মুইজউদ্দীন) মুহম্মদ ঘুরীকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ঘুর রাজ্যের অভ্যুত্থান

শাসনকর্তৃপদ লাভের দুই বৎসর পরেই মুহম্মদ ঘুরী মুলতানের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং মুলতান অধিকার করেন। এই বৎসরই তিনি কৌশলে উচ দুর্গ জয় করেন এবং গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান করেন কিন্তু চালুক্যরাজ কর্তৃক পরাজিত হন। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী পেশোয়ার জয় করিয়া শিয়ালকোটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সময়ে জম্মুর রাজা বিজয়দেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহম্মদ ঘুরী লাহোর অভিযান করেন।

মুলতান, উচ্ ও লাহোর অধিকার

তিনি মামুদ গজনীর শেষ বংশধর আমীর খসরু মালিককে লাহোর হইতে বিতাড়িত করেন। এই সময় হইতে ভারতের সহিত গজনীর দুই শত বৎসর-ব্যাপী সম্পর্ক ছিন্ন হইল। লাহোর অধিকারের ফলে মুহম্মদ ঘুরীর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সুগম হইল। এইবার তিনি দিল্লী আজমীরের শক্তিমান চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন।

পৃথ্বীরাজ এবং মুহম্মদ ঘুরী: অনেকের মতে কনৌজের গাহড়ওয়াল-রাজ জয়চাঁদ মুহম্মদ ঘুরীকে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করেন; কারণ, চৌহান পৃথ্বীরাজের গৌরবে গাহড়ওয়ালরাজ জয়চাঁদ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। রাজপুত চারণ গীতির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুত কাহিনী রচয়িতা টড সাহেব বলেন, "পৃথ্বীরাজ সয়ম্বর সভা হইতে জয়চাঁদের রূপলাবণ্যময়ী কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করিয়া পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও কন্যার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বিবাহ করেন। সুতরাং জয়চাঁদ চৌহান রাজ্য আক্রমণের জন্য মুহম্মদ ঘুরীকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তবে মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রান্ত হইলে জয়চাঁদ তাঁহার জামাতাকে সাহায্য করেন নাই, ইহা সত্য।

তরাইনের যুদ্ধ (১১৯১-১১৯২ খ্রীঃ): মুহম্মদ ঘুরী ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে পৃথ্বীরাজের রাজ্যান্তর্গত সরহিন্দ-এর দিকে অগ্রসর হন। পৃথ্বীরাজ ও কয়েকজন রাজপুত নরপতি সমবেত হইয়া মুহম্মদ ঘুরীকে স্থানেশ্বরের অদূরবর্তী তরাইনের বিস্তৃত প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন।

প্রথম যুদ্ধ

মুসলিম সৈন্য পরাস্ত হইল; মুহম্মদ ঘুরী হিন্দু সেনাপতি স্কন্দের বর্শাঘাতে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। সিন্ধুরাজ দাহিরের মত পৃথ্বীরাজ রাজপুত যুদ্ধাদর্শ অনুসারে পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া আজমীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মুহম্মদ ঘুরীও নিরাপদে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু মুহম্মদ ঘুরী পরাজয়ের এই অপমান বিস্মৃত হন নাই। তিনি পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

মুহম্মদ এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় উভয় সৈন্যদলের শক্তি পরীক্ষা হইল। পৃথ্বীরাজের প্রধান সেনাপতি স্কন্দ এই সময়

দ্বিতীয় যুদ্ধ

অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। দিল্লীর শাসনকর্তা গোবিন্দ-রাজ যুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে বিলম্ব করিলেন। পৃথ্বিরাজের মন্ত্রী সোমেশ্বর রাজার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদেশী, বিধর্মী মুহম্মদ ঘুরীর পক্ষে যোগ দিলেন।

মুহম্মদ ঘুরীর সৈন্য অপেক্ষা পৃথ্বীরাজের সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু শত্রুর সমস্ত সৈন্যকে যুগপৎ আক্রমণেরনীতি পরিত্যাগ করিয়া মুহম্মদ ঘুরী স্বীয় সৈন্য-

বাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এক ভাগ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে রহিল, পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দু সৈন্য ঘুরী-সৈন্যকে আক্রমণ করিলে তাহারা বিভিন্ন দিকে পলায়নের ভাণ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন বারংবার শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে পৃথ্বীরাজের সৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন মুহম্মদ ঘুরীর সংরক্ষিত নূতন সৈন্যবাহিনী পূর্ণ উদ্যমে নূতন উৎসাহে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদল আক্রমণ করিল; একলক্ষ হিন্দুর রক্তে তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। গোবিন্দরাজ নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মুসলিমগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্তিতে (শ্রীবস্তীতে) বন্দী করিল। অতঃপর বিধর্মী রাজাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হইল।

মুহম্মদ ঘুরীর রণ কৌশল

তরাইনের যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে হিন্দুর মনোবল নষ্ট হইয়া গেল। বহু হিন্দু সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হইবারও নারীর অপমানের আশংকায় দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হরিরাজ এবং সেনাপতি স্কন্দ আজমীরে চৌহান বংশের পুনরুত্থানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইল। তরাইনের যুদ্ধের পর হইতে উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ী রূপ ধারণ করিল।

তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল

দিল্লী ভারতীয় মুসলমানদের শাসনকেন্দ্রে পরিণত হইল। ১১৯২ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একাদিক্রমে দিল্লী ছিল মুসলিম শক্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস। তরাইনের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।

মুহম্মদ ঘুরী দিল্লীতে কুতুবউদ্দিন আইবক নামক একজন তুর্কী ক্রীত-দাসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া গজনী অভিমুখে প্রস্থান করেন। কুতুবউদ্দিন রাজভ্রাতা হরিরাজকে পরাজিত করিয়া আজমীর অধিকার করেন। চৌহান বংশের গৌরবময় ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হইল।

দিল্লীতে স্থায়ী মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গ বিজয়: মুহম্মদের নব-নিযুক্ত দিল্লীর শাসনকর্তা সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কুতুব স্বয়ং তাইজুদ্দীন ইলদীজের কন্যাকে বিবাহ করেন, স্বীয় ভগ্নীর সহিত নাসিরুদ্দীন কুবাচার বিবাহ দেন এবং অন্য কন্যার সহিত ইলতুৎমিসের বিবাহ দেন। এই তিনজন ছিলেন ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠাবান তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ। তরাইনের যুদ্ধের এক বৎসরের মধ্যেই কুতুবউদ্দীন হান্সী, মীরাট, দিল্লী ও রণথম্বর জয় করেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দাবারে (এটাওয়ার নিকট) যুদ্ধে জয়চাঁদ তাঁহার সেনাপতি ভীমদেবকে পরাজিত করেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের দুর্গম দুর্গ কালঞ্জর জয় করেন এবং অর্ধলক্ষ হিন্দু নরনারীকে বন্দী করেন।

কুতুবউদ্দীন

এই সময় ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী অযোধ্যার নিকটবর্তী ভূইলী ও চুনারের জায়গীরদার পদ লাভ করিয়া পূর্বাঞ্চলে বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব ভারত তখনও মুসলিমের নিকট প্রায় অজ্ঞাত ছিল, সুতরাং লুণ্ঠন লোভে ইখ্‌তিয়ার অযোধ্যার পূর্বদিকে কয়েকটি হিন্দু জনপদ লুণ্ঠন করিলেন। মুসলিমগণ এই জনপদের নামকরণ করিল 'বিহার'; কারণ, এখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। বৌদ্ধ বিহার অঞ্চলের মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণ ও সন্ন্যাসিগণ মুসলিমদিগকে কোন বাধা প্রদান করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। মঠে প্রবেশ করিয়া মুসলিমগণ বিধর্মীর ধর্মপুস্তক, মূর্তি ও বৌদ্ধধর্মের স্মারকচিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল, মঠবাসীদিগকে হত্যা করিল। শাক্য বংশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রীভদ্র বলেন, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীলার বিহারগুলি জনশূন্য দেখিয়াছেন। ধ্বংসাবশিষ্ট বৌদ্ধশ্রমণগণ পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে বাংলার সীমান্তে বর্তমান বগুড়ার নিকট জগদ্দল মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন

বিহার বিজয়

মুহম্মদ ইবন বখ্‌তিয়ার খলজী অপারমিত ধনলোভে প্রলুব্ধ হইয়া আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন। ইতিহাসকার ইসামি বলেন, অষ্টাদশ অশ্বারোহী-সহ ইবন বখ্‌তিয়ার ঝাড়খণ্ডের পথে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া অশ্ববিক্রেতারূপে নদীয়া নগরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নদীয়ার অধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেনের অশ্বপ্রীতি জনপ্রবাদ ছিল। অশ্বপরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলে ইবন বখ্‌তিয়ার নিরস্ত্র বৃদ্ধ রাজার দেহরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং বৃদ্ধ রাজা বন্দী হইলেন।

বঙ্গ বিজয়

তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থ-প্রণেতা মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ বলেন, ইবন বখ্‌তিয়ারের অতর্কিত আক্রমণে বিহ্বল হইয়া রাজা লক্ষ্মণসেন নৌকাযোগে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া রাজ্যের পূর্বাংশে বিক্রমপুরে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কারণ, নদীবহুল পূর্ববঙ্গ তুর্কদের পক্ষে আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধর বিশ্বরূপসেন এবং সামন্তসেন ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের নদীয়া ত্যাগের পর ইবন বখ্‌তিয়ার তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করে নাই। তুর্কগণ কয়েকদিন মনের আনন্দে নদীয়া নগরী লুণ্ঠন করিল। তারপর ইবন বখ্‌তিয়ার দেবকোটে (বর্তমান বগুড়ার আট মাইল দূরে) সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। বাংলার রাজধানী গৌড় এবং উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি ইবন বখ্‌তিয়ার কর্তৃক ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিজিত হইয়াছিল; কারণ, ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইবন বখ্‌তিয়ার আসামের পার্বত্য পথে দুর্গম তিব্বত জয়ের

চেষ্টা করেন। যুদ্ধান্তে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে মাত্র একশত সৈন্য দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিল। পরাজয়ের লজ্জা ও অপমানে ইবন বখ্তিয়ার শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ, বন্ধু ও আত্মীয় আলী মর্দান খলজী রোগশয্যায় ইবন বখ্তিয়ার খলজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এই সুযোগে আলী মর্দান বন্ধু ইবন বখতিয়ারের বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র বন্ধুকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীঃ)। ঐ বৎসরই দিল্লী-বিজেতা মুহম্মদ ঘুরী পঞ্জাবের দুর্ধর্ষ খোকর জাতিকে দমন করিয়া গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

তিব্বত বিজয়ের ব্যর্থ চেষ্টা।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত-বিজয়ী সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর এবং পূর্ব ভারত-বিজয়ী ইবন বখতিয়ার খলজীর একই বৎসরের মধ্যে ১০০ দিনের ব্যবধানে মুসলিম আততায়ীর হস্তে মৃত্যু—মুসলিম ভারতের ইতিহাসে এক অশুভ ইংগিত। মুসলিম ভারতের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ যেন এই দুইটি হত্যার মধ্যেই সূচিত হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। মুহম্মদ কর্তৃক আরবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের কাহিনী বর্ণনা কর। ইসলামের আদর্শ, পঞ্চস্তম্ভ ও জীবনধারা বর্ণনা কর।
(Give an account of the introduction of Islam by Muhammad in Arabia. What are principles of Islam? What are its 'five pillars': Describe the way of Muslim life.)

২। মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় বর্ণনা কর। দাহিরের পরাজয়ের কারণ কি?
(Describe the story of Muhammad bin Qasim's conquest of Sind. What were the causes of Dahir's fall?)

৩। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ফলাফল আলোচনা কর।
(What were the immediate and remote effects of Sind conquest by the Arabs.)

৪। সুলতান মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণ ও তাঁহার সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর।
(Describe the exploits of Sultan Mahmud Ghazni in India. What were the causes of his success?)

৫। সুলতান মামুদ গজনীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
(Give an estimate of the character and achievements of Sultan Mahmud Ghazni)

৬। রাজপুতজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর।
(Trace the origins of the Rajputs.)

৭। তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের পরাজয় ও মুহম্মদ ঘুরীর সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর।
(What were the causes of the failure of Prithwiraj against Ghori?)

৮। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ:
(ক) রাওড়ের যুদ্ধ, (খ) আলবেরুণী, (গ) সোমনাথ লুণ্ঠন, (ঘ) জয়পাল।
(Write notes on: (a) Battle of Raod, (b) Al-Biruni, (c) Sack of Somenath, (d) Jaipal,)

ঘটনাপঞ্জী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

আনুমানিক—৩০০০—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগ।

" ৩০০০—১৫০০ " " আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি স্থাপন।

" ৪০০ খ্রীঃ পূঃ—৪০০ খ্রীষ্টাব্দ মহাকাব্যের রচনাকাল।

প্রাচীন যুগ

আনুমানিক—৬২৭—৫৪৬ খ্রীঃ পূঃ মহাবীর জিনের আবির্ভাব।

৫৫৮—৫৩০ " " পারস্যরাজ কুরুষের রাজত্ব।

" ৫৬৬ " " ভগবান বুদ্ধের জন্ম।

(মতান্তর—৬২৪)

আনুমানিক—৫২২—৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ পারস্যরাজ দরায়ুসের রাজত্ব।

" ৪৮৬ ,, ,, ভগবান তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণ।

" ৩২৭—৩২৬ ,, ,, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।

" ৩২৪—৩০০ " " চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্ব।

৩২৩ ,, ,, পথে ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

মৌর্য যুগ (৩২৪-১৮৫ খ্রীঃ পূঃ)

৩২১ খ্রীঃ পূঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক পঞ্জাব হইতে গ্রীক বিতাড়ন।

৩০৫ " " সেলুকসের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ ও সন্ধি।

আনুমানিক—৩০০—২৭২ " " বিন্দুসারের রাজত্ব।

" ২৭৩—২৩২ " " মহারাজ অশোকের রাজত্ব।

২৬১ " " অশোকের কলিঙ্গ বিজয়।

১৮৭ ,, ,, শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত; পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসনারোহণ; শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা।

মৌর্যোত্তর যুগ (১৮৭ খ্রীঃ পূঃ-৩২০ খ্রীষ্টাব্দ)

" ১৮৭— ৭৫ খ্রীঃ পূঃ মগধে শুঙ্গবংশের রাজত্ব।

" ১৭২—১৩৬ " " মিথ্রিডেটিস।

আনুমানিক— ৭৫— ৩০ খ্রীঃ পূঃ মগধে কাম্ববংশের রাজত্ব।

৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কণিষ্কের রাজ্যলাভ ও শকাব্দ আরম্ভ।

" ১১৫—১২৪ খ্রীষ্টাব্দ ভৃগুকচ্ছে নহপানের রাজত্ব।

" ১৩০—১৫০ " উজ্জয়িনীতে রুদ্রদামনের রাজত্ব।

গুপ্ত যুগ (৩২০-৪৬৭ খ্রীঃ)

৩২০—৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব।

৩২০ " গুপ্ত সম্বৎ আরম্ভ।

আনুমানিক—৩২৫—৩৭৫ " সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব।

" ৩৭৫—৪১৫ " দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব।

" ৩৯৯—৪১৪ " ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ।

" ৪১৫—৪৫৫ " কুমারগুপ্তের রাজত্ব।

" ৪৫৫—৪৬৭ " স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব।

গুপ্তোত্তর যুগ (৪৬৭-৬০৬ খ্রীঃ)

আনুমানিক— ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হূণ দলপতি তোরমাণের মালব অধিকার

" ৫৩২—৫৩৩ " যশোধর্মণ কর্তৃক মিহিরগুলের পরাজয়।

" ৫৩৪ " মিহিরগুলের মৃত্যু।

৫৭০ " হজরত মুহম্মদের জন্ম।

" ৫৪৩—৫৪৪ " বাতাপীব চালুক্যবংশ প্রতিষ্ঠা।

হর্ষ যুগ (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ)

আনুমানিক—৬০৩—৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গরাজ শশাঙ্কের রাজত্ব।

" ৬০০ " রাজ্যবর্ধন।

" ৬০৬—৬৪৭ " সম্রাট হর্ষের রাজত্ব।

" ৬০৬ " হর্ষাব্দ আরম্ভ।

আনুমানিক—৬০৯—৬৪২ " চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্ব।

" ৬২৯—৬৪৫ " হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ।

" ৬২৯—৬৫০ " তিব্বতে স্রঙ্ সাঙ গাম্পোর রাজত্ব।

" ৬৪১ " দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ষবর্ধনের পরাজয়

" ৬৪২ " পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হস্তে

পুলকেশীর পরাজয়

হর্ষোত্তর যুগ (৬৪৭-১২০৬ খ্রীঃ)

(ত্রিশক্তি সংগ্রামঃ রাজপুত জাতির অভ্যুদয় ও মুসলিম আগমন।)

আনুমানিক—৬৫৩—৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ রাষ্ট্রকূটবংশের প্রতিষ্ঠা।
" ৬৭২—৬৭৯ " ইৎসিঙ-এর ভারত আগমন।
" ৭১২ " আরব জাতির সিন্ধু বিজয়।
" ৭২৫ " গুর্জর-প্রতীহার নরপতি নাগভট্টের রাজ্যলাভ
" ৭৫০—১১৭৫ " বাংলায় পালবংশের রাজত্ব।
" ৭৫০—৭৭০ " গোপালের রাজত্ব।
" ৭৫০ " পালবংশের প্রতিষ্ঠা।
" ৭৫৪ " দন্তিদুর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রকূটবংশ প্রতিষ্ঠা।
" ৭৭০—৮১০ " ধর্মপালের রাজত্ব।
" ৭৯৪—৮১৫ " রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের রাজত্ব।
" ৮১০—৮৫০ " দেবপালের রাজত্ব।
" ৮৩৬—৮৮৫ " গুর্জর-প্রতীহাররাজ মিহিরভোজের রাজত্ব।
" ৯১৬ " রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্তৃক কনৌজ বিজয়
" ৯৭৩ " কল্যাণের চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা।
" ৯৮৮—১০২৬ " প্রথম মহীপালের রাজত্ব।
" ৯৯৮—১০৩০ " সুলতান মামুদ গজনীর রাজত্ব।
" ১০০১ " শাহীরাজ জয়পালের পরাজয় ও আত্মবিসর্জন।
" ১০১৬—১০৪৪ " রাজেন্দ্রচোলের রাজত্ব।
" ১০১৭ " আলবেরুণীর ভারত আগমন।
" ১০১৮—১০৫৫ " ধারা নগরীতে রাজা ভোজের রাজত্ব।
" ১০২৫ " সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ লুণ্ঠন।
" ১০৩৮ " দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের তিব্বতে গমন।
আঃ ১০৭৭—১১২০ " রামপালের রাজত্ব।
" ১১৫৮—১১৭৯ " বল্লালসেনের রাজত্ব।
" ১১৭০—১১৯৪ " কনৌজে জয়চাঁদের রাজত্ব।
" ১১৭৯—১১৯২ " পৃথ্বীরাজের রাজত্ব।
" ১১৭৯—১২০০ " লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব।
" ১১৮৬ " মুহম্মদ ঘুরীর লাহোর বিজয়।
" ১১৯১ " তরাইনের প্রথম যুদ্ধ, ঘুরীর পরাজয়।
" ১১৯২ " তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয়।
" ১১৯৪ " চন্দাবারের যুদ্ধে জয়চাঁদের পরাজয়।
" ১২০০ " ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের বঙ্গ বিজয়।

বংশ পরিচয়

মৌর্য বংশ—মগধ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

|

বিন্দুসার (অমিত্রঘাত)

| | |

সুসীম   অশোক (প্রিয়দর্শিন্)   বিগতাশোক (তিস্য ?)

সুসীম → নিগ্রোধ

অশোক → মহেন্দ্র   সংঘমিত্রা   চারুমিত্রা   কুনাল   জলৌক (কাশ্মীর)   তিবর

কুনাল → বন্ধুপালিত (দশরথ ?)   সম্প্রতি   বিগতশোক

সম্প্রতি → দেবধর্ম → বৃহদ্রথ

বিগতশোক → বীরসেন (গান্ধার) → সুভগসেন

কুষাণ বংশ

১ম কদফিস

|

২য় কদফিস

|

কণিষ্ক

|

বাসিষ্ক

|

হুবিষ্ক

|

২য় কণিষ্ক

|

বাসুদেব

গুপ্ত বংশ (মগধ)

শ্রীগুপ্ত
|
ঘটোৎকচগুপ্ত
|
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত = লিচ্ছবীকন্যা কুমারদেবী
|
সমুদ্রগুপ্ত
|
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)

- গোবিন্দগুপ্ত
- প্রথম কুমারগুপ্ত (মহেন্দ্রাদিত্য)
  - স্কন্দগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)
  - পুরগুপ্ত
    - নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য)
      - দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
        - বিষ্ণুগুপ্ত
    - বুধগুপ্ত
  - ঘটোৎকচগুপ্ত (?)
- প্রভাবতী (বাকাটক রাজমহিষী)
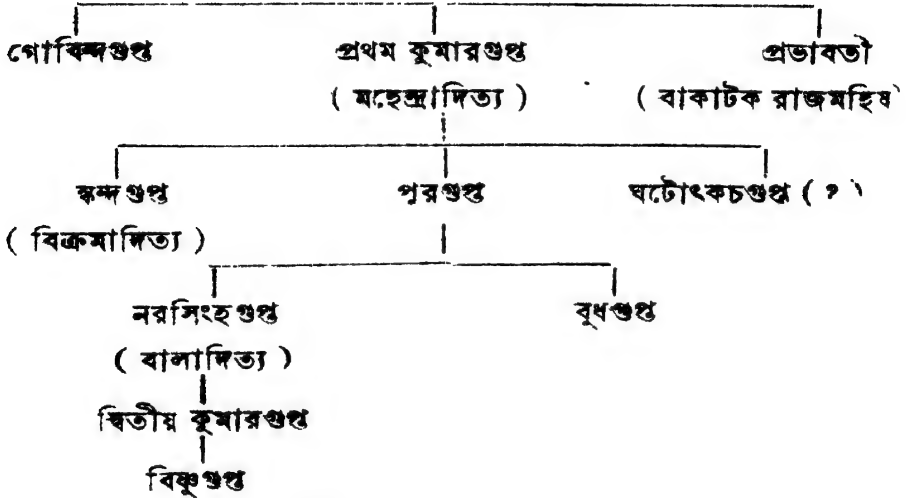
পুষ্যভূতি বংশ (স্থানেশ্বর)

নরবর্ধন
|
প্রথম রাজ্যবর্ধন
|
আদিত্যবর্ধন
|
প্রভাকরবর্ধন

- দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধন
- হর্ষবর্ধন—শিলাদিত্য (স্থানেশ্বর, কনৌজ)
  - কন্যা = ২য় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভট্ট বালাদিত্য) (বলভী)
    - চতুর্থ ধরসেন (বলভী)
- রাজ্যশ্রী (মৌখরী রাজমহিষী)

পাল বংশ (বাংলা)

প্রথম গোপাল
- ধর্মপাল
  - ত্রিভুবনপাল
  - দেবপাল
    - রাজ্যপাল
- বাক্‌পাল
  - জয়পাল
    - প্রথম বিগ্রহপাল
      - নারায়ণপাল
        - রাজ্যপাল
          - দ্বিতীয় গোপাল
            - দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
              - প্রথম মহীপাল
                - নয়পাল
                  - তৃতীয় বিগ্রহপাল

রাষ্ট্রকূট বংশ

- প্রথম দন্তিবর্মণ
  - প্রথম ইন্দ্র
    - কর্ক
      - দ্বিতীয় ইন্দ্র
        - দন্তিদুর্গ
      - প্রথম কৃষ্ণ
        - দ্বিতীয় গোবিন্দ
        - ধ্রুব
          - কম্ব
          - তৃতীয় গোবিন্দ
            - প্রথম অমোঘবর্ষ
              - দ্বিতীয় কৃষ্ণ
                - জগত্তুঙ্গ
                  - তৃতীয় ইন্দ্র
                    - দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ
                    - চতুর্থ গোবিন্দ
                  - তৃতীয় অমোঘবর্ষ
                    - তৃতীয় কৃষ্ণ
                    - খোট্টিগ
                    - নিরুপম
                      - চতুর্থ অমোঘবর্ষ
              - শঙ্খ
          - ইন্দ্র
      - নান্ন

গুর্জর-প্রতীহার বংশ
প্রথম নাগভট্ট
(অজ্ঞাত)
দেবরাজ
বৎসরাজ
দ্বিতীয় নাগভট্ট
রামভদ্র
প্রথমভোজ (মিহির)
যুবরাজ নাগভট্ট
প্রথম মহেন্দ্রপাল
প্রথম মহীপাল
দ্বিতীয় ভোজ
বিনায়কপাল
দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল
দেবপাল (?)
তৃতীয় মহীপাল (?)
বিজয়পাল (?)
রাজ্যপাল (?)
ত্রিলোচনপাল (?)
যশপাল (?)
সেন বংশ (বাংলা)
বীরসেন
সামন্তসেন (রাজপতি)
হেমন্তসেন
বিজয়সেন
বল্লালসেন (বঙ্গপতি)
লক্ষ্মণসেন
বিশ্বরূপসেন
কেশবসেন